মারেফাত এ ইমামত ও বেলায়েত

সংকলনঃ নাজির হুসাইন

প্রকাশনাঃ এলিয়া রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সংকলকের কথা

পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তি পথ খোঁজে সৌভাগ্যের সন্ধান করে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় পানির সন্ধানে এদিক ওদিক ছোটে, কখনও বা ঢেউ খেলানো উজ্জ্বল কিছু দেখে মরুদয়ান ভেবে সেদিকে ছুটে যায়, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে সব শূন্য কিছুই নেই। উপলব্ধি করে সে এতক্ষণ মরীচিকার পিছনে ছুটছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা।

(এক**)** আমি কোত্থেকে এলাম**?** (জন্মের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা) **(**দুই**)** আমি কোথায় এলাম**?** (জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা) **(**তিন**)** আমি কোথায় যাব**?** (জন্মের গন্তব্য বা জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা) জীবনের এই তিনটি মৌলিক জিজ্ঞাসাই মানবকে ধাবিত করে অর্থবহ জীবনের সন্ধানে। আর এগুলোর সঠিক সমাধানের উপর নির্ভর করে তার সার্থক জীবন। মানব জীবন হয়ে ওঠে তাৎপর্যমন্ডিত পরিপূর্ণ। প্রকৃত ঐশী ধর্মের আবির্ভাব মূলত মানব সন্তানের জীবন জিজ্ঞাসার যথার্থ সমাধান দানের উদ্দেশ্যেই।

“নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।**” (**বাকারা**-**১৫৬**)**

এই পার্থিব জীবনের পর আরো একটি জীবন রয়েছে, আজকের শেষে আগামীকাল সম্মুখে রয়েছে এবং এই ইহজীবনের পর মানুষকে অপর একটি চিরন্তন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। পার্থিব জীবনের মত সেখানেও সে তার স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করবে। মানুষের পারলৌকিক জীবনের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য তার ইহজীবনের কর্মের উপর নির্ভরশীল। এ দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ। মানুষ এ দুনিয়ায় তার নফস অর্থাৎ অন্তর নামক ক্ষেতে যা কিছু চাষ করবে কিংবা রোপণ করবে, আখেরাতে সে তারই ফসল লাভ করবে। আজ সে কিসের বীজ বপন করবে, যাতে আগামীকাল সে উত্তম ফসল লাভ করতে পারে? কোন পথটি অতিক্রম করলে সে পরজীবনে অপরিমিত কল্যাণ লাভ করবে? তার কর্মপদ্ধতিতে সে

কোন্ কর্মসূচির অনুসরণ করবে? কিভাবে সে অগণিত ভ্রান্তপথ থেকে সরল ও সঠিক পথ বেছে নিতে পারবে? বর্তমানে তার পথ প্রদর্শকই বা কে?

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন- "স্মরণ কর, সেদিনের (কেয়ামতের) কথা, যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ আহবান করব।" (বনী ইসরাঈল-৭১)

নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামের মারফত ছাড়াই মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো," সূত্র, মুসলিম, খঃ ২, পৃঃ ১২৮, মুসনাদে হাম্বল- খঃ ৪, পৃঃ ৯৬)।

মানুষের কর্মই তার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের কারণ। তাই সে তার জীবন চলার পথে, এক সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ কর্মসূচির প্রয়োজন বোধ করে। যে কর্মসূচি তার দুনিয়া ও আখেরাতের এবং দেহমন উভয়ের স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। তার পার্থিব জীবনের কর্মসূচি এরূপ হবে, যা একদিকে তার পারলৌকিক জীবনের ও রূহের ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হবে না। আর অপরদিকে তার রূহ বা নফসের কর্মসূচিকে নির্ধারণ করবে, যা তাকে নিরাপদ বাসস্থানে পৌঁছে দেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে। মানুষ কি নিজেই তার সৌভাগ্য লাভের জন্য এরূপ একটি পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম কর্মসূচি (সংবিধান) নিজ বুদ্ধি চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারণ করতে পারে? সে কি তার আত্মিক ও পরকালের চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত? আচ্ছা মানুষ কি দেহ ও আত্মা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত? সে কি জানে যে, কোন বিষয় এবং কোন কাজটি তার ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ? কোন সব কাজ মানুষের অন্তরকে নিষ্প্রভ ও কলুষময় করে তোলে? মানুষ কি একাকী তার সরল সঠিক ও সৌভাগ্যের পথটিকে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ থেকে বেছে নিতে পারে? না.....সে পারে না! তার জ্ঞান এত বিস্তৃত নয়। মানুষ তার এ স্বল্পায়ু ও সংকীর্ণ চিন্তাবুদ্ধির দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে না। তাহলে কে করতে পারে?

একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও সে ক্ষমতা নেই। কেননা তিনিই হচ্ছেন, মানুষ ও সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা। তাই একমাত্র তিনিই এ সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের সব রহস্য ও জটিলতার পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সৌভাগ্য লাভের পন্থা ও উপায় সম্বলিত কর্মসূচি নির্ধারণ করেন। অতঃপর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, নবী, রাসূল, ইমাম, খলিফা, বা এক কথায় হাদীর দ্বারা তা পৌঁছান। যাতে সে আল্লাহর কাছে কোনরকম অজুহাত দেখাবার প্রয়াস না পায়, যেমন, আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন:- "তিনিই গায়েবের একমাত্র জ্ঞানী। তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত কোন রাসূল ব্যতিরেকে।" **(**জীন**-**২৬**-**২৭**)**

"আমিই আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত ছিল না যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।" **(**ফাতির**-** ২৪**)**

দ্বীন হচ্ছে মানুষের বৈষয়িক, আত্মিক, পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কর্মসূচি, যা মহান আল্লাহ্ পথপ্রদর্শক হাদীদের মাধ্যমে মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। হাদীরা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানব যেমনঃ আল্লাহ্র মনোনীত প্রতিনিধি, যাঁরা আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা আল্লাহ্র ঐশী কর্মসূচি শুনতে পান, ধারণ করেন ও মানব জাতির হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেন। হাদীরা, আল্লাহ্র ব্যাপারে মানুষের সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও ভালবাসার স্বভাবকে জাগিয়ে তোলেন। ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে উপদেশ প্রদান, এরশাদ হয়েছে:-

"এবং আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন**,** কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকার করে থাকে।" **(**যারিয়াত**-**৫৫**)**

পবিত্র কোরআনে দু'টি বিষয় পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, চিন্তার জাগ্রত করণ এবং স্মরণ করানো। চিন্তার জাগ্রতকরণ অর্থ কোন জিনিস সম্পর্কে চিন্তা জাগানো, যে বিষয় সম্পর্কে একজন কিছুই জানে না এবং যে সম্পর্কে সে অজ্ঞ, তা প্রকাশ করে দেওয়া। আর

দ্বিতীয় হচ্ছে, স্মরণ করানো, অর্থ (নসিহত) একজন যা ইতিপূর্বেই জানে, তা স্মরণে এনে দেওয়া বা নসিহত করা। অন্য কথায় মনের দু'টি অবস্থা আছে, যথা অজ্ঞতা এবং সুপ্ততা। একজন হয়তো তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ কারণ সে সচেতন ও জাগ্রত নয়। আবার আর একজন হয়তো তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ, কারণ সে ঘুমন্ত কিংবা স্বপ্নের অবস্থায় আছে। এবং যেহেতু সে তার জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না, তাই সে ভেড়ার পালের সাথে গা ভাসিয়ে দেয়, এটা বাহ্যতঃ স্বপ্নের অবস্থা। আল্লাহ্ তাঁর নবী (সাঃ) কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি শুধু অজ্ঞ লোকেদেরই সম্মুখীন হবেন না বরং উদাসীন বা অবহেলাকারী লোকও পাবেন। এজন্য আল্লাহ্ তাঁর নবী (সাঃ) কে আদেশ দেন যে, অজ্ঞ লোকেদের চিন্তাকে জাগ্রত করেন, যাতে তারা জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু যারা জ্ঞান সম্পন্ন সঠিক পথ থেকে উদাসীন, তাদেরকে কেবল স্মরণ করিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ দেন যে তিনি উদাসীন বা অবহেলাকারী লোকেদেরকে শুধু স্মরণ করে দিবেন এবং যারা অজ্ঞ তাদের চিন্তা ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবেন, যাতে করে তারা নিজেরা যখন সচেতন হবে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তপথ থেকে সঠিক পথে চলায় মনোযোগী হবে। যেমন একব্যক্তি টিকিট কেটে ঘুমিয়ে আছে এবং ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যদি আপনি এ ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলেন, তবে সে নিজেই দৌড়ে ট্রেন ধরতে যাবে। এ সময় ঘুম যে তার জন্য ক্ষতিকর এ কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না। মানুষের লুকায়িত চেতনা অনুভূতি এ রকমই। নবী (সাঃ) ঐ চেতনা অনুভূতি জাগাবার জন্যেই এসেছেন। একজনের ভেতরে যে লুকায়িত চেতনা অনুভূতি আছে, তাকে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের কাছে জাগ্রত করার মাধ্যমেই ঈমান জাগ্রত হয়। এজন্য ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারে, কোন জোর জবরদস্তি নেই। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সত্যপথ ভ্রান্ত পথ থেকে।" **(**বাকারা**-**২৫৬**)** আল্লাহ্ সত্যত্যাগীদের অবস্থা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "বরং এ রাসূল তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশ

সত্যকে অপছন্দ করে।" (মু'মিনুন-৭০) "আমি তো তোমাদের কাছে সত্য (হক) পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যের (হকের) প্রতি ঘৃণা পোষণকারী।" (যুখরুফ-৭৮) "এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র নেয়ামত সম্পর্কে জেনে শুনে অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশ ই অকৃতজ্ঞ।" (নাহল-৮৩) "কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না, তাই তারা সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আম্বিয়া-২৪)

ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস, আগ্রহ এবং আনুগত্যের একীভূত নাম। সুতরাং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা অর্জন করা যায় না। এর সঠিক পন্থা হচ্ছে, মানুষের স্থিরতা ও জ্ঞানের নিকট আবেদন এবং সুন্দর পরামর্শ ও সদুপদেশ। যুক্তির মাধ্যমে খোদার জ্ঞানকে লাভ নিশ্চিত ও বিচারের ভিত্তি পাটি হচ্ছে, ঘৃণা আদর্শ এবং মানুষের সুপ্ত আত্মা ও চিন্তা শক্তির নিকট আবেদন জানানো। সততার ও সত্যের দেশ প্রচারের এটাই সঠিক পন্থা। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে প্রকৃত সত্য জানা ও সেই পথে চলার তৌফিক দেন। আমিন।

"আরজ গুজার" মোহাম্মদ নাজির হোসাইন

নিবেদন

জ্ঞানের চেয়ে বড় আর কোন সম্পদ এই পৃথিবীতে নেই। এটি এমন এক মহামূল্যবান ও স্থায়ী সম্পদ যা প্রচুর পরিমাণে দান করলেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না, জ্ঞান হচ্ছে নূর বা আলো, যা পৃথিবীর মানুষকে সম্মান দেয় ও সঠিক পথ দেখায়। জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সুদূর চীন যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে, আর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূর করা। অনৈক্য ও বিভেদ মুছে ফেলা। আর সত্যের চূড়ায় আরোহণ করা। মানবজাতির মাঝে বিদ্যমান অকল্যাণের মূলোৎপাটন ও চোখের সামনে থেকে অজ্ঞতার পর্দা অপসারণের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টিতে সঠিক আশরাফুল মাখলুকাতের জীবনকে গড়া। বন্ধ কপাট উন্মোচনের মাধ্যমে সেই প্রকৃত সত্য দ্বীন যার অনুসরণ সকলের উপর অপরিহার্য, সেই প্রকৃত সত্য (সিরাতে মুস্তাকিম) অনুসরণ করে, সকলে একযোগে ঐশী রজ্জু ধারন করে, জ্ঞান ও সঠিক আমল এর দিকে এগিয়ে যেতে পারি ও সত্যের পতাকার ছায়ার নিচে সমবেত হতে পারি। যা আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শের জন্ম দেবে এবং একে অপরের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান সময়ে সমাজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, বিশেষ করে মুসলমান জাতি, কেন? অশিক্ষা, দারিদ্রতা, অনৈক্য, সঠিক নেতৃত্বের অভাব ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার যেন মুসলমানদের ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে গেছে। মুসলমানদের জন্য এই মুহূর্তে চিন্তার বিষয় হলো যে, আসলে ইসলাম কি এটাই চায় যে, মুসলমানরা শিক্ষা থেকে দূরে সরে অজ্ঞতার পঙ্কিলতায় হাবুডুবু খেতে থাকবে? ইসলাম কি এটাই চায় যে, মুসলমানরা গরিব, মিসকিন হয়ে অপরের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হবে? ইসলাম কি এটাই চায় যে, মুসলমানরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থেকে একটি

সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণে ব্যর্থ হবে? ইসলাম কি এটাই চায় যে, মুসলমানরা এতই দুর্বল হয়ে থাকে যে, অন্যেরা যে যেভাবে পারে মুসলমানদেরকে হত্যা করে সর্বস্ব লুটে নেয় এবং পৃথিবীর সামনে একটি মান মর্যাদাহীন জাতিরূপে চিহ্নিত হয়? না, বিষয়টি মোটেই এমন নয়। ইসলাম তো মুসলমানদেরকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চতম শিখরে দেখতে চায়। তবে এটা তখনই সম্ভব, যখন মুসলমানরাও মনেপ্রাণে সেই একি ভাবনা পোষণ করবে ও পবিত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করবে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম যেখানে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদাত বন্দেগীর শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে ইসলাম জ্ঞান অর্জন বা সমৃদ্ধ হওয়ারও তাগিদ দিয়েছে। যেমন, "অতঃপর জ্ঞানীদের (আহলে জিকিরকে) জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (নাহল-৪৩) এই জ্ঞানীদের সন্ধান করতে হবে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে আহলে জিকির বলে ঘোষণা দিয়েছেন ও এটাও পরিষ্কার করে দিলেন যে, যার তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা সঠিক হবে না, শুধু মাত্র তারাই সঠিক জ্ঞান দিতে পারবে, যাদের আল্লাহ্ সঠিক জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন। আবার যখন ঐক্যের বিষয় সামনে এলো, তখন এরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন (ফিরকাবন্দী) হয়ো না।" (আলে ইমরান-১০৩) আরো এরশাদ হচ্ছে:- "নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার (নবীজীর) কোন সংস্রব নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত।" (আনআম-১৫৯)

আসলে মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। ইসলামের চাদর তো গায়ে চাপিয়েছে কিন্তু, শরীরে ইসলামের প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেনি। ইসলামে জ্ঞানার্জনের জন্য যেখানে তাগিদ রয়েছে, আমরা মুসলমানরা সেখানে পার্থিব ধন সম্পদ অর্জনের ও ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। একথা সত্য যে, ধন সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছেও থাকে। মূর্খরা যদি এগুলো অর্জন করেও নেয়, তাহলে তা হবে সাময়িক। যেমন সাময়িকভাবে মুসলমানরাও পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছিল। কিন্তু

ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে, এই বিজয় স্বপ্নে পর্যবসিত হয়। যার পরিণাম হল, এই মুসলমান কাল যেখানে শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ সে শাসিত হচ্ছে। যেখানে যেখানে নাম সর্বস্ব মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা শাসন আছে, ঠিক সেখানে বিদেশী শক্তিরও প্রভাব আছে। বরং বলা যায় যে, সেখানে বিদেশীদেরই প্রকৃত শক্তি বিরাজ করছে, আর আমাদের মুসলিম শাসকরাতো ঐ প্রদীপের ন্যায়, যার দ্বারা নিজ গৃহে আগুন লাগে। যদিও আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের এই জ্ঞানটুকুও নেই যে, আমাদের ঘরে আগুন জ্বলছে। মুসলমান ভাইরা যারা একই উৎস থেকে উৎসারিত ও অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে, তারা পরস্পর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা মূর্খের ন্যায় এতটা সীমালঙ্ঘন করছি যে, আলোচনা ও বিতর্কের সীমা পেরিয়ে তা অস্ত্র ধারণ ও একে অপরকে আক্রমণে পর্যবসিত হচ্ছে। এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে মেতে উঠেছে, কিন্তু পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "কোন মোমিনকে যে ব্যক্তি জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে। তার উপর আল্লাহ্র লা'নত (অভিশাপ) এবং তার জন্য বড় ধরনের আযাব তৈরি করে রেখেছেন।" (নিসা-৯৩) আরো এরশাদ হচ্ছে, "কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলো, সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।" (মায়দা-৩২) নবী (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, "একজন মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার হাত এবং মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।" সূত্র, সহীহ আল বুখারী, খঃ ১, হাঃ ৯, ১০।

"আজ আমরা সবাই নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা কোন কাতারের মুসলমান?" এই মহা সমস্যাটি সেই অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই মহা সমস্যা একদিকে আমাদের চিন্তার দিকে আহ্বান করছে, অন্যদিকে আমাদের অন্তরকে দুঃখভারাক্রান্ত করছে। এ মহা সমস্যার কারণ কি? কারণ একটাই, আমরা নবী (সাঃ) এর সেই সাবধান বাণী ভুলে গিয়েছি বা অনুসরণ করছি না, যা তিনি বিদায় হজ্জে প্রায়

এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবাদের মাঝে ঘোষণা করেছিলেন, “হে মানবসকল নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এমন দু’টি ভারি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি এ দু’টিকে আঁকড়ে ধরে থাক (অনুসরণ কর) তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। প্রথমটি হচ্ছে, পবিত্র কোরআন ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার ইতরাত, আহলে বাইত, যদি একটিকে ছাড় তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে”।

সূত্র, সহীহ তিরমিজি, খঃ ৬, হাঃ ৩৭৮৬, ৩৭৮৮ (ই,ফাঃ) মেশকাত, খঃ ১১, হাঃ ৫৮৯২, ৫৮৯৩, (এমদাদীয়া) তাফসীরে মাযহারী, খঃ ২, পৃঃ ১৮১, ৩৯৩, (ইফাঃ) তাফসীরে হাক্কানী (মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী), পৃঃ ১২, ১৩ (হামিদীয়া) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ ৪, পৃঃ ৩৩ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) মাদারেজুন নাবুয়্যাত, খঃ ৩, পৃঃ ১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী) ইযায়াতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ ১, পৃঃ ৫৬৬।

পথভ্রষ্টতা থেকে নাজাত পাওয়ার সনদ হচ্ছে, নবী (সাঃ)-এর ইতরাত বা আহলে বাইত এর অনুসরণ। এই সাবধান বাণী তিনি সেই সময় সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, সাহাবাদেরও আহলে বাইত এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক, আর আমরা যদি আহলে বাইতকে অনুসরণ না করি, তবে পথভ্রষ্টতা থেকে নাজাত পাবো কি?

“আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী তার তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন যে, “নবী (সাঃ) আহলে বাইত এর কথা এজন্য তাগিদ করেছেন যে, হেদায়াত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে আহলে বাইতই পথপ্রদর্শক।”

সূত্র, তাফসীরে মাযহারী, খঃ ২, পৃঃ ৩৯৩, (ই,ফাঃ) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ ৪, পৃঃ ৩৩।

“নবী (সাঃ) আবার অন্য জায়গায় এই সাবধান বাণী ও উচ্চারণ করে বলে গেছেন যে, “আমার উম্মত আমার পর ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, ১ দল ছাড়া সকলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” সূত্র,

মুসতাদরাক হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১০৯, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৩, পৃঃ ১৪, তিরমিজি, খঃ ৫, হাঃ ২৬৪২, (ই,ফাঃ)।

নবীর উম্মত হওয়ার পরও আমরা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব? কারণ শুধু এটাই যে, নবীজীর পর যাঁদেরকে নবীজী অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছিলেন, আমরা তাঁদেরকে অনুসরণ করছি না। আমরা নবীজিকে শুধু মুখেই মানছি কিন্তু ধর্ম পালন করছি নিজেদের মনমতো। নবী (সাঃ) আরো বলে গেছেন, "আমার উম্মতের একটি দল **(**মাযহাব**)** সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" সূত্র, সহীহ মুসলিম, খঃ ৫, হাঃ ৪৭৯৭, (ই,ফাঃ)।

আমাদের সেই হক মাযহাব খুঁজে বের করতে হবে, যদি নাজাত পেতে চাই। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেদিকেই দৃষ্টি দেই, সেদিকেই একটা মাযহাব দেখতে পাই এবং সবাই এই দাবিটাই করছেন যে, আমরাই হলাম সেই হক মাযহাব, "কিন্তু নবীজি বলেছেন**,** শুধুমাত্র একটা দলই সঠিক পথে থাকবে।" মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল যেমন, হানাফী, মালেকি, শাফায়ী, হাম্বলী, দেওবন্দি, বেরেলভি, আহলে হাদীস, ওহাবী, সালাফী, শিয়া ইসনা আশারিয়া, ইত্যাদি। তরীফত পন্থিদের মধ্যে আবার ভাগ যেমন, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, ওয়েসিয়া, নকসাবন্দিয়া, নিজামিয়া, আরো কত কি? মজার বিষয় হচ্ছে, সবাই নিজেকে জান্নাতী দল বা হকপন্থি দল দাবি করছেন, যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই সত্য ও হক মাযহাবের সন্ধান আমরা নবীজির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবো, কারণ তিনিই হচ্ছেন আমাদের এই সমস্যার একমাত্র সমাধানকারী।

"তবে না**;** আপনার রবের কসম**!** তারা মু'মিন হবে না**,** যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে**,** সেসব বিবাদ**-**বিসংবাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়**,** তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা**-**সংকোচ বোধ না করে**,** আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" **(**নিসা**-**৬৫**)**

"প্রথম তিন শতাব্দীর প্রজন্মগুলো কখনোই এই দলগুলোর (মাযহাবের) কোনোটি অনুসরণ করেনি। সর্বকালের সেরা সেই তিন প্রজন্মের সময় এই দলগুলো কোথায় ছিল?

- হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- মালিক ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- আল শাফায়ী ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- ইবনে হাম্বল ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ বুখারী (ইমাম বুখারী) ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ মুসলিম (ইমাম মুসলিম) ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ নাসায়ী ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ তিরমিযী ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ আবু দাউদ ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- সহীহ ইবনে মাজাহ ২০৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- আল আশয়ারী ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- ওয়াহাবী নজদী ১১১১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।"

"শিয়ানে আলী বলতে, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আলে মুহাম্মদের অনুসারীদের বুঝায়।"

অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সুন্নি আলেম আল মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, আলী (আ.) এবং তাঁর শিয়া সংক্রান্ত হাদীস নিয়ে আলোচনায় লিখেছেন:-

"'শিয়া' উপাধিটি সর্বপ্রথম সেই সমস্ত মুহাজির ও আনসারদের দেওয়া হয়েছিল যারা আলী (আ.)-এর প্রতি আনুগত্য (বায়াত) প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর খেলাফতকালে তাঁরা ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুসারী। তাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন, সর্বদা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং আলীর আদেশ ও নিষেধগুলো মেনে চলতেন। প্রকৃত শিয়া তারাই যারা "৩৭ হিজরিতে এসেছিল", (তোহফা ইতনা আশারিয়া, পৃষ্ঠা ২৭)।"

নবী (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবুজার আল গিফারী (রাঃ) একদা পবিত্র কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, "হে লোক সকল। আশা করি তোমরা আমাকে ভাল করেই চিন এবং জান। আর তোমাদের মাঝে কেউ যদি এমন থেকে থাকে, যারা আমার পরিচয় জানো না, তাদের কাছে আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি আবুজার আল গিফারী। রাসূল (সাঃ) এর একজন ঘনিষ্ঠ

সহচর। আর এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের দরুণ, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, "আমার আহলে বাইত এর সদস্যগণ, মানুষের জন্য (মানবজাতির জন্য) তেমনি আশ্রয় ও নাজাতের কিস্তি যেমন, আল্লাহ্র নবী হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তি মহা প্রলয়ের সময় তার কওমের আশ্রয় ও নাজাতের প্রতীক ছিল। অর্থাৎ, যারাই হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তিতে উঠেছিল, (উঁনার কথার অনুসরণ করেছিল) তারাই মহাপলয় থেকে নাজাত পেয়েছিল, তেমনি এই উম্মতের যারা আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসবে, (অনুসরণ করবে) তারাই নাজাত পাবে ও যারা অনুসরণ করবে না তারা ধ্বংস হবে।"

সূত্র, মেশকাত, খঃ ১১, হাঃ ৫৯২৩, আস সাওয়ায়েকে মোহরেকা (ইবনে হাজার হায়সামী), পৃঃ ২৩৪, তাফসীরে কাবীর, খঃ ২৭, পৃঃ ১৬৭, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ২, পৃঃ ৭৮৬, কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, পৃঃ ২৫৬, মানাকেবে ইবনে মাগাজিলি, পৃঃ ১৩২, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১৫১, খঃ ২, পৃঃ ৩৪৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ ২৩৩, আরবাঈন নাবহানী, পৃঃ ২১৬, তারিখে খোলফা, পৃঃ ৩০৭, যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ ২০, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১৫০ (ইবনে হাজার মাক্কি)।

আর সেই আহলে বাইত-এর প্রথম সদস্য হযরত আলী (আঃ) নাহজুল বালাঘাতে বলেছেন, "তোমরা কখনো সত্য ও হেদায়েতের পথকে চিনতে পারবে না, যতক্ষণ না এ পথ পরিত্যাগ কারীদের চিনবে এবং কোরআনের যুক্তি ও মানদণ্ডকে কখনোই অনুধাবনে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না এর বিরোধী ও লঙ্ঘনকারীদের চিনবে। কোরআনের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত সংযুক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তিবর্গকে চিনবে যারা কোরআনকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং, কোরআনকে তাঁর প্রকৃত ব্যাখ্যাকারীদের থেকে গ্রহণ করো, যাঁরা জ্ঞানের প্রাণ ও অজ্ঞতার মৃত্যুদানকারী। তাঁরা এমন ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের বিচার ও ফয়সালা তোমাদেরকে তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত করবে। তাঁদের নীরবতা তোমাদেরকে তাঁদের যুক্তির ক্ষুরধারতা সম্পর্কে এবং তাঁদের বাহ্যিক আচরণ তোমাদের তাঁদের অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানাবে। তাঁরা দ্বীনের বিরোধিতা

করতে পারেন না এবং এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বেও পতিত হন না। কোরআন তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষ সাক্ষীস্বরূপ নীরব বর্ণনাকারী।” সূত্র, নাহজ আল বালাঘা, খুতবা- ১৪৬, (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এজন্য আনন্দিত যে, সে চায় আমার মত জীবন যাপন করতে, আমার মত মৃত্যুবরণ করতে ও আমার প্রতিপালকের চিরস্থায়ী বেহেশতে বাস করতে, সে যেন আমার পর আমার আহলে বাইতের অনুসরণ করে। কারণ তারা আমার সর্বাধিক আপন এবং তারা আমার অস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে, আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকেই তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেছে। ধ্বংস আমার সেই উম্মতের জন্য যারা তাদের (আহলে বাইতের) শ্রেষ্ঠত্বকে মিথ্যা মনে করে এবং আমার ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে কর্তন করে। আল্লাহ্ আমার শাফায়াতকে তাদের জন্য হারাম করুন।” সূত্র, কানজুল উম্মাল, খঃ ৫, পৃঃ ২১৭, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৫, পৃঃ ৯৪, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১২।

“আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” (আলে ইমরান-১০৫)

“তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু’মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে, সেসব বিবাদ-বিসংবাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে, আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” (নিসা-৬৫)

বিষয়টা আমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী (সাঃ) এর কথা মত সেই একটা দল জান্নাতী হবে, সেই দলটি হচ্ছে, যারা নবীর পর তাঁর পবিত্র আহলে বাইত এর অনুসরণ করছে, আর বাদ বাকীরা পথভ্রষ্ট, নবীজির কথা মত, তাই নয় কি? আমি সবাইকে আহ্বান করবো আসুন আমরা সবাই নবীজির কথামত নবীজির ইতরাত বা আহলে বাইতের নাজাতের কিস্তিতে আরোহন করি ও বিভেদ মুছে ফেলি,

তাইতো আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেছেন, “আমাদের লাভ লোকসান সবই এক। আমাদের সকলের নবী এবং দ্বীনও এক, পবিত্র কা’বা ও পবিত্র কোরআন সবই এক। হায়! কত ভালোই না হত, যদি মুসলমানরাও এক হতে পারত”। আমি এই গ্রন্থটি প্রত্যেক সত্য প্রত্যাশী জ্ঞানীদেরকে পড়ার এবং বোঝার আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন আপন চিন্তা শক্তির মাধ্যমে ও গভীর অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে দলমত নির্বিশেষে নিরপেক্ষতার সাথে অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ বেছে, সেই পথে ইহজগত ত্যাগ করতে পারেন”।

“যারা মন দিয়ে কথা শোনে, ভালগুলোর অনুসরণ করে, এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ হেদায়াত করেছেন তারাই বুদ্ধিমান।” (যুমার-১৮)

“আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে, তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।” (বাকারা-৩৯)

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।” (বাকারা-৪২)

“অবশ্যই তাদের মধ্যে একদল, সত্যকে জেনেও গোপন করে।” (বাকারা-১৪৬)

“আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষকে। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা (সত্য) বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা (সত্য) দেখে না, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা (সত্য) শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম....।” (আরাফ-১৭৯)

পরিশেষে বইটি সত্যান্বেষী মানুষের হেদায়াতের উপকরণ হলে ও মুসলমান ভাইদের মাঝে ঐক্যের পথ সুগম হলেই শ্রম সার্থক হবে।

নামের শেষে ‘আলাইহিস সালাম’ (আঃ) কেন?

আহলে বাইত এর অনুসারীগণ ছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ আলেমগণও শুধু নবী, রাসূলগণের নামের পাশেই ‘আলাইহিস সালাম’ (আঃ) ব্যবহার করেননি, বরং নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতের সদস্যগণের নামের পাশেও ‘আলাইহিস সালাম’ (আঃ) ব্যবহার করেছেন। কারণ, যাঁদেরকে আল্লাহ্’তায়ালা বিচারের ঊর্ধ্বে রেখেছেন এবং যাঁদের উপর আল্লাহ্’তায়ালার সালামাতই সালামাতী। তাই প্রমাণ স্বরূপ কিছু সূত্র উল্লেখ করা হলো।

যেমন, তাফসীরে নুরুল কোরআন (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) খঃ, ৩, পৃঃ, ২০৪ ও ২৭০ (১৯৮৭, ইং)। আল্লামা আবু বকর জাসসাস তার আহকামুল কোরআন এর ৭১ পৃষ্ঠায়, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী তার রাহাতুল কুলুবের ২৮, ১০৭, ১৬১, ১৮৪, ১৯৪ পৃষ্ঠায়, ডাঃ তাহেরুল কাদরী, তার মানাকেবে ফাতেমা যাহরায়, ১৫, ১১১ পৃষ্ঠা, মারাজাল বাহরাইন ফি মানাকেবে আল হাসনাইন, ১৩, ১১৭, পৃষ্ঠায়, আল্লামা শিবলী নুমানী তার, সফর নামা রোম, মিশর, শামের, ১২০, ২০৭, ১৬১, ১৮৪, ১৯৪ পৃষ্ঠায়, আল মামুন, ১৩, ২০৮, মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান খান আহলে হাদীস, তার আনোয়ারুল লুগাতে, ১০, ৩৬, ৭৬ পৃষ্ঠায়, শাহ সালামাতুল্লাহ, তার তেহবিরে শাহাদাতায়েন, ১৪, ২১, ২৫, ৪৯ পৃষ্ঠায়, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী, তার, মাতারেজুন নবুওয়াত, খঃ, ২, পৃষ্ঠা ৫৪৫, শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, ফাতাওয়ায়ে আজিজি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৪, ২৫৪, সিদ্দিক হাসান খান ভোপালী আহলে হাদীস তার হায়াষ আল কারামা ফি আসারুল কারামা, ১৭৯ পৃষ্ঠায়, শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী তার সিররুশ শাহাদাতাইনে, ১৬, ৩৮ পৃষ্ঠায়, তারিখে ফাখরী, ৮৪, পৃষ্ঠায়, আল্লামা মাসুদী তার মেরাজুল জেহাবে, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪২ (মিশর) তারিখে তাবারী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা

১৯৮, ২১৬, ২৩৩, ২৬৯ (মিশর) সহীহ আল বুখারী (ডাঃ মুহাম্মদ মুহসিন খান, ওয়াহাবী) খণ্ড ৫, হাদিস ৫৫ ও ৯১ (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আল মাদীনা আল মুনাওয়ারা) (আরবী, ইংরেজী অনুবাদ)। এঁরা সবাই, তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে আহলে বাইত এর নামের পাশে "আলাইহিস সালাম" ব্যবহার করেছেন।

তাই এখানে এই নীতিটিকে অনুসরণ করা হলো। আর, এতো সূত্র উল্লেখ করার পরও যারা সন্দেহে ভুগছেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ইমাম মাহদী (আঃ) এর নামের শেষে "আলাইহিস সালাম" কেন লেখা হয়? তিনি তো নবী বা রাসূল নন, এটার সঠিক উত্তর খুঁজে নিলেই, আহলে বাইত (আঃ) এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লেখার মারফতও জানা হয়ে যাবে, কারণ ইমাম মাহদী (আঃ) আহলে বাইত (আঃ) এর শেষ সদস্য, মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সূত্র, ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৯; আল সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ, পৃষ্ঠা ২৫০। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী, ফাতেমার বংশধর।" সূত্র, ইবনে মাজাহ, হাদিস ৪০৮৬; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকাহ পৃষ্ঠা ২৪৯।

প্রথম সদস্যদের, "আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (আঃ)" এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লিখা যাবে না, কিন্তু শেষ সদস্যের "ইমাম মাহদী (আঃ)" এর নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" লিখতে কারো কোনো দ্বিধা নেই, কেন? একটু ভেবে দেখেছেন কি?

অধ্যায়-১

মানব সৃষ্টির প্রথম হেদায়েতকারী ছিলেন ঐশী মানব হযরত আদম (আঃ) অতএব, সৃষ্টিজগতকে সার্বিক ভাবে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ঐশী আলো। আর সৃষ্টি জগতের পরিসমাপ্তিতেও থাকবেন একজন ঐশী মানব, যিনি ইমাম মাহদী (আঃ) নামে পরিচিত। হয়তোবা এর মূলতঃ কারণ হল, মানব জাতি সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে যেন মহান

আল্লাহ্র সম্মুখে কোন প্রকার অজুহাত উপস্থাপনের অবকাশ না পায়। হে'দায়েতের এই দুই বন্ধনীর মধ্যে অবস্থান করছে মানব জাতি। সুতরাং মানুষ কখনো ঐশী পথ প্রদর্শক শূন্য অবস্থায় থাকবে না। নবী (সাঃ) দুনিয়াতে আগমন করে, নবী ও রাসূল আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি হলেন, শেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁর অবর্তমান কাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ সময়ে মানব জাতিকে সত্যের দিক নির্দেশনা দেবে কে? আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে, সত্যে অবিচল আছি? আজ দুজন মুফতি বিপরীত মুখী দু'রকম কথা বলেন। প্রত্যেকটি মাযহাব অন্য মাযহাবকে বিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে থাকেন। তাহলে প্রকৃত সত্যের আলো কোথায় পাওয়া যাবে?

"সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকা**"!** আপনার কাছেই যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলের যুগের মতোই মুসলমানগণ যদি আজ একটিই একক জাতি হিসেবে থাকত, তাহলে কেমন হত? মানব জাতি আজ চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যদি প্রশ্ন করি, এত সব ফিরকা বা মাযহাবের উৎপত্তির মূল কারণ কি? তাহলে কি উত্তর দিবেন? নিশ্চয় আমি ও আপনার মত সাধারণ লোকেরা এত সব মাযহাবের সৃষ্টি করেনি। তাহলে করলো কারা? আর যারা মাযহাব সৃষ্টি করেছেন তারা কি ভালো কাজ করেছেন? মাযহাব হল রাসূলের (সাঃ) আদর্শকে ভুল অনুধাবনের একটি ফল। যাকে আমরা মাকাল ফলের সাথে তুলনা করতে পারি। যার বাহ্যিক অবয়ব অতি সুন্দর, ইসলামের মতোই, কিন্তু অভ্যন্তরে অবস্থান করছে আমাদের কামনা বাসনায় তৈরি এক নতুন আদর্শ। আজ কোন মাযহাবই স্বীকার করবেন না যে, তারা নবী (সাঃ)-এর আদর্শকে ভুল অনুধাবন করেছেন। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, রাসূল (সাঃ) আজকের দিনের অবস্থা সম্পর্কে ভালো ভাবে অবগত ছিলেন। কেননা একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে:-

“মহানবী (সাঃ) বলেছেন, “আমার উম্মতেরা আমার পর ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এদের মধ্যে ১টি দল পরকালে মুক্তি পাবে, আর বাকি দলগুলো পথভ্রষ্ট বা তারা জাহান্নামী হবে।”

সূত্র, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০৯, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৪, তিরমিজি, খঃ, ৫, হাঃ, ২৬৪২, (ই,ফাঃ)।

এখানে, আমার উম্মত বলতে কেবল মুসলমানদের কথাই বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন আর এজন্যই মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করতেই একথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই অবস্থা থেকে মুক্তি বা সত্যপথ পাওয়ার কি কোন দিক নির্দেশনা তিনি দিয়ে যাননি? যদি তিনি পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তাহলে তা আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করা উচিত। আর, যদি কোন পথনির্দেশনা না দিয়ে থাকেন, তবে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। যথাক্রমে, তিনি তাহলে কিভাবে রাহমাতাল্লিল আলামিন হলেন? যিনি উম্মতের সমস্যাকে শনাক্ত করতে সক্ষম কিন্তু সমাধান দিতে পারেন না।

কেয়ামতের দিন আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে অজুহাতের স্বরে বলতে পারবো যে, ইয়া রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে আমরা বিভিন্ন দলের বা মাযহাবের দেখানো পথের অনুসরণ করেছি। কোন্ পথে চলতে হবে সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর কোন দিক নির্দেশনা পাইনি। তাই আমরা জন্ম সূত্রে বা হাতের কাছে যে মাযহাব বা দল পেয়েছি, তারই অনুসরণ করেছি। কিন্তু এরকম সকল প্রকারের বাহানার ভিত্তিকেই মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বাতিল করে দিয়েছেন।

“সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের আমি এজন্য প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্র সামনে মানুষের কোন ওজর আপত্তি না থাকে।” (নিসা-১৬৫)

তাই আমরা কোরআনের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, মহানবী (সাঃ) কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে মানবজাতিকে বিভিন্ন ভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এ জাতীয় বিশ্বাসই সর্বাধিক সত্য ও

কোরআন ভিত্তিক বিশ্বাস। কিন্তু প্রশ্ন হল, যখন সমস্ত মাযহাব বলছে যে, সত্যের আলো তারাই বহন করছেন, তখন সেখানে আমরা কিভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত ও আল্লাহ্ প্রদত্ত পথকে বেছে নিতে পারবো?

এখন আমরা ইমাম বা নেতা শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করবো। ইমাম বা নেতা তাকেই বলা হয়, যে একদল লোককে নির্দিষ্ট কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অথবা ধর্মীয় লক্ষ্যে এক কথায়, ইহজগত ও পরজগত উভয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য নেতা তার নেতৃত্বের পরিধির বিস্তৃতি ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে সময় ও পরিবেশগত পরিস্থিতি অনুযায়ী পবিত্র ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের সকল দিক পর্যবেক্ষণ পূর্বক তার জন্যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বিশ্লেষণপূর্বক তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেছে। পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে ও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন ও তার পরিচালনার ব্যাপারেও ইসলামের হস্তক্ষেপ রয়েছে, ঠিক একই ভাবে মানুষের সামাজিক (পার্থিব) জীবন ও তার পরিচালনার (রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা) ক্ষেত্রেও ইসলামের পথ নির্দেশ রয়েছে। উপরে মানব জীবনের যে সব দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি দিকে গুরুত্বের অধিকারী। সেই দিকগুলো হচ্ছে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার ও আইন কানুন বর্ণনা এবং আধ্যাত্মিক জীবনে নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশনার দিক। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজের জন্যে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিকের নেতৃত্ব দানের জন্য নেতার প্রয়োজন অপরিহার্য। যিনি ইসলামী সমাজের এ তিনটি দিকের উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবেন, অবশ্যই তাঁদের মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর দ্বারা মনোনীত হতে হবে। যা আমরা পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রাসূল (সাঃ)-এর দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

অধ্যায়-২

মানুষ তার খোদা প্রদত্ত স্বভাব দিয়ে অতি সহজেই এ বিষয়টি উপলব্ধি করে যে, কোন দেশ, শহর, গ্রাম বা গোত্র এবং এমনকি গুটি কয়েক লোক সম্বলিত কোন একটি সংসারও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া চলতে পারে না এবং নেতৃত্ব ছাড়া সমাজের চাকা সচল রাখা সম্ভব নয়। একজন নেতার ইচ্ছাই সমাজের অসংখ্য ব্যক্তির ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করে। এভাবে সে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সমাজের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নেতাহীন ঐ সমাজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য। যার ফলে, এক ব্যাপক অরাজকতা ঐ সমাজকে ছেয়ে ফেলবে। সুতরাং, উক্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, যে সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, সে সমাজ বৃহত্তরই হোক অথবা ক্ষুদ্রতরই হোক নেতা সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি যদি কখনও অস্থায়ী ভাবে অথবা স্থায়ী ভাবে তার পদ থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তার ঐ অনুপস্থিতিকালীন সময়ের জন্য দায়িত্বশীল কাউকে নিয়োজিত করে যাবেন। এ ধরনের দায়িত্বশীল কোন নেতা কোনক্রমেই এমন কাজ করতে প্রস্তুত হবেন না, যার ফলে নিজের দায়িত্বের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে, নেতার অভাবে ঐ সমাজের অস্তিত্ব ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়বে। কোন পরিবারের কর্তা ব্যক্তিও যদি কিছু দিনের জন্য অথবা কয়েক মাসের জন্য পরিবারের সদস্যদের ত্যাগ করে দূরে কোথাও ভ্রমণে যান। তখন, অবশ্যই তিনি তার অনুপস্থিতিকালীন সময়ে সংসার পরিচালনার জন্য পরিবারের কাউকে (অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে) দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করে যাবে ন। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা দোকানের মালিক, যার অধীনে বেশ ক'জন কর্মচারী কর্মরত, তারা যদি অল্প ক'ঘন্টার জন্যেও কোন কারণে কর্মস্থল ত্যাগ করেন, তাহলে অধীনস্থ কাউকে তার অনুপস্থিতিকালীন সময়ে তার দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করে যান। আর, অন্যদেরকে ঐ সব নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা আল্লাহ্ প্রদত্ত মানব প্রকৃতি অনুযায়ী পবিত্র কোরআন ও নবীজির

আমল ও আখলাক-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম একটি সামাজিক আদর্শ যার প্রকৃতি এমন দৃষ্টান্তমূলক যে, পরিচিত ও অপরিচিত সবাই ঐ আদর্শের দর্পণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। মহান আল্লাহ্ ও বিশ্বনবী (সাঃ) এই আদর্শের সামাজিকতার ক্ষেত্রে যে মহান অবদান রেখেছেন, তা সবার কাছেই অনস্বীকার্য। এই ঐশী আদর্শ পৃথিবীর অন্য কিছুর সাথেই তুলনারোগ্য নয়। এখন আমাদের কাছে যে বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে ইসলামে ইবাদত সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নিয়ম নির্দেশ প্রভৃতি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ ব্যবস্থাই মানুষকে মনুষ্যত্বের উন্নত পর্যায়ে ও আল্লাহ্র নির্দেশিত সরল সঠিক পথে পরিচালিত করার উপযুক্ত মাধ্যম। এ ধরনের তৌহিদী সমাজ ব্যবস্থার নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাসূল (সাঃ)-এর উপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু, রাসূল (সাঃ) এর পর এ নেতৃত্বের দায়িত্ব কার? এ ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কি? কেননা, ইসলামের নিয়ম-কানুন ও বিধান চিরন্তন ও সর্বকালেই প্রযোজ্য। তাই রাসূল (সাঃ)এর পরেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে অবশ্য অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। যেমন পবিত্র কোরআনের ঘোষণা:-

“আপনি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে পথ প্রদর্শক।” **(**রাদ**-**৭**)**

আরো ঘোষণা হচ্ছে, “আমিই আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত ছিল না**,** যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।” **(**ফাতির**-**২৪**)**

কিন্তু পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বাণী থাকার পর ও আমরা জানি যে, ইসলামের মহানবী (সাঃ) এর ওফাতের পর নবীজির উম্মত দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়।

এক দল- মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, “মহানবী **(**সাঃ**)** নিজের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান নি**,** উম্মতকে নেতাবিহীন দ্বিধাদ্বন্দ্বে

ফেলে ইহজগতত্যাগ করে চলে গেছেন ও তাঁর উম্মত যাকে ভালো মনে করবে তাকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে।"

আরেক দল- মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, "মহানবী (সাঃ) ছিলেন নির্ভুল ও পবিত্র। তিনি সর্বপ্রকার পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত ছিলেন। আধ্যাত্মিক ও বস্তুগতভাবে উম্মতকে পরিচালনা করার মত এবং ইসলামের সুষমা রক্ষা করার মত জ্ঞান মহানবী (সাঃ)-এর ছিল, যাতে করে ইসলাম জগতের বুকে স্থায়ীত্ব লাভ করে। তারা বিশ্বাস করেন যে, "নবী (সাঃ) পবিত্র কোরআন পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না।" উম্মতের জন্য এমন একজন নেতার মনোনয়ন, মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক হতে হবে।"

কারণ, "হযরত আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত সবাই আল্লাহ্র দ্বারা মনোনীত হয়েই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। একজনও পৃথিবীতে এসে ভাল আমল করার কারণে, তাঁদের আল্লাহ্র প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বা জনগণ দ্বারাও কাউকে নির্বাচিত করা হয় নি, কেননা, হেদায়াতকারী ও হেদায়াতকামী এক হতে পারে না, পবিত্র ও অপবিত্র এক নয়, জ্ঞানী ও অজ্ঞ এক হতে পারে না। জান্নাতের আহ্বানকারী ও জাহান্নামের আহ্বানকারী এক হতে পারে না।" পবিত্র কোরআনে এমন একটি আয়াতও পাওয়া যায় না, যেখানে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের হেদায়াতকারী হয়েছে, যেমন যেই হাদী হবেন, তিনি অবশ্যই হেদায়াতকারীর বাবা হবেন অথবা ছেলে হবেন, অথবা ভাই হবেন, এক কথায় বংশ ('আল') থেকে হবেন। এর বাইরে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারীর উপর যখনই কোন আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু আলেম বলে উঠেন, এই বিষয়ের উপর আলোচনার সময় এটা নয়। আজকের দিনে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে, নবীজির উত্তরাধিকারী নিয়ে এমন আলোচনা করা যাবে না। যা মতানৈক্য ও বিভেদের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এমন চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কেননা, ঐ সব আলোচনাই মতপার্থক্য এবং বিভেদের সৃষ্টি করে, যা

কিনা কুসংস্কার, অমুক্তি, হিংসা, ঘৃণা, ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে যে সব আলোচনা কোরআন, হাদীস, যুক্তি ও বিবেক এর ভিত্তিতে এবং পক্ষপাত ও জেদাজেদি ছাড়া হয়ে থাকে তা শুধু মতানৈক্য ও বিভেদকে রোধ করে না, বরং সেগুলো মতপার্থক্য ও দূরত্বকে বিলোপ করতে সাহায্য করে।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে আমার প্রশ্ন, পবিত্র কোরআন কি আমাদের অনুমতি দেয় যে, আমরা নবীজির পর নবীজির উত্তরাধিকারী জনগণের ভোটের মাধ্যমে, ইজমা, কেয়াস, বা শূরা কমিটির দ্বারা নির্বাচন করতে পারি কি? দেখি, পবিত্র কোরআন আমাদের কি হুকুম দিচ্ছে, যেমন এরশাদ হচ্ছে,

"আর আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এতে জনগণের কোন ক্ষমতা নেই।" (কাসাস-৬৮)

এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো যে আমাদের আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ওলামা, মাওলানা হোসাইন আহাম্মদ মাদানী সাহেবের পীর শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেহলাওয়ী সাহেবের মতে বর্ণিত যে, "আল্লাহ্'তায়ালা যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাকে কোনও খাস পদে বা গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিযুক্ত করবার অধিকার নেই।" সূত্র, আল কোরআন-অনুবাদ, শায়খুল হিন্দ, পৃঃ ৫০৯।

আল্লামা কাজী বায়জাওয়ী উক্ত আয়াতের বর্ণনায় লিখেছেন যে, "এটা সঠিক, ন্যায় ও সত্য বলে প্রকাশ পায় যে, জন সাধারণের খলিফা নির্বাচনের কোনই অধিকার নেই।" সূত্র, তাফসীরে আনোয়ারোল তানজিল, পৃঃ, ৩৩৪।

আরো দেখুন, আল্লামা হোসায়ন ওয়ায়েজ কাশাফি লিখেছেন যে, "পয়গম্বর ইসলামের খলিফা, স্থলাবর্তী বা প্রতিনিধি নির্বাচন করবার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্'তায়ালা নিজ হস্তে রেখেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সেই পদের জন্য নিজেই মনোনয়ন করেন তাতে অন্যের

(জনসাধারণের) কোনই অধিকার নেই।" সূত্র, তাফসীরে হুসাইনী, খঃ, ২, পৃঃ, ১২৬, (উর্দু)।

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ আলেমগণের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধি নির্বাচন বা মনোনয়ন করবার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নাই এবং স্বয়ং নবী (সাঃ)-এরও ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ নির্দেশ না দেন।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সেটার প্রমাণ যা তিনি আমের বিন তোফায়েলের প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন। আমের বিন তোফায়েল একজন মূর্তিপূজারক, মুশরিক, মদ্যপায়ী ও দুর্দান্ত প্রতাপশালী লোক ছিল। সে নবী (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠায় যে, ইয়া মোহাম্মদ (সাঃ) আমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তবে আমার কি সুযোগ সুবিধা লাভ হবে? উত্তরে নবী (সাঃ) বলে পাঠান যে, "অন্যান্য মুসলমানগণ যে সুযোগ সুবিধাদি পায়, তুমিও তাই পাবে। এবং অন্যান্য মুসলমানরা যা হতে বঞ্চিত তুমিও ঐ সমস্ত জিনিস হতে বঞ্চিত থাকবে, তোমার জন্যও একই নিয়ম প্রবর্তিত হবে, যা অন্যান্যদের উপর প্রবর্তিত হয়। ইসলামে সকলের সমঅধিকার আছে।" নবীজির উত্তরে সে সন্তুষ্ট হতে পারে নি, সে প্রত্যুত্তরে বলে পাঠায় যে, আমি আমার সমাজে প্রতিপত্তিশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকের ন্যায় গণ্য হব, তবে মুসলমান হওয়ায় আমার কোন লাভ নেই, বরঞ্চ আপনি যদি আমাকে আপনার স্থলাবর্তী, খলিফা করার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। উত্তরে নবীজি (সাঃ) বললেন যে, "এটা অসম্ভব কারণ খলিফা নিযুক্তিতে আমার কোনও অধিকার নাই।" সেটা একমাত্র আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে সীমাবদ্ধ, তিনি যাকে ইচ্ছা খলিফা নিযুক্ত করেন।" সূত্র, লোবাবতৌত তাওয়েল- খঃ, ৪, পৃঃ, ৭, আল্লামা বাগওয়ীর মায়ালামোল তানজিল- খঃ, ৪, পৃঃ ৭।

"এবং আমি জীন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত-৫৬)

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ্, নবী, রাসূল, ইমাম, খলিফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে, স্বয়ং নিজেই ভূমিকা পালন করেছেন বা ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর মনোনীত হাদীর দ্বারা যেমন পবিত্র কোরআনের ঘোষণা:-

"এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন অতঃপর সে তা পূর্ণ করল; তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম (নেতা) বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও? আল্লাহ্ বলেন, (হ্যাঁ কিন্তু) আমার অঙ্গীকার জালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।"
(বাকারা-১২৪)

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ, আবু বকর আল জাসসাস, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, অভিধানে ইমামের অর্থ সে ব্যক্তি, যার অনুসরণ করা হয়, সে অনুসরণ হক, বাতিল, ন্যায় ও অন্যায় যে কোন ব্যাপারেই হোকনা কেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ইমাম বলতে কেবল সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়, যে আনুগত্যের যোগ্য, যার অনুকরণ অবশ্য করণীয়। সুতরাং, "কোন জালিম নবী হতে পারে না। নবীর প্রতিনিধিও জালিম হবে না। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, ফাসেক, পাপাচারী, দুরাচারী ব্যক্তির ইমামত বাতিল। সে (ইমাম) খলিফা হতে পারে না। সে যদি নিজেই এমন পদমর্যাদায় জেঁকে বসে, তবে তার অনুগমন, অনুসরণ এবং আনুগত্য জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।" সূত্র, আহকামুল কোরআন- খঃ, ১, পৃঃ, ৭৯ (মিশর)।

ইমাম আল্লাহ্র পক্ষ হতেই নির্ধারিত হন।

কেননা প্রথমত, ইমামত হচ্ছে এক ধরনের খোদায়ী প্রতিশ্রুতি। কাজেই আল্লাহ্র পক্ষ হতে এমন কাউকে নির্ধারিত বা নিযুক্ত হতে হবে, যিনি এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি নিজের জীবনে জুলুমের সামান্য দাগও লাগিয়েছে, এই জুলুম নিজের প্রতি হোক বা অন্যের প্রতি, এমন কি এক মুহূর্তের জন্যও মূর্তিপূজার আশ্রয় নিয়েছে, সে ব্যক্তি নবী, রাসূল, ইমাম, খলিফা, বা এক কথায়

হাদী হওয়ার যোগ্য নয়। অন্য কথায়, হাদীকে আল্লাহ্র দ্বারা মনোনীত হতে হবে ও সামগ্রিক জীবনে নিষ্পাপ ও মাসুম হতে হবে। আমরা উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ পাই, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একজন নবী হওয়ার পরও, আল্লাহ্ উনাকে পরীক্ষার পর ইমাম ঘোষণা দেন। এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইমামতের পদ কোন সাধারণ পদমর্যাদা নয়। সামগ্রিকভাবে মানব সম্প্রদায়কে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন,

১. "যারা সারা জীবন অন্যায় করে চলে। ২. যারা কখনও অন্যায় করে না। ৩. যারা প্রথম জীবনে অন্যায় করেছে কিন্তু পরে ন্যায়ের পথে এসেছে। ৪. যারা প্রথম জীবনে ন্যায় করে পরে অন্যায়ের পথে গিয়েছে।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মান মর্যাদা উপরোক্ত চার শ্রেণী থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিল, "তিনি প্রথম এবং চতুর্থ শ্রেণীর, ইমামতের জন্য খোদার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর বাকি থেকে যায় দু'টি শ্রেণী অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, যারা এই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আল্লাহ্ এদের মধ্যে থেকে এক শ্রেণীকে বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সেই শ্রেণীকে, যে প্রথম জীবনে জালিম (মূর্তিপূজারী) ছিল কিন্তু পরে জুলুম থেকে তওবা করে ন্যায়ের পথে এসেছে। তাহলে, ইমামতের জন্য কেবল একটি দলই বাকী থাকে, যাঁরা সারা জীবন অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কোন জুলুম অর্থাৎ মূর্তির সামনে মাথা নত করেনি; এক কথায় তাঁরা নিষ্পাপ, মাসুম।" এখন আমরা পবিত্র কোরআনের আলোকে জানার চেষ্টা করবো যে, কে খলিফা মনোনয়ন করে। যেমন, এরশাদ হচ্ছে, "আর স্মরণ কর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তখন তারা (ফেরেশতারা) বললঃ- আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ বললেন। অবশ্যই আমি যা জানি তা তোমরা জানো না।" (বাকারা-৩০)

উক্ত আয়াত হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম খলিফা নিযুক্ত করার সম্পর্কে বর্ণিত এবং এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ্ পাক এখানে বলেননি যে, ওহে ফেরেশতারা তোমরা যেহেতু পাপ মুক্ত মাসুম, সর্বদা আমার বন্দেগীতেই মগ্ন থাক, তোমরা নিজেরাই ইজমা বা কেয়াস করে, তোমাদের ইচ্ছা মত কাউকে আমার খলিফা নির্বাচন করে লও। এটাও বলেননি যে, আমি দুনিয়া বাসীদের ইজমা বা কিয়াস দ্বারা নির্বাচনে তাদের খলিফা বানানোর অধিকার দেব। এটাও বলেননি যে, লোকে যাকে তাদের খলিফা নির্বাচন করবে। আমি তাকে সমর্থন দিব। বরঞ্চ আল্লাহ্ ঐ পদ্ধতিগুলো ত্যাগ করে দৃঢ়তার সহিত বলেছেন যে, আমি স্বয়ং দুনিয়াতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করব এবং আমারই এটা অধিকার, এটাতে অন্যের হস্তক্ষেপের কোনই অধিকার নেই। আর ফেরেশতারা যখন আল্লাহ্র কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের সেই অনুরোধকে রদ করে এক তীব্র উত্তরে তাদের অনুরোধ বাতিল ঘোষণা করলেন ও বললেন, “অবশ্যই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।”

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

যদি মাসুম, নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরই খলিফার মনোনয়ন বা নির্বাচনের কোন অধিকার নাই, তাহলে ভ্রান্তযোগ্য মানুষ, কি করে এমন মনোনয়ন বা নির্বাচনের পুরো দায়িত্ব নিজেদের উপর তুলে নিতে পারে? উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ “ইন্নি” ও “জায়েলুন” শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ আমিই (আল্লাহ্) নিযুক্ত করব। তার পর ইজমার প্রশ্ন মোটেই আসতে পারে না, কারণ “জায়েলুন” শব্দ ইসমে ফায়েলের সেগারুপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যা পূর্বে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বর্তিবে এবং “জায়েলুন এর সঙ্গে ইন্নি” শব্দ যোগ করে আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক যুগেই খলিফা নিযুক্ত করার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্’তায়ালা, অন্য কেউ এটা করলে, খোদার উপর খোদগিরি হবে, তাই নয় কি?

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ মানবজাতি সৃষ্টি করার আগে, একজন হাদীবা হেদায়েতকারীকে, হযরত আদম (আঃ) কে, প্রথমেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু কেন? কেন তিনি সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন না? এটা কি আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় নয় কি? এটার কারণ হচ্ছে, আমরা সবাই জানি, ইবলিস শয়তানের ওয়াদা, সে খোলা মাঠে আদমের (আঃ) আগে পৃথিবীতে বসে আছে, সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য, তাই আল্লাহ্ চাননা, তাঁর সৃষ্টি এটা না বলতে পারে যে, আল্লাহ্ আপনি তো আমাকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোন হেদায়াতকারী পাঠাননি, আর শয়তান তো প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিল, আমাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য, তাই আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি, আল্লাহ্ এই অভিযোগের কোন সুযোগ রাখেন নি, আল্লাহ্ চান না, তাঁর সৃষ্টি এক সেকেন্ডের জন্যও হেদায়াতকারী ব্যতীত থাকুক। তাই তিনি প্রথমে পৃথিবীতে প্রথম হেদায়াতকারী হযরত আদম (আঃ) কে প্রেরণ করার পর, সাধারণ মানুষের ধারাবাহিকতা তাঁরই মাধ্যমে শুরু করলেন, যাতে প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করার পর সঙ্গে সঙ্গে হেদায়াতের ছায়া পায়, তা থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ্ সৃষ্টিকে এক সেকেন্ডের জন্যও হাদী ব্যতীত রাখতে চান না, সেই আল্লাহ্, শেষ নবী (সাঃ)-এর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি আগমন করবে, তাদের হাদী ব্যতীত ছেড়ে দিবেন, এটা বিবেক গ্রহণ করতে চায় কি? কারণ, নবী (সাঃ)-এর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না, কিন্তু এই শরীয়তকে কে রক্ষা করবে? তাই অবশ্যই মানতে হবে যে, এমন একজন হেদায়াতকারী থাকতে হবে, যিনি এই শরীয়তের রক্ষাকারী হবেন এবং তাঁকে অবশ্যই আল্লাহ্র দ্বারা মনোনীত হতে হলে, সে নবী হবে না, সে নবীর উত্তরাধিকারী হবে, এটাই বিবেক বলে, তাই নয় কি?

যেমন এরশাদ হচ্ছে,

"আমি এ কিতাবের অধিকারী (ওয়ারিশ) করেছি, তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি।" (ফাতির-৩২)

আরো এরশাদ হচ্ছে, “আমিই আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর এমন কোন উম্মত ছিল না, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী (হেদায়াতকারী) আসেনি।” (ফাতির-২৪)

“আপনি কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক কওমের জন্য আছে, পথপ্রদর্শক।” (রাদ-৭)

আল্লাহ্ নিজে হযরত দাউদ (আঃ) কে নিজের খলিফা করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, “হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা করেছি।” (সা’দ-২৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে, “আমি তাদেরকে করেছিলাম ইমাম (নেতা) তারা আমার আদেশ অনুসারে হেদায়াত করতেন।” (আম্বিয়া-৭৩)

আর যখন হযরত মূসা (আঃ) একজন উজিরের (সাহায্যকারীর) প্রয়োজন অনুভব করলেন যে, উঁনার নবুয়্যতের কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছায় কাউকে নিযুক্ত করেননি বরঞ্চ, তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, যেমন এরশাদ হচ্ছে,

“ফেরাউনের কাছে যাও, সে দারুণভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুসা (আঃ) বললেন, ইয়া রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন; এবং আমার কাজ সহজ করে দিন; এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকে আমার কথা বুঝতে পারে; এবং আমার জন্য আমার পরিবার (আ’হুল) থেকে একজন সাহায্যকারী করে দিন; আমার ভাই হারুনকে এবং তাকে আমার কাজে অংশী করে দিন।” (ত্বাহা-২৪-৩২)

এবং আল্লাহ্ হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল করে এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্ বললেনঃ হে মুসা! অবশ্যই তোমাকে দেয়া হল, যা তুমি চেয়েছো।” (ত্বাহা-৩৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে, “আর আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।” (ফুরকান-৩৫)

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা (ইমাম) মনোনীত করেছিলাম যারা আমার আদেশ অনুযায়ী হেদায়াত করত।” (সাজদা-২৪)

“ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরায়? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।” (সাজদা-২২)

যখন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র আদেশে তূর পর্বতে যান চল্লিশ দিনের জন্য তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের হাদী ব্যতীত ছেড়ে যাননি, নিজ ভাই হারুন (আঃ) কে আল্লাহ্র আদেশে নিজের স্থলাবর্তী খলিফা নিযুক্ত করে বলেন “এবং মুসা (আঃ) তার ভাই হারুনকে বলেছিলেন তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার (খলিফা) প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সংশোধন করবে আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না।” (আরাফ-১৪২)

নবী রাসূলদের ইতিহাস খুঁজলে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না, যেখানে অনুসারীদের ভোটে উত্তরসূরী নির্বাচিত হয়েছে। এবং, এমন কোন কারণ নেই যাতে শেষ নবীর উত্তরসূরীর ক্ষেত্রে এসে ঐশী আইন পরিবর্তিত হবে। যেমন এরশাদ হচ্ছে,

“এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি তাদের ব্যাপারেও যারা পূর্বে গত হয়েছে। আর আপনি কখনও আল্লাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।” (আহযাব-৬২)

“আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের বেলায়ও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।” (বনী ইসরাঈল-৭৭)

“এবং আপনি আল্লাহ্র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং তাঁর বিধানে কোন বিচ্যুতিও দেখবেন না।” (ফাতির-৪৩)

“এটাই আল্লাহ্র রীতি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। আপনি আল্লাহ্র রীতিতে কোনই পরিবর্তন পাবেন না।” (ফাতাহ-২৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এটাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খলিফা, ইমাম, বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি, প্রত্যেক যুগেই নিযুক্ত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্'তায়ালার, এবং পবিত্র কোরআন দ্বারাও তাই প্রমাণিত হচ্ছে। এবং, কেউ যদি এ কাজটা নিজ ইচ্ছায় করে, তবে তা হবে খোদার উপর খোদগিরি, যেমন,

“যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম রাসূল-এর আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (নির্বাচিত) নেতাদের এবং আমাদের (নির্বাচিত) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল...।” (আহযাব-৬৬-৬৭)

পবিত্র কোরআন এর উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ্র মনোনীত নেতাকে অনুসরণ করবে না, তারা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট, তাই আমাদের জন্য আল্লাহ্র দ্বারা মনোনীত নেতার অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এটাই আল্লাহ্র হুকুম, তাই নয় কি?

“কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন আর সেখানেই সে স্থায়ী হবে, তার জন্য লাঞ্চনা দায়ক শাস্তি রয়েছে।” (নিসা-১৪)

আল্লাহ্ আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, আমার বিধানে কোন পরিবর্তন নাই। পূর্বে যে নিয়মে পয়গম্বরদের প্রতিনিধি, স্থলাবর্তী নিযুক্ত করা হতো। শেষ নবী পর্যন্ত ঐ নিয়মই বলবৎ থাকবে ও কার্যকরী হবে।

এটাই আল্লাহ্র আইন, আর যারা এটাকে লঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

যেমন, “যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।” (জীন-২৩)

উপরোক্ত বর্ণনাদির প্রমাণস্বরূপ নিম্নে পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের স্থলাবর্তী প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হলো। যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হবে যে, পূর্বকার আম্বিয়াগণ আল্লাহ্র আদেশমতে নিজেদের প্রতিনিধি, নিজেদের জীবদ্দশাতেই নিযুক্ত করে গেছেন এবং উম্মতিদের হাদীব্যতীত ছেড়ে যান নি।

“আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের বেলায়ও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।” (বনী ইসরাঈল-৭৭)

অধ্যায়-৩

নমুনা স্বরূপ **(**পূর্বের আম্বিয়াদের স্থলাবর্তী প্রতিনিধিগণ**)**।

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত শীশ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত শীশ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত আনুস (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত আনুস (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত কিনান (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত কিনান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মাহলয়িল (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত মাহলয়িল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইয়দ বা ইয়ারুদ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইয়দ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইদ্রিস ও খানুখ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইদ্রিস (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মাসুসালাখ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত মাসুসালাখ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত লামাক (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

হযরত লামাক (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত নূহ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত শাম (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত কিদার (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইসহাক (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত হুমেল (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত হারুন ও ইউসা বিন নূহ (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত কালাব (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত বুসামুস (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইয়াশা (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইয়াশা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত জিলকোফল (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত সোলাইমান (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত সামআউন (আঃ) কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। সূত্র, রাওজাতুস সাফা- খঃ ১, পৃঃ ১২, ১৫, ২৩, ২৪, ৪৪, ৪৫, ৫৮, ৬১, ৬৮, ৭৭, ৯৩, ৯৭, ১০০, ১০১, ১৩৬, ও ইবনে আসিরের তারিখে কামেল, খঃ ১ পৃঃ ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ২৭, ইবনুল ওয়াদির তারিখে ইসলাম, পৃঃ ৯ ও আল্লামা আবুল ওয়াহেদের তাফাসাস, পৃঃ ১০০, ১৩৩ এবং সাওয়ালাইর আফায়েস, পৃঃ ৩২। তাবারী- খঃ ১, পৃঃ ৭৬, ৮১, ৮২।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোক্ত আম্বিয়াগণ যখন নিজ জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্র নির্দেশে নিজেদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে থাকেন, সেইরূপে

সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী (সাঃ) তিনিও পবিত্র কোরআন পরিপন্থি কাজ করতে পারেন না, আল্লাহ্র উপরোক্ত বিধানানুযায়ী নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতে নিশ্চয় কোনও ব্যতিক্রম করেন নি।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তা হতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সবাই নিজ জীবদ্দশাতেই নিজের উত্তরসূরীর নাম ঘোষণা করে গেছেন, কিন্তু আমাদের শেষ নবী (সাঃ) এর পর কে হবে তাঁর উত্তরসূরী, এটা নাকি নবীজি ঘোষণা দিয়ে যাননি। এটা আমরা অনেক আলেমদের মুখেই শুনে থাকি, কিন্তু কখনও এটা চিন্তা করি না যে, "নবীজি কি তাহলে পবিত্র কোরআন পরিপন্থি কাজ করেছেন"? এটা কি সম্ভব? এরশাদ হচ্ছে, **"**আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি**,** তাদের বেলায় ও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।**" (**বনী ইসরাঈল**-**৭৭**)**

এখন আমাদের কাছে একটা পথই খোলা আছে, আর সেটা হচ্ছে, এটার সিদ্ধান্ত আমরা আল্লাহ্র পবিত্র কোরআন ও নবীজির হাদীস দ্বারা বিশ্লেষণ করবো। আশা করি, পাঠকগণও আমার সাথে একমত হবেন, তাই নয় কি? পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে:-

"তবে না**;** আপনার রবের কসম**!** তারা মু'মিন হবে না**,** যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে**,** সেসব বিবাদ বিসংবাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়**,** তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ বোধ না করে আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।**" (**নিসা**-**৬৫**)**

আরো এরশাদ হচ্ছে,

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।**" (**আলে ইমরান**-**১০৫**)**

“তোমরা কি আশা কর যে**,** তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে**?** তাদের মধ্যে তো একদল ছিল**,** যারা আল্লাহ্র বাণী শুনতো**,** তারপর হৃদয়ঙ্গম করে তা বিকৃত করত তারা সজ্ঞানে।**” (**বাকারা**-**৭৫**)**

অধ্যায়-৪

দাওয়াতে জুলয়াশিরা**,** ইসলামের প্রথম দাওয়াত**-**এর ঘটনা যেদিন নবী **(**সাঃ**)** নিজের নবুয়তের ঘোষণা দিলেন**,** সেই দিনই নিজের স্থলাবর্তীর নাম ও ঘোষণা দিয়েছিলেন।

যেহেতু দ্বীন ইসলাম কিয়ামত অবধি স্থায়ী থাকবে এবং নবীর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এই জন্য নবী (সাঃ) নিজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে আল্লাহ্র নির্দেশে যেদিন তিনি নিজের নবুয়তের ঘোষণা দিলেন, সেই দিনই নিজের স্থলাবর্তীর নামও ঘোষণা দিয়েছিলেন। যখন ইসলাম মক্কায় কোন প্রভাবই রাখত না তখন, মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি ওহী মারফত রাসূল (সাঃ) কে নির্দেশ দেন,

“আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।**”**
(শুয়ারা**-**২১৪**)**

যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী (সাঃ) হযরত আলী (আঃ) কে খাবারের বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রদের দাওয়াত দেবার হুকুম দিলেন, “(এবং সেই দাওয়াতের স্থান ছিল হযরত আবু তালেবের ঘরে। এটা হচ্ছে সেই ঘর, যে ঘরে হযরত নবী (সাঃ) ও হযরত আলী (আঃ) লালিত পালিত হয়েছিলেন। সেই ঘরেই ইসলামের প্রথম দাওয়াত দিলেন নবী (সাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে)” যেন আল্লাহ্র বাণী তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। ভোজের পর নবীজি (সাঃ) কথা বলা শুরু করলেই সঙ্গে

সঙ্গে আবু লাহাব নাক গলিয়ে বলে উঠলো, তোমাদের সঙ্গী তোমাদের উপর জাদু করে দিয়েছে। একথা শুনে তাদের চল্লিশজন কুরাইশ নেতা সকলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয় দিনও দাওয়াত দেয়া হলো কিন্তু একই ঘটনা ঘটলো, তৃতীয় দিন নবীজি আবার ভোজের আয়োজন করে দাওয়াত দিলেন। খাওয়া শেষ হলে নবী (সাঃ) তাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাইলেন, সেই মুহূর্তে আবু লাহাব ও তার সঙ্গীরা অন্য দিনের মত উঠে যেতে চাইল। তখন আবু তালেব যিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এগিয়ে এসে আবু লাহাবকে বাধা দিয়ে বললেন, এটা কি রূপ ভদ্রতা যে, শুধু খাবে আর চলে যাবে। মুহাম্মদ (সাঃ) কি বলতে চাচ্ছে তা শুনে যাও। তোমরা তা মানো বা না মানো। যখন সবাই বসে পড়ল, তখন নবী (সাঃ) বললেন, "হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রগণ! আমি আপনাদের ডেকেছি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য। কারণ, আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাদের এ পথে আহ্বান জানাতে। আপনাদের ভেতর কে আছে যে, আমার এই (দ্বীনের) কাজে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, আমার পৃষ্ঠপোষক হবে? এবং **"**সে আজ থেকে আমার ভাই**,** আমার উত্তরাধিকারী এবং তোমাদের খলিফা হবে।**"**

যখন মহানবীর বক্তব্য এখানে এসে সমাপ্তি ঘটে তখন সমাবেশে নিস্তব্ধ বিরাজ করছিল। কেউ টু শব্দটি করেনি। ইত্যবসরে, একজন বালক হাত উঁচু করে নিস্তব্ধতা ভেঙে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "আমি আপনাকে সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত আছি ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)"। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শেরে খোদা হযরত আলী (আঃ)। রাসূল (সাঃ) তাঁকে বসতে বললেন। আবারো তিনি পূর্ব প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না হযরত আলী (আঃ) ছাড়া। পুনরায়, তিনি হযরত আলী (আঃ) কে বসতে বললেন। এভাবে তিন বার তিনি প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন এবং প্রতিবার হযরত আলীই হাত উঁচু করে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই এই বালক আলী, আমার ভাই, আমার উত্তরাধিকারী এবং তোমাদের মাঝে আমার খলিফা।

তোমরা সকলে তাঁর কথা শ্রবণ করো এবং তাঁকে অনুসরণ (আনুগত্য) করো।" নবীজীর এই কথা শুনার পর আবু লাহাব সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল ও বেরিয়ে যাওয়ার পথে দরজার সামনে আবু তালেবকে লক্ষ্য করে বললো, লও মিয়া, এতদিন তো মোহাম্মদকে (সাঃ) অনুসরণ করার কথা ছিল, কিন্তু আজ থেকে তোমার ছেলেকেও অনুসরণ করো। এই কথা বলে সে বেরিয়ে গেল।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, আপনারা নিজে উক্ত ঘটনা যাচাই করে দেখুন যে, সত্য কি না। যদি ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তবে, আমাদের সবাইকে নবীজির পর নবীজির হুকুমমত হযরত আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী ও খলিফা হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। যা তিনি করতে হুকুম দিয়ে গেছেন আর যদি না করি, তবে আমাদের হিসাব কি হবে তা আমরা পবিত্র কোরআন এর আলোকে দেখি যেমন এরশাদ হচ্ছে,

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেন যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব-৩৬)

আরো এরশাদ হচ্ছেঃ- "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।" (জীন-২৩)

তাই আমাদের শোনা কথায় কান না দিয়ে, বাস্তবতাকে গ্রহণ করা উচিত, তাই নয় কি? উক্ত ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরকারক ও ইতিহাসবেত্তাগণ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

সূত্র, তাফসীরে মাযহারী খণ্ড, ৯, পৃঃ, ২০৪- ২০৬ (ই,ফাঃ) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খণ্ড, ১৯, পৃঃ, ২১৮ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) সাহাবা চরিত, খণ্ড, ১, পৃঃ, ২৬০, (ই,ফাঃ) মহানবী আল মোস্তফা- পৃঃ, ১০১ (রহমানীয়া লাইব্রেরী) খাতুনে জান্নাত, পৃঃ, ৩০

(বিউটি বুক হাউস) মোস্তফা চরিত, পৃঃ, ৩২৯ (আকরাম খান) সাইয়্যেদুল মুরসালীন, পৃঃ, ১৩৩-১৩৪, (ই,ফাঃ) সীরাতে রাসূল, পৃঃ, ২১৯, (ই,ফাঃ) কাতেবীনে ওহী- পৃঃ, ১৫৪ (ই,ফাঃ) খিলাফতে রাশেদা, পৃঃ, ১৬০ (মাওঃ আব্দুর রহীম) হযরত আলী,পৃঃ, ২৩ (তাফ্ কোহ্) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ, ১৫৪ (এমদাদিয়া লাইব্রেরী) মিনহাজ উস সুন্নাহ্ (ইবনে তাইমিয়া), খণ্ড, ৪, পৃঃ, ৮১ (কায়রো) মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড, ১, পৃঃ, ৩৩১, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড, ৩, পৃঃ, ১৩৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ৮৮, রওজাতুস সাফা, খণ্ড, ২, পৃঃ, ২৭৮, তারিখে আবুল ফেদা, খণ্ড, ১, পৃঃ, ১১৭, রিয়াজুন নাযরা, খণ্ড, ১০, পৃঃ, ১৬৮, কানযুল উম্মাল, খণ্ড, ১০, পৃঃ, ৩৯৬, হাঃ, ৬০০৮, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড, ৩, পৃঃ, ৪০, তিবরানী, পৃঃ, ২১৭, তারিখে তাবারী, খণ্ড, ১, পৃঃ, ১৭১, আল কামিল ইবনে আসির, খণ্ড, ৫, পৃঃ, ৬২, তারিখে তাবারী, খণ্ড, ২, পৃঃ, ২১৬, তাফসীরে তাবারী, খণ্ড, ১৯, পৃঃ, ১২৯ তারিখ আল কামিল, খণ্ড, ২, পৃঃ, ২২, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড, ২, পৃঃ, ৩৫২, ইবনে সা'দ, খণ্ড, ১, পৃঃ, ১৮৭, কানযুল উম্মাল, খণ্ড, ১২, পৃঃ, ২০৩, আল ইসাবা (ইবনে হাজর) খণ্ড, ১, পৃঃ, ২০৯, আরজাহুল মাতালেব- পৃঃ, ৬২, কানযুল উম্মাল, খণ্ড, ৬, হাঃ- ৬১৫৫, খাসায়সুল আলাভীয়া, পৃঃ, ১৮, শারাহ্ নাহজুল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খণ্ড, ৩, পৃঃ, ২৫৫, আল ফিদ আল মুকতাসার, খণ্ড, ১, পৃঃ, ১১৬, তাফসিরে-খাজীন, খণ্ড, ৪, পৃঃ, ১২৭, তাফসীরে -মাজহারামুত-তানজিল, খণ্ড, ৬, পৃঃ, ১৩১, আল বাইহাকী খণ্ড, ১, পৃঃ, ৪২৮, ৪৩০, তাফসীরে দুররে মানসুর, খণ্ড, ৫, পৃঃ, ৯৭, কানযুল উম্মাল, খণ্ড, ১৫, পৃঃ, ১০০, ১১৫, ইবনে হিসাব, খণ্ড, ১, পৃঃ, ১১, ১২, দালাইলুল নাবূয়্যাহ, খণ্ড, ১, পৃঃ, ৪২৮, সিরাহ্ আল হালাবী, খণ্ড, ১, পৃঃ, ৩২১, শারাহ্ নাহজুল বালাঘা, খণ্ড, ১০, পৃঃ, ২১০, উকলির তারিখে ইসলাম, পৃঃ, ১৪, গোলমনের তারিখে ইসলাম, পৃঃ, ৪৮২।

পবিত্র কোরআনে হযরত আলী **(**আঃ**)** এর শানে বেলায়েতের আয়াত**:**

“তোমাদের ওয়ালি **(**অভিভাবক**)** শুধুমাত্র আল্লাহ্**,** তাঁর রাসূল এবং মু**’**মিনবৃন্দ যারা নামাজ কায়েম করে যাকাত প্রদান করে রুকুয়রত অবস্থায়।**” (**মায়দা**-**৫৫**)**

নবীজির সাহাবি হযরত আবু যার আল গিফারী (রাঃ) বলেন, “আমি একদা রাসূল (সাঃ) এর সাথে যোহরের নামাজ আদায় করছিলাম। ইতিমধ্যে একজন ভিখারী মসজিদে প্রবেশ করে ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু কেউ তাকে কোন সাহায্য করলো না। ভিক্ষুকটি দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানালো, ইয়া আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থেকো, আমি মসজিদে প্রবেশ করে কিছু সাহায্য চাইলাম, কিন্তু কেউ কিছু দিলো না। তখন হযরত আলী (আঃ) নামাজে রুকু কালীন অবস্থায় ছিলেন। তিনি ইশারা করলে ঐ ভিক্ষুক লোকটি হযরত আলীর (আঃ) হাতের আংটি খুলে নিয়ে যায়। আর এ ঘটনাটি নবীর চোখের সামনে ঘটে। নবীজি (সাঃ) নামাজ শেষে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে মোনাজাত করলেনঃ “ইয়া আল্লাহ্, যখন হযরত মূসা (আঃ) তোমাকে বলেছিল অর্থাৎ (ইয়া আল্লাহ্) “তুমি আমার জন্য আমার পরিবার থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার পরামর্শদাতা নিয়োগ কর, তাঁর মাধ্যমে আমার কোমরকে শক্তিশালী করে দাও এবং তাকে আমার কাজে কর্মে অংশীদার কর।” (ত্বাহা-২৯-৩০) তখন ওহী নাযিল হয়েছিল। তুমি তাঁর ভাই হারুনকে দিয়ে তাঁর বাহুবল শক্তিশালী করেছিলে। ইয়া প্রভু, নিশ্চয় আমি তোমার নবী এবং মনোনীত ব্যক্তি। ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জন্য আমার আ'হল থেকে আলীকে পরামর্শ দাতা হিসাবে নিয়োগ কর, তাঁর মাধ্যমে আমার কোমরকে শক্তিশালী করে দাও।” তখনও প্রিয় নবী (সাঃ) এর মোনাজাত সমাপ্ত হয়নি, এমনি সময় অবতীর্ণ হয় এ আয়াত (মায়েদা-৫৫)।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

উক্ত আয়াতে এই দিকটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী (সাঃ) এর মোনাজাতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি

আপনার মোনাজাত কবুল করলাম ও হযরত আলীকে আপনার স্থলাবর্তী বা প্রতিনিধি মনোনীত করলাম, আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলো না, যেভাবে মুসার (আঃ) মোনাজাতের আল্লাহ্ হারুন (আঃ) কে মুসার (আঃ) স্থলাবর্তী বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন ঠিক একইভাবে নবী (সাঃ) এর মোনাজাতে আল্লাহ্ হযরত আলী (আঃ) কে তাঁর নবীর জন্য মনোনীত করলেন কারণ, নবীর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না তাই হযরত আলী (আঃ) কে বেলায়েতের (ওয়ালি) ঘোষণার মাধ্যমে মনোনয়ন দেওয়া হলো, যা আমরা পাঠ করলাম আর যেভাবে হযরত মুসার (আঃ) পর হযরত হারুন (আঃ) সেই সময় মানব জাতির জন্য হেদায়াতকারী ছিলেন, ঠিক নবীর পর হযরত আলী (আঃ) বেলায়েতের অধিকারী রূপে মানব জাতির জন্য হেদায়াত কারী হবেন। উক্ত আয়াতে এই বিষয়টাই স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে।

উক্ত ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরকারক ও ইতিহাস বেত্তাগণ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে কেউ সংক্ষিপ্তভাবে আবার কেউ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

সূত্র, "তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৮৫ (আমিনুল ইসলাম) কুরআনুল করিম, পৃঃ, ৩৩০ (মহিউদ্দিন খান) তাফসীরে কানজুল ঈমান, পৃঃ, ২২৩ (আহমাদ রেজা খাঁ) তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৫৯ (মুফতি মোঃ সফি) তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৮৪ (ই, ফাঃ) তাফসীরে কাশশাফ, খঃ, ১, পৃঃ ৬৪৩, তাফসীরে তাবারী, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৮৮, তাফসীরে ইবনে জাওযীয়াদ আল মুসির, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৮৩, তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৮৮ তাফসীরে ফখরে রাজী, খঃ, ১২, পৃঃ, ২৫, তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ২, পৃঃ ৭১ তাফসীরে নাসাফি, খঃ, ১, পৃঃ, ২৮৯, তাফসীরে আবুল বারাকা, খ, ১, পৃঃ, ৪৯৬, তাফসীরে বায়যাভী- পৃঃ, ১২০, তাফসীরে খাজিন, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৯৬, মাতালেবাস সউন- পৃঃ, ৩১, সিবতে ইবনে জাওজি, পৃঃ, ৯, রিয়াজুন নাদরা, পৃঃ, ২২৭। জাখায়েরুল উকবা, পৃঃ,১০২, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯৩, তাফসীরে আহকামুল কোরআন, পৃঃ, ২৯৩। আল বেদায়া

ওয়ান নেহায়া, খঃ, ৭, পৃঃ, ৩৫৭, সাওয়ায়েকে মোহরেকা- পৃঃ, ২৫, নুরুল আবসার, পৃঃ, ৭৭, রুহুল মায়ানী আলূসী বাগদাদী , খঃ, ২, পৃঃ, ৩২৯, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ২১২, শাহ্ নাহজুল আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ, ৩, পৃঃ, ৩৭৫, তাফসীরে কাশফুল বায়ান ,খঃ, ১,পৃঃ, ৭৪, কানজুল উম্মাল, খঃ, ৭, পৃঃ, ৩০৫, রিয়াদ আন নাদেরা, খঃ, ২, পৃঃ, ২২৭, ফারায়েদে আসসামতাইন-খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৭, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৭০, ৭৪, (উর্দু)।

পবিত্র কোরআনে হযরত আলী **(**আঃ**)** কে নবীর পর মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক ঘোষণা করা হয়েছে।

“আপনি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক কওমের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।**” (**রাদ**-**৭**)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, “আমি হলাম সতর্ককারী আর আলী হচ্ছে পথপ্রদর্শক”। তিনি নবী (সাঃ) বললেন যে, “ইয়া আলী তোমার দ্বারা পথের সন্ধানকারীরা সত্যপথ অবলম্বন করবে”। হযরত আবু বারদা আসলামী বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী (সাঃ) অজু করার পর হযরত আলী (আঃ) কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বললেন যে, “আমি সতর্ককারী। আর আলীর (আঃ) বুকের দিকে ইশারা করে বললেন যে, এই আলী হলো পথপ্রদর্শক।”

উক্ত আয়াত দ্বারা আমরা এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, নবীজির পর আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শককারী হচ্ছেন, হযরত আলী (আঃ), যা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হলো, তাই সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকলো না, তাই নয় কি?

প্রমাণ স্বরূপ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

সূত্র, তাফসীরে কাবির, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৭১, তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ২, পৃঃ, ৫০২, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৪, পৃঃ, ৪৫, তাফসীরে শওকানী, খঃ, ৩, পৃঃ, ৭০, তাফসীরে তাবারী, খঃ, ১৩, পৃঃ, ১০৮, তাফসীরে বুরহান, খঃ, ২, পৃঃ, ২৮২, রুহুল মায়ানী আলূসী, খঃ, ১৩, পৃঃ, ৯৭, কানযুল উম্মাল, খঃ, ১, পৃঃ, ২৫১, নুরুল আবসার- পৃঃ, ৭৮, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১১৪, তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ, ২, পৃঃ, ৪১৫, মোস্তাদরাক উস সাহিহাইন, খঃ, ৩, পৃঃ, ১২৯, শাওয়াহেদ উত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ২৯৩, তারিখ আল বাগদাদ, খঃ, ১২, পৃঃ, ৩৭২, আল মিযান আল ইতিদাল, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৮৪, ইয়াখাতুল খিফা, খঃ, ২, পৃঃ, ৫১০, আল তাবারানী, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৩৫, আল মুজাম সাগির, খঃ, ১, পৃঃ, ২৬১, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ১২৬, গারিব আল কোরআন, খঃ, ১৩, পৃঃ, ৭৩, কিফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১০৯, লিসান উল মিযান (ইবনে হাজার আসকালানি), খঃ, ২, পৃঃ, ১৯৯, মাজমা আল জাওয়ায়েদ, খঃ, ৭, পৃঃ, ৪১ (আল হাইসামী) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৬৪, ১০৩ (উর্দু)।

পবিত্র কোরআনে হযরত আলী **(**আঃ**)** কে আল্লাহ্র নাফস ঘোষণা করা হয়েছে।

“মানুষের মধ্যে এমনও মানুষ আছে যে নিজের নাফসকে আল্লাহ্র রাস্তায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহ্ এই ধরনের বান্দাকে ভালবাসিয়া থাকেন।” **(**বাকারা**-**২০৭**)**

যখন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিলেন, তখন হযরত আলী (আঃ) কে নিজের স্থানে (স্থলাবর্তী) করেন, যেন আমানত মানুষদেরকে পরিশোধ করে দেন। হযরত রাসূল (সাঃ) রাত্রে যখন গারে সওরের দিকে রওনা দিবেন, তখন হযরত আলীকে আদেশ করলেন তিনি যেন নবী (সাঃ) এর বিছানায় শায়িত থাকেন। নবীজী, হযরত আলী (আঃ) কে বললেন, “ইয়া আলী! আমার বিছানায় আমার সবুজ হাজরামী চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক।” তখন হযরত আলী (আঃ) বললেন, “ইয়া রাসূল

আল্লাহ, আমি আপনার বিছানায় শায়িত হলে কি আপনার জীবন রক্ষা পাবে? ও আপনি নিরাপদে মদিনায় পৌঁছতে পারবেন?" রাসূল (সাঃ) বললেন "হ্যাঁ", হযরত আলী (আঃ) একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে শোকরানা সেজদায় পড়ে গেলেন। অতঃপর, হযরত আলী (আঃ) হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কথা মোতাবেক আমল করলেন, নবীজির বিছানায় শায়িত হলেন, নবীজির স্থলাবর্তী হিসাবে। ঠিক তখনই, আল্লাহ্ তায়ালা নিজের দুই ফেরেশতা জিব্রাইল আমীন ও মিকাইল (আঃ) কে বললেন যে, "আমি তোমাদের দুইজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলাম। তোমাদের মধ্যে একজনের আয়ু, অন্যজনের আয়ু হতে বৃদ্ধি করে দিলাম এখন, তুমি নিজের জীবন একে অপরের উপর বিসর্জন দিতে রাজি আছো কি?" তখন ঐ দুই ফেরেশতা নিজের জীবনকে প্রাধান্য দিল। তখন মহান রাব্বুল আলামীন দুই ফেরেশতাকে বললেন, "তোমরা কি আলী ইবনে আবু তালেবের মত হতে পার না? আমি তাঁর এবং আমার রাসূল (সাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছি। হযরত আলী, হযরত রাসূল (সাঃ) এর বিছানায় শায়িত আছেন, নিজের জীবনটা প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর জন্য বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই তোমরা দুই ফেরেশতা পৃথিবীতে গিয়ে হযরত আলীর হেফাজত কর।" (কারণ, সেই সময় চল্লিশজন কাফের চল্লিশটা তলোয়ার হাতে নিয়ে হত্যার জন্য প্রস্তুত ছিল।) উভয় ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবতরণ করে হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত আলীর (আঃ) মাথার দিকে দাঁড়ালেন এবং হযরত মিকাইল (আঃ) তাঁর পায়ের দিকে দাঁড়ালেন। জিবরাইল বললেন, "ধন্যবাদ, ইয়া আলী ইবনে আবু তালেব, আপনার সমকক্ষ কে হতে পারে? আল্লাহ্ তায়ালা আপনার দ্বারা ফেরেশতাদের উপর গর্ব করছেন। তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াত নবীজির উপর নাযিল করেন।"

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবগত হবার জন্যে, সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলো অধ্যয়নের অনুরোধ করছি।

সূত্র, তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ, ২, পৃঃ, ২৫৪ (আমিনুল ইসলাম) কোরআনুল করিম, পৃঃ, ৫২৯ (মহিউদ্দিন খান) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১২৬, ৬৭৮ (উর্দু) তাফসীরে কাবির, খঃ, ৫, পৃঃ, ২২৩, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৮০, এহইয়াউল উলূমুদ্দিন, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৩৮, নুরুল আবসার, পৃঃ, ৭৮, তাজকেরাতুস সিবতে ইবনে জাওযী, পৃঃ, ২১, মুসতাদরাকে হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪ পৃঃ, ৯২, আস সিরাতুল হালাবীয়া, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯, তারিখে ইয়াকুবি, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯, তারিখে তাবারী, খঃ, ২, পৃঃ, ৯৯, ১০০, খাসাইস আল নাসায়ী, পৃঃ, ৬৩, আল গাদীর খঃ, ২, পৃঃ, ৪৭, ইয়াখাতুল খিফা (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ, ২, পৃঃ, ৪৯১, গারিব আল কোরআন, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৩৮ (আল আপনার আপলোড করা সর্বশেষ ছবিটির (image_568ea4.png) সম্পূর্ণ লেখা নিচে টেক্সট আকারে দেওয়া হলো:

নিশাবুরি) কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১১৪ ফুসুলুল মুহিম্মাত, পৃঃ, ৩১, তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃঃ, ৩৫, তারিখে খামিস, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৬৭, তারিখে তাবারী, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৪৪, ইবনে হিশাম, খঃ, ৩, পৃঃ, ৯৪, ইবনে খালদুন, পৃঃ, ১৭৫, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খঃ, ৭, পৃঃ, ৩৩৮, ফাতহুল বারি, পৃঃ, ১৮৪, তাফসীরে তাবারী, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৪৮ (জামেউল বায়ান) আল কামিল ফিত তারিখ, খঃ, ১, পৃঃ, ১২৩২, আত তাবাকাত (ইবনে সা'দ), খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৩, আস সিরাহ্ আন নাবিইয়্যাহ্, খঃ, ২, পৃঃ, ১২৪, উসুদ আল গাবাহ্, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৫, তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ২, পৃঃ, ৩০২, শারাহ্ নাহজুল আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ, ১৩, পৃঃ, ৩০৩, আহকামুল কোরআন, খঃ, ৩, পৃঃ, ২১, আল ইকদুল ফরিদ, খঃ, ৫, পৃঃ, ৯৯, আল মুসান্নাফ (আব্দুর রাজ্জাক), খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৮৯, আল মুজাম আল কাবির, খঃ, ১, পৃঃ, ৪০৭, তারিখ আল বাগদাদ, খঃ, ১৩, পৃঃ, ১৯১, দালায়েলে নাবূয়্যাহ্, পৃঃ, ৩৬, শাওয়াহেদুত তানযীল, খঃ, ১, পৃঃ, ৯৬, কানযুল উম্মাল, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৫৫, আল মানাকেব

(খাওয়ারেজমী), পৃঃ, ৭২, মাজমাউজ-জাওয়ায়েদ, খঃ, ৭, পৃঃ, ২৭, আল-গাদীর, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৭১।

আমি তাঁকে আলী ইবনে আবু তালেব দ্বারা সাহায্য করেছি।

“তবে তারা যদি আপনাকে ধোঁকা দিতে চায় তাহলে আপনার জন্য আল্লাহুই যথেষ্ট তিনি সেই সত্তা যিনি আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্য ও মু’মিনদের মাধ্যমে।**” (**আনফাল**-**৬২**)**

উক্ত আয়াতের শানে নুযুলে নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, “আরশের উপর লেখা আছে আমি ব্যতিত কোন উপাস্য নাই, আমি অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আমার বান্দা এবং আমার প্রেরিত রাসূল, আমি তাঁকে আলী ইবনে আবু তালেব দ্বারা সাহায্য করেছি।”

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্য উপরোক্ত শানে নুযুলে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী (সাঃ)-এর নামের পাশে হযরত আলীর (আঃ) নাম লিখা আছে তাও আরশের উপর। আল্লাহ্র ইচ্ছাও এটাই যে, নবীর পর আমরা নবীর উত্তরসূরীর ব্যাপারে কোন সন্দেহ না করি এবং রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য করার দিক দিয়ে হযরত আলী (আঃ) অন্য সবার চেয়ে অগ্রগামী। কারণ, এটা আল্লাহ্র ঘোষণা, আর একথা থেকে স্পষ্টভাবে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধি মনোনয়ন করলে অবশ্যই নবীর পরে যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোমিন হবে তাঁকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্ কখনোই অন্য কাউকে এ পদের জন্য মনোনীত করবেন না। আর যদি এই দায়িত্বটি জনগণের উপর অর্পিত হত (যদিও অসম্ভব), তাহলে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই এমন শ্রেষ্ঠ মোমিন জীবিত থাকতে অন্য কাউকে এ পদে নির্বাচিত করতে পারে কি? নিরপেক্ষ মন ও মুক্ত চিন্তা নিয়ে বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি মাত্র। যেমন,

সূত্র, “তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৯৯, আর রিয়াদ, খঃ, ২, পৃঃ, ১৭২ (মহিউদ্দিন তাবারী) খাসায়েস আল কোবরা, খঃ, ১, পৃঃ, ৭, ফারায়েদ হাম্বতি, অধ্যায়, ৪৬, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১১০, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৯৪, রিয়াজুন ন্যাজরা, খঃ, ২, পৃঃ, ১৭২, জাখায়েরুল উকবা, পৃঃ, ৯৬, মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃঃ, ২৫৪, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১১, পৃঃ, ১৭৩, কানযুল উম্মাল, খঃ, ৬, পৃঃ, ১৫৮, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১২১, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ২২৩, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৬৪।

তুমি আমার ভাই ও আমার উত্তরাধিকারী।

“পরস্পর ভাই ভাই আসনসমূহের উপর মুখোমুখি উপবিষ্ট হয়ে থাকবে।**” (**হিজর**-**৪৭**)**

আহমাদ বিন হাম্বল নিজের উদ্ধৃতিতে যায়েদ বিন আওফা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যায়েদ বিন আওফ বললেন, আমি নবী (সাঃ)-এর মসজিদে প্রবেশ করলাম আর সাহাবাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যাপারটা তাঁর কথামত বর্ণনা করলাম। হযরত আলী (আঃ) বললেন, ‘ইয়া রাসূল আল্লাহ্ (সাঃ) যখন আপনি নিজের সাহাবাগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে স্থাপন করলেন এবং আমার জন্য কোন ভাই নির্দিষ্ট করলেন না। তার কারণে আমার মনে এমন দুঃখ হয়েছে যে, আমার আত্মা আমার শরীর হতে বের হয়ে যাবে, আমার বল ও শক্তি হ্রাস পেয়েছে। যদি আপনি আলীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্যই প্রতিদান এবং মর্যাদা রয়েছে’, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বললেন, “ঐ পাক জাতের কসম খেয়ে আমি বলছি, যিনি আমাকে সত্য নবুয়্যত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি যাকে যার সাথে জোড়া দেখেছি তার সাথে তাকে তার ভাই বানিয়েছি, আর তোমার সাথে কারো জোড়া হবে না, তাই তোমার সাথে আমার জোড়া। তুমি এই জগতে আমার ভাই ওই জগতেও আমার ভাই। আর, তুমি আমার নিকট ঠিক সেইরূপ যেমন হযরত মুসার এর নিকট তাঁর ভাই হারুন ছিল, কিন্তু আমার পর আর

নবুয়্যত নাই। তাই তুমি আমার ভাই ও আমার উত্তরাধিকারী, তুমি আমার কন্যা খাতুনে জান্নাতের সঙ্গে জান্নাতের অট্টালিকায় অবস্থান করবে। তুমি আমার ভাই এবং চিরসঙ্গী অতঃপর, তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন।"

উক্ত আয়াতের শানে নুযূলেও নবীজি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, নবী (সাঃ) এর পর হযরত আলী (আঃ) হচ্ছেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ মানব, ও নবীজির উত্তরাধিকারী। প্রমাণস্বরুপ কিছু গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো,

সূত্র, মুস্তাদরাকে হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৪, আল ইসতিয়াব, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৬০, আর রিয়াজুন ন্যাজরা, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৭, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খঃ, ৭, পৃঃ, ৩৩৫, তারিখুল খোলফা, পৃঃ, ১১৪, আল ইসাবা, খঃ, ২, পৃঃ, ৫০৪, তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ, ৬, পৃঃ, ২০১, কানযুল উম্মাল, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩৯০, জাখায়েরুল উকবা, পৃঃ, ৮৯, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ৩১৭, আরজাহুল মাতালেব- পৃঃ, ৭০৩-৭০৪ (উর্দু)।

নবুয়তের ও রিসালাতের প্রথম সাক্ষ্য প্রদানকারী হচ্ছেন**,** হযরত আলী **(**আঃ**)**।

"যারা সত্য নিয়ে এসেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন**,** এরুপ লোকেরাই মোত্তাকী।**" (**যুমার**-**৩৩**)**

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, যিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন তিনি হলেন নবী (সাঃ) এবং সর্বপ্রথম এই সত্যকে যে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, (আঃ) তিনি নবীজির রিসালাতের প্রথম সাক্ষ্য প্রদানকারী।

প্রমাণ স্বরুপ কিছু গ্রন্থের নামঃ**-**

সূত্র, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩২৮, তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ১৫, পৃঃ, ২৫৬, ইবনে আসাকির, খঃ, ২, পৃঃ, ৪১৯,

মানাকেবে ইবনে মাগাজেলি, পৃঃ, ২৬৯, শাওয়াহেদুত তানযীল, খঃ, ২, পৃঃ, ১২০, কেফায়াতুত-তালেব, পৃঃ, ২৩৩, কেফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৩।

যাঁর গৃহে নক্ষত্র অবতরণ করবে সে হবে আমার উত্তরাধিকারী।

"ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রের শপথ যখন তাহা অবতরণ করল তোমাদের সঙ্গী না পথভ্রষ্ট হয়েছেন না বিপদগামী হয়েছেন।" **(**নাজম**-**১**-**২**)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমরা বনি হাশেমের কয়েকজন যুবক হযরত রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম তখন তিনি বললেন, "এই উজ্জ্বল নক্ষত্র যে ব্যক্তির গৃহে অবতরণ করবে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে"। তারা দাঁড়িয়ে নক্ষত্রটিকে দেখলো যে, নক্ষত্রটি হযরত আলীর (আঃ) গৃহে অবতরণ করলো তারা বলতে লাগলো যে, 'ইয়া রাসূল (সাঃ), আপনি হযরত আলীর ভালবাসায় বিপথে চলে গিয়েছেন'। তখন পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

সূত্র, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১২৯ (উর্দু) তারিখে দামেস্ক, খঃ, ৪২, পৃঃ, ৩৯২, শাওয়াহেদুত তানযীল, খঃ, ২, পৃঃ, ২০১, ২৭৫, মানাকেবে ইবনে মাগাজেলি, পৃঃ, ২৬৬, লেসানুল মিযান, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৪৯, মানাকেবে ইবনে শাহর আশব, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০, মুতাসার তারিখে দামেস্ক, খঃ, ৫, পৃঃ, ৪১২। মিযানুল এতেদাল, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৫, কেফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ২৪৯, তাফসীরে বুরহান, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৪৪, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৬, পৃঃ, ১২২, লিসান আল মিযান, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৯০, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৩৭৪, (উর্দু)।

হযরত আলী **(**আঃ**)** হচ্ছেন ইমামে মোবিন।

"আমি প্রত্যেক বস্তু গণনা করে রেখেছি এবং স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছি ইমামে মোবিনে।" **(**ইয়াসিন**-**১২**)**

যখন উক্ত আয়াত নাযিল হল তখন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর উভয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন। ইয়া রাসূল আল্লাহ্ (সাঃ)! কে এই ইমামে মোবিন? যাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান আমি তাঁর মধ্যে গণনা ও বর্ণনা করেছি, সেটা কি তাওরাত? নবী (সাঃ) বললেন না, আবার জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কি ইঞ্জিল? নবী (সাঃ) বললেন না, পুনরায় আরজ করলেন সেটা কি কুরআন? তিনি বললেন না। ইতিমধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব উপস্থিত হলেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) উভয়কে বললেন, "এই আলীই হচ্ছে ইমামে মোবিন যার মধ্যে আল্লাহ্'তায়ালা সমগ্র বস্তুর জ্ঞানকে গণনা ও একত্রিত করে দিয়েছেন।"

সূত্র, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৬২, কেফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ৫২১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১২০, সামারাতুল হায়াত, খঃ, ২, পৃঃ, ২২৮, তাফসীরে কুর্তুবি, খঃ, ২, পৃঃ, ২১২।

নবী (সাঃ)-এর রিসালাতের দুইজন সাক্ষ্যদাতা, আল্লাহ্ ও হযরত আলী (আঃ)।

"যারা কুফরি করেছে তারা বলে, আপনি রাসূল নন। আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি যার কাছে কিতাবের (ইলমুল কিতাব) জ্ঞান আছে, সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।" (রাদ-৪৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম বলেছেন যে, আমি নবী (সাঃ) কে প্রশ্ন করলাম যে, আল্লাহ্'তায়ালার উদ্দেশ্য যাঁর নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তিনি কে? নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "যাঁর নিকট কিতাবের সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, (ইলমুল কিতাব) সে হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব।"

সূত্র, আল কাশ্ফ ওয়াল বায়ান, খঃ, ৪, পৃঃ ৬০, আল নাঈম আল মুকিম, পৃঃ, ৪৮৯, তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ৯, পৃঃ, ৩৩৬, আল এতকান, খঃ, ১, পৃঃ, ১৩, আল জামেউল আহকাম উল কোরআন,

খঃ, ৯, পৃঃ, ৩৩৬, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ৩০৭, এহকাক উল হাক্ক, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৮০, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১০২, ১০৩, জাজবায়ে বেলায়েত, পৃঃ, ১৫৫, সালিম বিন কায়েস, পৃঃ, ২৪, রাওয়ানে যাভেদ, খঃ, ৩, পৃঃ, ২১৫, কেফায়াতুত মোওয়াহহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ১৮০, মাজমাউল বায়ান, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩০১।

"নবী করিম **(**সাঃ**)** হযরত আলী **(**আঃ**)** এর অনুসারীদের জান্নাতী ঘোষণা করেছেন।**"**

যেমন এরশাদ হচ্ছে, **"**অবশ্যই যারা**,** ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম।**" (**বায়্যিনাহ **-**৭**)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো, তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই আয়াতের সাক্ষ্য ও প্রমাণ আলী তুমি এবং তোমার অনুসারীগণ, তোমরা কিয়ামতের দিন আসবে আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে রাজি হবেন এবং তোমরা আল্লাহ্র উপর রাজি হবে এবং তোমাদের শত্রুরা কালো মুখ ও বিশ্রী চেহারা নিয়ে আসবে।"

সূত্র, "তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩৭৯, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১২২, ৮৭৭ (উর্দু) নুরুল আবসার, পৃঃ, ৭৮, ১১২, ফুসুলুল মুহিম্মাত, পৃঃ, ১২৩, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৫৬, সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃঃ, ৯৬, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১১৯, মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃঃ, ৬৬, তাফসীরে জামী আল বায়ান খঃ, ৩৩, পৃঃ, ১৪৬, তারিখে দামেশক (ইবনে আসাকির), খঃ, ৪২, পৃঃ, ৩৩৩, আল সাওয়ায়িক আল মোহরেকা (ইবনে হাজার আল হায়সামী), পৃঃ, ২৪৬, আল ফেরদৌস, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬১, আল কিসম, খঃ, ২, পৃঃ, ১৭০।

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্ নবীর দ্বারা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যারা

নবী (সাঃ) এর পর হযরত আলীর (আঃ) অনুসরণ করবে, তারাই শুধু জান্নাতী হবে। নবী (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের কে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, আমরা তা জানার চেষ্টা করবো।

নবী (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের কে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, আমরা তা জানার চেষ্টা করবো।

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "সুসংবাদ! ইয়া আলী? নিশ্চয় তুমি এবং তোমার অনুসারীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি মাত্র এবং সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, আপনারা অবশ্যই সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন এবং সত্যতা যাচাই করুন।

সূত্র, তারিখে দামেশক (ইবনে আসাকির), খঃ, ২, পৃঃ, ৪৪২, হাঃ, ৯৫১, নুরুল আবসার (শাবলানজী), পৃঃ, ৭১, ১০২। ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৬২, তাজকিরাতুল খাওয়ারেস (ইবনে জাওজি আল হানফী), পৃঃ, ১৮, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর (আল শওকানী), খঃ, ৫, পৃঃ, ৪৭৭, তাফসীরে রুহুল মায়ানী আলূসী, খঃ, ৩০, পৃঃ, ২০৭, ফারায়েদ সিমতাইন (ইবনে শাক্কাহ), খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৬, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৬, পৃঃ, ১২২, মানাকিবে (ইবনে আল মাগাজেলী) পৃঃ, ১১৩, মুখতাসার তারিখে দামেশক, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০, মিযান আল ইতিদাল, খঃ, ২, পৃঃ, ৩১৩, আরজাহুল-মাতালেব, পৃঃ, ১২২, ১২৩, ৮৭৭, (উর্দু) তাফসীরে তাবারী, খঃ, ৩০, পৃঃ, ১৪৭, ফুসুল আল মুহিম্মা, পৃঃ, ১২২, কিফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১১৯, আহমাদ ইবনে হাম্বল, খঃ, ২, পৃঃ, ৬৩৫, হুলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩২৯, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১২, পৃঃ, ২৮৯, আল তাবারানী মুজাম আল কাবির, খঃ, ১, পৃঃ, ৩১৯, আল হায়সামী মাজমা আল জাওয়াইদ, খঃ, ১০, পৃঃ, ২১-২২, ইবনে আসাকীরের তারিখে দামেশক, খঃ, ৪২, পৃঃ, ৩৩১, আল হায়সামী আল সাওয়ায়িক আল মুহরিকা, পৃঃ, ২৪৭, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ৯২, তাফসীরে ফাতহুল বায়ান খঃ, ১০, পৃঃ, ২২৩, (নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ ভুপালী, আহলে

হাদীস) তাফসীরে ফাতহে কাদীর, খঃ, ৫, পৃঃ, ৬৪, ৬২৪, সাওয়ায়েক আল মুহরেকা (ইবনে হাজার মাক্কি), পৃঃ, ৯৯ শাওয়াহেদুত তানজিল, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৫৬, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৮, নুজহাত আল মাজালিস, খঃ, ২, পৃঃ, ১৮৩, মানাকেব (আল খাওয়ারেজমী), খঃ, ৬, পৃঃ, ৬৩।

অধ্যায়-৫

আল্লাহ্‌ "উলিল আমর"-এর অনুসরণকে নিজের এবং পয়গম্বর এর অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী (উলিল আমর)। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তা প্রত্যর্পণ কর আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর...।" (নিসা-৫৯)

প্রসিদ্ধ আহলে সুন্নাত-এর পণ্ডিত শেখ সুলাইমান কান্দুজী হানাফী তুর্কি, বলেন,

হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)! আমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রাসূলকে চিনেছি এবং "উলিল আমর" যাঁর অনুসরণকে আল্লাহ্‌ নিজের এবং পয়গম্বর এর অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কারা? দয়া করে তাঁদের নাম বলে দিন। নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তাঁরা আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার পর তোমাদের ইমাম। তাঁদের প্রথম হচ্ছেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব তাঁর পর আল হাসান ইবনে আলী আল মুজতাবা, তাঁর পর আল হোসাইন ইবনে আলী সাইয়্যেদুশ শুহাদা, তাঁর পর আলী ইবনে আল হোসাইন (জয়নুল আবেদীন), তাঁর পর মোহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকের যিনি বাকের নামে প্রসিদ্ধ। হে

যাবির! তুমি তাঁর দেখা পাবে যখন তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। তাঁর পর জাফর ইবনে মোহাম্মদ আস সাদিক, তাঁর পর মুসা ইবনে জাফর আল কাজীম, তাঁর পর আলী ইবনে মুসা আল রেজা, তাঁর পর মোহাম্মদ ইবনে আলী জাওয়াদ (আত তাকী), তাঁর পর আলী ইবনে মোহাম্মদ আল হাদী (আল নাকী), তাঁর পর আল হাসান ইবনে আলী আল আসকারী ও তাঁর পর আমার নাম এবং উপাধি বহনকারী যে জগতে আল্লাহ্র প্রমাণ এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বের, মানবের মধ্যে চিহ্ন বহন করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম জয় করে দিবেন। সে নিজের ভক্ত ও বন্ধুদের হতে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য হওয়া সব সময় থাকবে না "এবং তাঁর ইমামতের উপর তারাই দৃঢ় থাকবে যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাঁর শুভ নাম হবে মোহাম্মদ আল মাহদী (আঃ)।"

হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করলেন যে, আমি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর অদৃশ্য থাকাকালীন সময় তাঁর অস্তিত্ব দ্বারা তাঁর ভক্তরা ও অনুসারীদের কি লাভ হবে? তিনি বললেন, "ঐ আল্লাহ্র কসম যিনি আমাকে নবুয়্যত দিয়া পাঠিয়েছেন, "সে তাদের নিজের নূর দ্বারা আলোকিত করবে এবং নিজের বেলায়েত দ্বারা তাদের উপকার করবে" যেমন সূর্য দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যখন সূর্য মেঘের আড়ালে থাকে, হে যাবির! এটা আল্লাহ্'তায়ালার রহস্যভেদ ও গুপ্ত বিদ্যা, এটা সকলের কাছে প্রকাশ কর না। কিন্তু যারা এটার যোগ্য তাদের কাছে অবশ্যই প্রকাশ করবে।"

সূত্র, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪২৭, (বৈরুত) মানাকেবে ইবনে শাহর আশব, খঃ, ১, পৃঃ, ২৮২, রাওয়ানে যাভেদ, খঃ, ২, পৃঃ, ৭২, কিফায়া আল আসার, খঃ, ৭, পৃঃ, ৭, (পুরোনো প্রিন্ট) কিফায়া আল আসার, পৃঃ, ৫৩, ৬৯ (কোম প্রিন্ট) গায়াতুল মারাম, খঃ, ১০, পৃঃ, ২৬৭, ইসরাতুল হুদা, খঃ, ৩, পৃঃ, ১২৩।

“শপথ আসমানের যাহার মধ্যে বুরুজ।” (অর্থাৎ কক্ষপথ ও শিখর রয়েছে**)**। **(**বুরুজ**-**১**)**

হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, “আসমান দ্বারা আমি এবং উহার মিনার দ্বারা আমার বংশের পবিত্র ইমামগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের প্রথম হলো হযরত আলী আর শেষ মোহাম্মদ আল মাহদী (আঃ) তাঁরা বারজন ইমাম।” অন্য এক বর্ণনায় নবী (সাঃ) বলেছেন, “আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত বারজন ইমাম হবে তাঁদের প্রথম হবে হযরত আলী এবং তাঁর শেষ ইমাম হবে মোহাম্মদ মাহদী (আঃ) যাঁরা আমার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্ত।” অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “হযরত আলী হতে আমার দুই নয়ন সমতুল্য হবে যাঁরা জান্নাত বাসীদের সর্দার হবে। তাঁরা হল ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং হোসাইনের সন্তান হতে, নয়জন ইমাম হবে। তাঁদের আনুগত্য আমার আনুগত্য এবং তাঁদের বিরোধিতা আমার বিরোধিতা। তাঁদের হতে নবম ইমাম কায়েম মোহাম্মদ মাহদী (আঃ) হবে।”

সূত্র, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪৩, ৪৩০, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৫৫, মেহদী, পৃঃ, ২৭৩, ইবনে শাহর আশব, খঃ, ২, পৃঃ, ২৮৪, আনিসুল মোওয়াহহেদীন, পৃঃ, ১৯৩, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৫, পৃঃ, ৯০, ৯২, হুলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৩৩, কানজুল উম্মাল, খঃ, ৬, পৃঃ, ২০১, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৯১, ফাজায়েলুন খামছা, খঃ, ২, পৃঃ, ২৩।

নবী **(**সাঃ**)** তাঁর উত্তরসূরীর সংখ্যা বারো বলে ঘোষণা করেছেন।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আমার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তের সংখ্যা বারো হবে। সকলেই কুরাইশ বংশ থেকে হবেন।

যেমনঃ **(**সহীহ্ বুখারীতে**)** “জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন “বারোজন আমির (নেতা) (আমার পরে) আগমন করবে। অতঃপর একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন আমি শুনতে

পাইনি। আমার পিতা বলেন, তিনি (নবী সাঃ) বলেছেন তাঁরা সকলে "কুরাইশ বংশ" থেকে হবেন।

(সহীহ্ মুসলিম থেকে**)** আমি আমার পিতার সাথে নবী (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। অতঃপর আমি শুনতে পেলাম যে তিনি নবী (সাঃ) বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত "বারোজন" আমির (নেতা) আগমন না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না।" তিনি (জাবির) বলেনঃ নবী (সাঃ) কি যে বললেন আমি তা বুঝতে পারিনি। তিনি বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম তিনি কি বলেছেন? উত্তরে আমার পিতা বলেন, তিনি বলেছেন তাঁরা সবাই "কুরাইশ বংশ" থেকে হবেন।"

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের যাচাই করার জন্য কিছু সূত্র উল্লেখ করলাম, যাতে নিজেরাই পরীক্ষা করতে পারেন। পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

সূত্র, সহীহ আল বুখারী, খঃ, ৬, হাঃ, ৬৭১৬ (আধুনিক) সহীহ আল বুখারী, খঃ, ৬, হাঃ, ৩২৪২ (ই, ফাঃ) সহিহুল বুখারী, খঃ, ৬, হাঃ, ৭২২২ (আহলে হাদীস, লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত,) সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৫, হাঃ, ৪৫৫৪, ৪৫৫৫, ৪৫৫৭, ৪৫৫৮, ৪৫৫৯ (ই, ফাঃ) সহীহ্ আবু দাউদ, খঃ, ৫, হাঃ, ৪২০০, ৪২০১ (ইফাঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ, ৫, হাঃ, ৬৭৯৬ (বৈরুত) সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩০৮, সহীহ্ তিরমিজী, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৫। মুসনাদে আহমাদ, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৯৮, খঃ, ৫, পৃঃ, ৮৬, ১০৫। (আরবী) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ৯৭। আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৫৮৮ (উর্দু)। মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬১৭-১৮, (ভারত)। তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১৪, পৃঃ, ৩৫৩, হাঃ, ৭৬৭৩ (আরবী)। মুনতাখাব কানজুল উম্মাল, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩১২, (হায়দারাবাদ)। তারিখ আল খোলফা, পৃঃ, ১০। (আরবী) আস সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, ১৮৯। (আরবী) ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৬৬৭ (উর্দু) কানজুল উম্মাল, খঃ, ১২, পৃঃ, ১৬৫, হাঃ, ৩৪৫০১। মাকতাল আল হোসাইন লি খাওয়ারেজমী, পৃঃ,

১৪৬। তারিখে দামেশক, খঃ, ৭, পৃঃ, ১০০ (আরবী) উসুদুল গাবা, খঃ, ৫, পৃঃ, ৫৭৪ (আরবী)।

আমার পর বারোজন নেতা হবেন। তাঁরা সবাই বনি হাশেমগণের মধ্যে হতে হবেন।

নবী (সাঃ) আবার অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, আমার পর “বারোজন নেতা হবেন।” তাঁরা সবাই “বনি হাশেমের” মধ্য হতে হবেন।” সূত্র, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪১৬ (উর্দু)।

মাসনা বিন হারেসা বিন সালমা রাবয়ী সায়রানী বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আল্লাহ্র রাসূলের উত্তরসূরী কত জন হবেন? তিনি আমাকে বললেন, হযরত রাসূল (সাঃ) বলেছেন “আমার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্তের সংখ্যা “বারোজন হবে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা তাঁরা হবেন? তিনি (সাঃ) বললেনঃ “তাঁদের নাম আমার কাছে লিখা আছে। আমি বললাম যে, তাঁদের চিহ্ন ও নিশানী আমাকে বলে দিন কিন্তু তিনি তাঁদের কোন আলামত আমাকে বললেন না।” সূত্র, কেফায়াতুল মোওয়াহহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৮।

হযরত ইবনে মাসউদ নবী (সাঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী বর্ণনা করেন যে, আমি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার পরবর্তী কালে কতজন নেতা (ইমাম) হবেন? নবী (সাঃ) বললেন যে, “বনী ইসরাইলের খতিবদের ন্যায় বারোজন হবে।” সূত্র, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪১৫, সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃঃ, ১৩ (মিশর) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ৯৬।

আমাদের আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত সুফি আরেফবিল্লাহ্ আলেম আল্লামা সৈয়দ আলী হামদানী শাফায়ী সুন্নি বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, “আমি, আলী, ফাতেমা, হাসান, ও হোসাইন এবং হোসাইন (আঃ) এর পরবর্তী নয়জন সন্তান পাক পবিত্র ও মাসুম।” একই গ্রন্থে তিনি

আরো বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি তামাম নবীদের সর্দার (সাইয়্যেদুল আম্বিয়া) এবং আলী তামাম ওয়াসীর সর্দার (সাইয়্যেদুল আওসিয়া), আর আমার পর "বারোজন উত্তরসূরী হবে।" তাঁদের মধ্যে "প্রথম হচ্ছেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব ও শেষ হচ্ছেন ইমাম মাহদী" (আঃ) (আখেরউজ্জামান)।" সূত্র, মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ, ৯৮, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪১৬ (উর্দু)।

উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য

নবী (সাঃ) এর বারোজন উত্তরসূরীর হাদীসগুলোর কোন কোনটিতে ইসলামের সম্মানকে বার জন নেতার মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। আবার, কোন কোনটিতে ধর্মের অস্তিত্ব ও আয়ু কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই হবেন, কুরাইশ ও বনি হাশেম বংশোদ্ভূত। কিন্তু নবী (সাঃ)-এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার পরেও আমাদের আলেমগণ নবী (সাঃ)-এর সেই বারোজন উত্তরসূরীকে বাদ দিয়ে, তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা নিজেরাই আবার বারোজন উত্তরসূরীর নাম প্রকাশ করেছেন। এবং তর্ক-বিতর্কের সময় নবীর সেই বারোজন উত্তরসূরীর নাম প্রকাশ করতে তারা নারাজ।

আমি সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সেই সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তার আগে একটু দেখি পবিত্র কোরআন আমাদের কি হুকুম দিচ্ছে : যেমন,

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়াত মানুষের জন্য নাযিল করেছি, কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরেও যারা তা গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদের অভিসম্পাত দেন।" (বাকারা-১৫৯)

"অবশ্যই তাদের মধ্যে একদল সত্যকে জেনেও গোপন করে।" (বাকারা-১৪৬)

“তোমাদের প্রতি পালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর অনুসরণ কর, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমাদের (নির্বাচিত) নেতাদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।” (আরাফ-৩)

“হেদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সাথে মতবিরোধ করে তাঁর বিরোধিতা করে এবং ঈমানদারদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে সে নিজে যে দিকে ফিরে যেতে চায়, আমি (আল্লাহু) তাকে সে দিকে ফিরিয়ে দেবো। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।” (নিসা -১১৫)

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ হচ্ছে এমন এক ঊর্ধ্বর্তন হুকুম (Supreme Order) যার মোকাবিলায় ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আনুগত্যের পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন, সে সব ব্যাপারে কোন মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা দেওয়ার অধিকার রাখে না। আর, যদি কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ) এর ফয়সালার উপর নিজের ফয়সালা দেয় তবে মানতে হবে “নাউযুবিল্লাহ”, সে আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী, তাই নয় কি? “আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ) এর ফয়সালা থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো এবং তাঁর বিরোধিতা, অবাধ্যতা ঈমানের পরিপন্থী।”

যাই হোক, আমাদের আলেমগণ সেই বারোজন উত্তরসূরীর হাদীস-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চরম অচল অবস্থায় নিপতিত হন। কারণ, তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোলমাল পাকিয়ে ফেলেন। এক একজন এক একরকম ব্যাখ্যা দেন যেমন বারোজন হলেন, “চার খলিফা ও তার পরে বনি উমাইয়া ও আব্বাসীয়া।” অথচ আমরা জানি যে, প্রথম চার খলিফার সবাই কুরাইশ ও বনি হাশেম গোত্রের ছিলেন না ও তারা চারজন ছিলেন, বারোজন ছিলেন না, হিসাব কিন্তু মিলে না। উমাইয়াদের যোগ

করেও না, আর আব্বাসিয়াদেরকে যোগ করেও না। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই বারোজন নেতাকে জোড়া দিতে গিয়ে এজিদের মত ফাসেক, জালিম ও কাফেরকেও এই বারোজন নেতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, "সে নবীর নাতি, জান্নাতের সরদার, খাতুনে জান্নাতের সন্তান-এর হত্যাকারী।" আমি সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্য আমাদের আহলে সুন্নাত-এর ওলামাদের কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে এজিদকে জালিম, ফাসেক ও কাফের বলে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছে।

যেমন, এজিদকে লা'নিন বলেছেন, মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, দিয়ারে হাবিব গ্রন্থে এবং আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি, তারিখে খোলফা গ্রন্থে। আর এজিদ-ই-পালীদ বলেছেন, শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী, তোহফা ইসনা আশারিয়া কিতাবে। কোন কোন আলেম চরম মন্তব্য করতে গিয়ে এজিদকে কাফের পর্যন্ত বলেছেন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাকে ফাসেক বলেছেন, এমদাদুল ফাতাওয়া কিতাবে। এরা সকলে আমাদেরই সুন্নি আলেম। তাই সুন্নি মতে, এজিদ নূন্যতম পর্যায়ে ফাসেক, লা'ইন, ও পালীদ, আর চরম পর্যায়ে কাফের। সে মুত্তাকী ও পরহেজগার মোটেই ছিল না। উক্ত বিশ্লেষণে, এজিদের অবস্থান কোথায় তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। যে তাকে খলিফা বানিয়েছিল ও যারা তার হাতে বায়াত করেছিল, তারাও তার কর্মফলের অংশ পাবে।

আর হানাফী মাজহাব-এর প্রামাণ্য কিতাব হিদায়াতের গ্রন্থকার এজিদের বাবা মুয়াবিয়াকে, জালিম বাদশার সারিতে উল্লেখ করেছে, আল্লামা যাহবী উল্লেখ করেন যে, "এজিদ, পবিত্র মদীনা শরীফ ধ্বংস ও অপবিত্র করার পর মক্কায় অভিযান পরিচালনা করে। পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্য পবিত্র কা'বা ঘরে আঘাত হানে। পবিত্র কা'বা ঘরের পবিত্র গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয়। পবিত্র কা'বা ঘরের দেয়ালে ভাঙ্গন ধরায় ও ছাদে ফাটল সৃষ্টি করে। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বদলে যে কুরবানীকৃত মেষের শিং ছিল, তা জ্বলে ছারখার হয়ে যায়। এসবই হল এজিদি আমলের কৃতিত্ব। কোন কাফেরও পবিত্র কা'বা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়ার সাহস পায়নি।

এজিদ তা করেছে, সে কাফেরকেও হার মানিয়েছে।" "আল্লামা আলূসি তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে এজিদ কাফের ছিল বলে উলামাদের অভিমত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এজিদের কাফের হওয়া সম্পর্কে এবং তার প্রতি লানত (অভিশম্পাত) করার বৈধতার বিষয়ে আহলে সুন্নাত-এর এক জামাত ওলামা পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন। তাঁরা হলেন, ইবনুল জাউজি আর তার পূর্বে কাযী আবু ইয়ালা, আর আল্লামা তাফতায়ানী বলেছেন, আমরা এজিদের ব্যাপারে দ্বিধা করব না। তার প্রতি, তার সাহায্যকারীদের প্রতি এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আল্লাহ্র লানত (অভিশম্পাত) যারা স্পষ্টভাবে এজিদকে লা'নত করেছেন তাদের মধ্যে জালালুদ্দিন সুয়ূ্যতিও রয়েছেন।"

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অনুরোধ করছি, নিম্নে যে গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করেছি, তা আপনারা নিজেরা যাচাই করে দেখুন, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সূত্র, ফুরাত কূলে ইমাম হোসাইন, পৃঃ, ৭৩-১০৪ (মাওঃ মোঃ হমিদউদ্দিন গাজীপুরী) খিলাফতের ইতিহাস, পৃঃ, ১০২, (মুহাঃ আহসান উল্লাহ ১৯৮০ইং) (ই, ফাঃ) জাজবুল কুলুব ইলাদিয়ারে হাবিব, তোহফা ইসনা আশারিয়া, সারহে আকাইদ নাসাফী, পৃঃ, ১৬২, হিদায়া, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৩৩, তারিখুল খোলফা, পৃঃ, ১৯৭, তাবারী, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৮৮, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ, ৮, পৃঃ, ১১৫, আজজাবুল মাসালিক, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৮২, মাকতাল-ই-খাওয়ারিজমি, খঃ, ১, পৃঃ, ১৭৮-১৮০, এমদাদুল ফাতওয়া, খঃ, ১, পৃঃ, ৫৩০। তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খঃ, ২৫, পৃঃ, ৭২, ৭৩, ৭৪।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা: **"**কোন মোমিনকে যে ব্যক্তি জেনেশুনে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত **(**অভিশম্পাত**)** এবং তার জন্য বড় ধরনের আযাব তৈরি করে রেখেছেন।**" (**নিসা**-**৯৩**)**

আরো এরশাদ হচ্ছে: “কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।” (মায়েদা-৩২)

একটি কথা না বললেই নয় “ইসলামে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ এজিদের বাবা মুয়াবিয়া ও এজিদের দ্বারা ঘটেছে” এটা ঐতিহাসিক সত্য যা বর্তমানে অনেক দেশে অব্যাহত রয়েছে, যে যার অনুসারী সে তারই System কে অনুসরণ করবে, এটাই বাস্তব। আমি সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের গবেষণার মানবৃদ্ধির জন্য যারা এজিদকে ফাসেক ও কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছেন এবং তারা সবাই এটাও স্বীকার করেছেন যে, “এজিদের হুকুমেই ইমাম হোসাইনকে শহিদ করা হয়েছে।”

সূত্র, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ, ৮, পৃঃ, ১১৪৬, সিয়ার আলম আল নূবালা, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৭, আল সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, পৃঃ, ১৩১, শারাহ ফেকাহ আকবার, পৃঃ, ৭৩, ফাতওয়া আজিজি, পৃঃ, ৮০, নুরুল আবসার, পৃঃ, ৯৭, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৩২৫, তারিখে ইবনে খালদুন, খঃ, ১, পৃঃ, ১৭৯, শারাহ আকায়েদ নাসাফী, পৃঃ, ১১৩, তারিখে কামিল, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৫২, ১৫৩, ৪৫০, আল ইমামাত ওয়াস সিয়াসাহ্, পৃঃ, ১৬৫, ইকন উল ফরিদ, খঃ, ২, পৃঃ, ২৫৮, তারিখ আবু আল ফালা, খঃ, ১, পৃঃ, ১৮৫, আল আকবার আল তাওঈল, পৃঃ, ২৬৮, তারিখ আল তাবারী, খঃ, ৭, পৃঃ, ১৪৬, রাসাইল (আবু বকর জাওযী), পৃঃ, ১২৯, তাজকিরাতিল খাওয়াস, পৃঃ, ১৬৪, তারিখ আল খুলফা, পৃঃ, ২০৪, হায়াত আল হায়ওয়ান, খঃ, ২, পৃঃ, ১৯৬, তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ৫, পৃঃ, ৬১, (সুরা ইব্রাহিম) তোহফায়ে ইশনা আশারিয়া, পৃঃ, ৬, মাতালেবাস সাউল, খঃ, ২, পৃঃ, ২৬, আর তাবাকাত আল আকবার, খঃ, ৫, পৃঃ, ৬৬, মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ৫২২, তারিখে ইবনে আসাকির, পৃঃ, ২৭৫, আল ইসাবা, পৃঃ, ১৮১, মিযান আল ইতিদাল, খঃ, ৪, পৃঃ, ৪৪০, ওয়াফা আল ওয়াফা, খঃ, ১, পৃঃ, ১২৭, মুজম আল বুলদান,

খঃ, ২, পৃঃ, ২৫৩, ফাতহুল বারি, খঃ, ১৩, পৃঃ, ৭০, ইরশাদ আল সারি, খঃ, ১০, পৃঃ, ১৭১, সিরকাস সাহাদাতাইন, পৃঃ, ২৬, মিনহাজ উস সুন্নাহ্ (ইবনে তাইমিয়া), পৃঃ, ২৩৯, তাকমিল আল ঈমান, পৃঃ, ১৭৮, শাহিদ ই কারবালা (মুফতি মোঃ শফি), পৃঃ, ১১-১২, শারাহ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, খঃ, ৫, পৃঃ, ৪৩৫, (শেখ মোঃ যাকারিয়া) তারিখে মিল্লাত (কাজি জয়নুল আবেদীন), পৃঃ, ৫৫, শারাহ সিফ্ (মুল্লাহ আলিকারী), খঃ, ১, পৃঃ, ৬৬৪, শারাহ জামেহ সাগির, খঃ, ৩, পৃঃ, ৩৮২, এজিদ বিন মুয়াবিয়া (ইবনে তাইমিয়া), পৃঃ, ৩০, মাকতুবাত (সানাউল্লাহ পানিপথী), পৃঃ, ২০৩, আল সাবিয়া (কেরেলভী), পৃঃ, ৬০, আল মাহফুজ (কেরেলভী), পৃঃ, ১১৪, আহসান আওলা, পৃঃ, ৫২, (কেরেলভী) আহকামে শারিয়াত, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৪, (কেরেলভী) ফাতওয়া রশিদিয়া, খঃ, ১, পৃঃ, ৭, উমদাতুল কারী ফী শারাহ বুখারী, খঃ, ১১, পৃঃ, ৩০৪।

“আমাদের আহলে সুন্নাত**-**এর ওলামা ফাতওয়া দিয়েছেন যে**,** **“**ইসলামী খেলাফত মুয়াবিয়া ও এজিদের জন্য বাতিল।**”** সূত্র, ইযাযাতুল খিফা, পৃঃ, ৬০, শারাহ মুওয়াক্কাক, পৃঃ, ৭৩১, আল আহকামুল সুলতানিয়া, পৃঃ, ৮, তাওফ ইশনা আশারিয়া, পৃঃ, ১৭৪।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এজিদ হচ্ছে ফাসেক ও কাফের, কিন্তু যারা এই ফাতওয়া দিয়েছেন, “আবার তারাই “এজিদকে মুসলমানদের ৬ষ্ঠ খলিফা বলেন।” এটা কি সম্ভব? একই ব্যক্তি একই সময়ে মুত্তাকী, আবার কাফের কিন্তু এটা করা হয়েছে। যেমন যারা এজিদকে ৬ষ্ঠ খলিফা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো, যাতে সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সত্যিকারের বারোজন নেতার পরিচয় প্রকাশ পায়। যারা এজিদকে ৬ষ্ঠ খলিফা বলেন তাঁদের গ্রন্থের নাম, যেমনঃ- সূত্র, শারাহ্ ফিকহে আকবার, পৃঃ, ৫০ (হানাফী), সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, পৃঃ, ১২, তারিখ আল খোলফা, পৃঃ, ১১, তারিখ আল খামেস, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯১, উমদাতুল কারী ফি শারাহ্ বুখারি, খঃ, ১১, পৃঃ, ৪৩১।

এখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো যে, নবীজির সেই বারোজন উত্তরসূরীর নাম বাদ দিয়ে, যারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে বারোজন-এর নাম প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যা কিনা আমাদের সুন্নি আলেম ও বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব মতামত।

ইবনে আল আরাবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা।

রাসূল (সাঃ) এর পর বারোজন নেতা আমরা গণনা করেছি তাঁরা হলেন, ১) আবু বকর ২) ওমর ৩) উসমান ৪) আলী ৫) হাসান ৬) মুয়াবিয়া ৭) এজিদ ৮) মুয়াবিয়া বিন এজিদ ৯) মারওয়ান ১০) আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ১১) এজিদ বিন আব্দুল মালিক ১২) মারওয়ান বিন মোঃ বিন মারওয়ান আস সাফফাহ্...এর পর বনি আব্বাসের ২৭ জন খলিফা ছিল। এখন যদি আমরা বারো সংখ্যাটিকে বিবেচনায় আনি তাহলে কেবল সুলাইমান পর্যন্ত পৌঁছা যায়, আর যদি আমরা এর আক্ষরিক অর্থকে গ্রহণ করি তাহলে, সর্বোচ্চ পাঁচ জন পর্যন্ত বিবেচনায় আনতে পারি। যাদের চারজন হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পঞ্চম ব্যক্তি হলেন (উমাইয়া) ওমর বিন আব্দুল আজিজ আমি এ হাদীসের অর্থ বুঝতে পারছি না। সূত্র, ইবনে আল আরাবী, শারহে সুনান তিরমিজী, খঃ, ৯, পৃঃ, ৬৮-৬৯।

কাজী ইয়াদ আল ইয়াহ সুবীর নিজস্ব ব্যাখ্যা।

খলিফার সংখ্যা আরও বেশি, এ সংখ্যা বারোতে সীমিত রাখার ব্যাপারটি সঠিক নয়। “রাসূল (সাঃ) একথা বলেন নি যে, এদের সংখ্যা কেবলই বারো এবং এরপর আর বেশি হবার সুযোগ নেই। সুতরাং এ সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।” সূত্র, আল নববী, শারহে সহীহ মুসলিম, খঃ, ১২, পৃঃ, ২০১-২০২, ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারি, খঃ, ১৬, পৃঃ, ৩৩৯।

জালালুদ্দিন আল সুয়ুতির নিজস্ব ব্যাখ্যা।

কিয়ামত পর্যন্ত মাত্র বারো জন নেতা, তাঁরা সকলেই সত্যের ওপর থাকবেন, যদিও তাঁরা একের পর এক আগমন নাও করেন। "আমাদের মতে তারা হলেন "চার খলিফা, এরপর যথাক্রমেঃ হাসান, মুয়াবিয়া, ইবনে জুবায়ের, এবং শেষে ওমর বিন আব্দুল আজিজ। এই হলো মোট আট জন। আর বাকি চারজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন মাহদী, যিনি আব্বাসীর হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। " যেমন করে ওমর বিন আব্দুল আজিজ একজন উমাইয়া ছিলেন, তাই তিনিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন, কারণ তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, সুতরাং আরও দুইজনের এখনও আগমন ঘটেনি। একজন হলেন মাহদী, যিনি আহলে বাইত (আঃ)-এর অন্তর্ভুক্ত। সূত্র, আস সুয়ূতী, তারিখুল খোলফা, পৃঃ, ১২, ইবনে হাজার আল হায়সামী আল সাওয়ায়িক আল মুহরিকাহ, পৃঃ, ১৯।

তারিখে ইবনে কাসীর এর নিজস্ব ব্যাখ্যা।

যারা বায়হাকীকে অনুসরণ করে একমত পোষণ করেন যে, জামা'আ অর্থ সেইসব খলিফাবৃন্দ "যারা পাপিষ্ঠ ওয়ালিদ ইবনে এজিদ ইবনে আব্দুল মালিক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এসেছে বলে মনে করেন, তাদের বর্ণনা হাদীসের সেইসব বর্ণনাকারীর সাথে তুলনীয় যাদের হাদীস গ্রহণ করা হয় না বরং সমালোচনা করা হয়। আর যদি আব্দুল মালিকের পূর্বে ইবনে জুবায়ের-এর খিলাফাতকেও গণনায় ধরা হয় তাহলে, এ সংখ্যা দাঁড়ায় ষোলোতে। অথচ, ওমর বিন আব্দুল আজিজ এর পূর্ব পর্যন্ত এ সংখ্যাটি বারো হওয়া উচিত। এ পদ্ধতিতে গণনা করলে এজিদ ইবনে মুয়াবিয়াও যুক্ত হবে " এবং বাদ পড়বেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। সে যাই হোক এটি প্রতিষ্ঠিত যে, অধিকাংশ আলেম ওমর বিন আব্দুল আজিজকে একজন সত্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা মনে করেন। সূত্র, ইবনে কাসীর তারিখ, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৪৯-২৫০।

সীরাতুন নবীীতে, আল্লামা শিবলী নুমানী বলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা হওয়ার খোশ খবরী বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে (কিতাবুল ইমারত), এই সময় পর্যন্ত ইসলামী হুকুমত ভালোভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ এই খলিফাগণ রাজ্য শাসন করবেন। আর এই হুকুমত ঐ সময় পর্যন্ত খতম হবে না, যতক্ষণ এই বারোজন খলিফা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করবেন। বারোজন খলিফা পর্যন্ত ইসলাম পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বিকশিত হতে থাকবে। আমার পরে কুরাইশদের মধ্য হতে বারোজন খলিফা নিযুক্ত হবে তারপর ছোট লোকের দল খলিফা পদে বহাল হবে। আবু দাউদ (কিতাবুল মাহদী) এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দ্বীন সব সময়ই কায়েম থাকবে। এমনকি তাঁদের মাঝে বারোজন খলিফার সময় অতিবাহিত হবে। তাঁদের মতাদর্শে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদী সমবেত হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেম কাজী ইয়াজ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকল খলিফাদের মাঝে বারোজন দ্বারা ঐ সকল লোকদের বুঝানো হয়েছে, যাঁদের দ্বারা ইসলামের খেদমত আঞ্জাম পেয়েছে বা যাঁরা ইসলামের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন, “এমন কি তারা ছিলেন মুত্তাকী শ্রেণীভুক্ত।” হাফেজ ইবনে হাজার আবু দাউদের এই বর্ণনাকে সামনে রেখে খোলাফায়ে রাশেদীন ও বনী উমাইয়াদের মাঝে নিম্নলিখিত বারোজনের নাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ১) হযরত আবু বকর ২) হযরত ওমর ফারুক ৩) হযরত ওসমান গণি ৪) হযরত আলী ৫) আমিরে মুয়াবিয়া ৬) এজিদ ৭) আব্দুল মালেক ৮) ওয়ালিদ ৯) সুলায়মান ১০) ওমর বিন আব্দুল আজিজ ১১) এজিদ সানী বা দ্বিতীয় এজিদ এবং ১২) হিশাম। সূত্র, সীরাতুন নবী (আল্লামা শিবলী নুমানী), খঃ, ৪, পৃঃ, ১৪১৪, (সন, ১৯৮৯, ইং, তাজ কোং, ঢাকা)।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে, এজিদকে কাফের ঘোষণা করা হলো, আবার সেই এজিদ দ্বারা ইসলামের খেদমত হয়েছে ও মুত্তাকীদের শ্রেণীভুক্ত। কেন হবে না, সে নবীর সন্তানকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে, এটি কি ইসলামের খেদমত?

“কোন মোমিনকে যে ব্যক্তি জেনে শুনে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে তার উপর আল্লাহ্র লা’মত (অভিশম্পাত) এবং তার জন্য বড় ধরনের আযাব তৈরি করে রেখেছেন।” (নিসা-৯৩) আরো এরশাদ হচ্ছে “কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।” (মায়দা-৩২) নবী (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, “একজন মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার হাত এবং মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।” সূত্র, সহীহ্ আল বুখারী, খঃ, ১, হাঃ, ৯, ১০ (তাজ কোং, ঢাকা)।

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে আমি আরও কিছু আহলে সুন্নাত-এর বিশেষজ্ঞদের মতামত এখানে তুলে ধরবো এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর ঐ বারোজন সঠিক উত্তরসূরী, খলিফা, আমীর ও ইমাম। প্রসিদ্ধ ওলামা ও বিখ্যাত গবেষক আয যাহাবী তার তাজকিরাত আল হুফফাজ গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার আসকালানী তার আল দুরাল আল কামেনা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সদরুদ্দীন ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আল হামাওয়ায়ী আল জুওয়াইনি আল শাফায়ী একজন সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। উক্ত আল জুওয়াইনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন “রাসূল (সাঃ) বলেন আমি নবীদের প্রধান এবং আলী ইবনে আবি তালেব উত্তরসূরীদের প্রধান, আর আমার পর উত্তরসূরীর সংখ্যা হবে বারো, যাঁদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে হযরত আলী, এবং শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহদী (আঃ)।” সূত্র, তাজ কিরাত আল হুফফাজ, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৯৮। আল দুরাল আল কামেরা (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ, ১, পৃঃ, ৬৭। ফারায়েদ সিমতাইন (আল জুওয়াইনি), পৃঃ, ১৬০ (বৈরুত)।

প্রসিদ্ধ আহলে সুন্নাত-এর পণ্ডিত শায়খ সুলাইমান কান্দুজী হানাফী তুর্কি, তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাতে বর্ণনা করেছেন যে, নাছাল নামক একজন ইয়াহুদি মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত

হয়ে আরজ করলো, ইয়া মোহাম্মদ (সাঃ), কয়েকটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই, যা কিছুদিন থেকে আমার মানসপটে আন্দোলিত হচ্ছে। যদি আপনি এর সঠিক উত্তর আমাকে প্রদান করেন তাহলে আমি আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করবো। নবী (সাঃ) বললেন, "হে আবু আম্মারা তুমি প্রশ্ন করে যাও কোন অসুবিধে নেই।" ঐ ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্ন করলো এবং প্রতিবারই বললো, আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন বলে সম্মতি প্রকাশ করলো। লোকটি জিজ্ঞাস করলো, আমাকে বলে দিন আপনার পর কে আপনার উত্তরসূরী হবে? কেন না, কোন নবীই উত্তরসূরী না রেখে বা ঘোষণা না দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেন নি, আমাদের নবী হযরত মুসা (আঃ) বলে গেছেন তাঁর অবর্তমানে হযরত ইউসা বিন নুন হলেন তাঁর উত্তরসূরী। নবী (সাঃ) ইহুদি লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আমার পর আমার উত্তরাধিকারী বা উত্তরসূরী হচ্ছে "আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালেব" এবং তাঁর পর আমার দুই সন্তান "হাসান ও হোসাইন" অতঃপর অবশিষ্ট "নয়জন হবেন ইমাম হোসাইন এর বংশ থেকে আগমন করবেন।" লোকটি বললো ইয়া মুহাম্মদ (সাঃ), দয়া করে বাকিদের নাম বলে দিন। নবী (সাঃ) বললেন, "হোসাইন-এর পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র "জয়নুল আবেদীন" হবে, তাঁর অন্তর্ধানের পর স্বীয় পুত্র "মোহাম্মদ বাকের" হবে। তাঁর ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র "জাফর সাদেক" হবে, আর জাফর সাদেক-এর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র "মুসা কাজেম" হবে। তাঁর ইহলোকত্যাগের পর তদীয় পুত্রঃ "আলী রেজা" হবে, তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র "মুহাম্মদ তাকি" হবে। তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র "আলী নাকী" হবে। তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র হাসান আসকারী" হবে, আর তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র "ইমাম মাহদী" (আঃ) পর্যায়ক্রমে ইমাম হবেন। তাঁরা আল্লাহ্র হুজ্জাত বা জমিনের বুকে অকাট্য দলিল।" পরক্ষণেই ইহুদি লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো।

সূত্র, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৪৪১, (বৈরুত) ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৬৬১-৬৯৪ (লাহোর, উর্দু) ফারায়েদ-আসসিমতাইন

হামভিনি, খঃ, ২, পৃঃ, ১৩৩, ৩১২। সিয়রানীও আল ইয়াওয়াকিত ওয়াল জওয়াহীর খঃ, ৩, পৃঃ, ৩২৭।

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর গ্রন্থে, ১২ ইমামের বর্ণনা।

নবী (সাঃ) ইমাম হোসেনের পৃষ্ঠদেশে শীতল হস্ত বুলাতে লাগলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার নয়নমনি ন্যায় ও সত্যের মূর্তপ্রতীক শেরে খোদা আলীর সুযোগ্য এবং মর্যাদার অধিকারী পুত্রধর! আল্লাহ্ পাক তোমার ন্যায় পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটারই বদৌলতে ভবিষ্যতে তোমার বংশে নবরত্নের আবির্ভাব ঘটবে। "তাঁদের প্রত্যেকেই হবে এক একজন ইমাম।" তাঁদের সত্যনিষ্ঠা ন্যায়নীতির জন্য আবহমান কাল ধরে এই নশ্বর পৃথিবী গৌরবানুভব করবে। এবং তাঁদের কীর্তিগাথার যশোগার গাইতে থাকবে। হে আমার বংশের প্রদীপ তোমার দ্বারাই আমার বংশের সূত্র বিশ্ব ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকবে। তুমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁদের নাম স্মরণ রাখো। তাঁরা হলেনঃ ৪) হযরত জয়নুল আবেদীন, ৫) হযরত মুহাম্মাদ বাকের ৬) হযরত জাফর সাদেক ৭) হযরত মুসা কাজেম ৮) হযরত আলী রেজা ৯) হযরত তাকী ১০) হযরত নাকী ১১) হযরত হাসান আসকারী ১২) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)! সূত্র, গুনিয়াতুত তালেবিন, পৃঃ, ৩৮০, (তাজ কোং, ঢাকা)।

"নবী কারীম (সাঃ) এর কামালাতে বেলায়েতের দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছিলেন হযরত আলী।"

এই কামালাতে বেলায়েত সম্পর্কে আর একটু জানা দরকার। "এই বেলায়েতের রাস্তায় শ্রেষ্ঠ নেতা হলেন হযরত আলী।" নবী (সাঃ) এর দুই কদম মোবারক তাঁর মাথার উপরে আছে, হযরত মা ফাতেমা ও তাঁর দুই সন্তান এই মাকামে অংশ পেয়েছেন যখন হযরত আলীর সময় চলে গেল, তখন তাঁর দুই পুত্র (হাসান ও হোসাইন) এই বেলায়েতের ভার গ্রহণ করেন, উনাদের প্রত্যেকের জমানার মধ্যে অন্য যে কোন ব্যক্তি ফয়েজ পাইতেন। তিনি তদানীন্তন ইমামের

নিকট হতেই পাইতেন। এইভাবে একজনের সময় যখন শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ, তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন তখন দ্বিতীয় আর একজন ইমাম হন এবং সমস্ত লোক তখন তাঁদের নিকট হতে ফয়েজ গ্রহণ করেন। পূর্বের ইমামের যুগ এইভাবে একে একে চলে যায়। উক্ত বারোজন ইমাম এর নাম ১) হযরত আলী, পিতা আবু তালেব ২) আবু মোহাম্মদ হাসান, পিতা হযরত আলী ৩) ইমাম আবদুল্লাহ হোসাইন, পিতা হযরত আলী ৪) ইমাম জয়নুল আবেদীন, পিতা ইমাম হোসাইন, ৫) ইমাম মোহাম্মদ বাকের, পিতা ইমাম জয়নুল আবেদীন, ৬) ইমাম জাফর সাদেক, পিতা ইমাম বাকের, (ইনি ইমাম আবু হানীফার ওস্তাদ ছিলেন) ৭) ইমাম মুসা কাজেম, পিতা ইমাম জাফর সাদেক, ৮) ইমাম আলী রেজা, পিতা ইমাম মুসা কাজেম, ৯) ইমাম মোহাম্মদ তাকী, পিতা ইমাম আলী রেজা, ১০) ইমাম আলী নাকী, পিতা ইমাম তাকী ১১) ইমাম হাসান আসকারী, পিতা ইমাম আলী নাকী, ১২) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) পিতা ইমাম হাসান আসকারী।

সূত্র, আত্মদর্শনে সত্যদর্শন (এ,টি খলীল আহমদ), খঃ, ১, পৃঃ, ৮৬, ৮৭, জ্ঞানধারা, (অধ্যাপক আলহাজ্ব মুহাঃ মুখলেছুর রহমান চৌধুরী (এডভোকেট)), পৃঃ, ১০৫, পীরের মর্যাদা ও ভূমিকা, (মুহাম্মদ মুখলেছুর রহমান চৌধুরী (এডভোকেট)), পৃঃ, ১১৪, নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানী (সৈয়দ মোঃ ইসহাক) পৃঃ, ৫০।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের বিবেক এর কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা কি আল্লাহ্ ও নবীর দ্বারা মনোনীত বারোজন ইমামের অনুসরণ করবেন? নাকি, যাদেরকে আমাদের মত সাধারণ মানুষগণ “বারোজনের” যে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের? আমার বিশ্বাস, যারা পবিত্র কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখেন, তারা অবশ্যই নবীর দ্বারা মনোনীতদের অনুসরণ করবেন, কারণ এরশাদ হচ্ছে,

“রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক

এবং তোমরা আল্লাহ্র কে ভয় কর। আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।" (হাশর-৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার থাকে না। তবে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর (কথাকে) অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব-৩৬)

"অবশ্যই তাদের মধ্যে একদল সত্যকে জেনেও গোপন করে। (বাকারা-১৪৬)"

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিওনা এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।" (বাকারা-৪২)

"আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" (মু'মিনুন-৭০)

"আমি তো তোমাদের কাছে সত্য (হক) পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যের (হকের) প্রতি ঘৃণা পোষণকারী।" (যুখরুফ-৭৮)

"এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহকে চেনার পর অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যকার অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" (নাহল-৮৩)

"বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সত্য জানেই না, তাই তারা সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আম্বিয়া-২৪)

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে বরং আমরা তো তার অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে তবুও কি?" (লোকমান-২১)

“আর যখন কেহ তাদেরকে বলে আল্লাহ্র প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে বরং আমরা ঐ পথেই চলবো যাতে আমাদের বাপ দাদাগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞানই রাখতো না এবং হেদায়েত প্রাপ্তও ছিল না (তবুও)?” (বাকারা-১৭০)

“যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।” (জ্বীন-২৩)

“যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, ইয়া রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (নির্বাচিত) নেতাদের এবং আমাদের (নির্বাচিত) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।” (আহযাব-৬৬-৬৭)

“আমি সৃষ্টি করেছি, দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষকে। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম।” (আরাফ-১৭৯)

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালবাসবে (অনুসরণ করবে), তার সাথেই তার হাশর হবে।” সূত্র, সহীহ মুসলিম, খঃ, ৭, হাঃ, ৬৪৭০ (ই,ফা)।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের বিবেকের কাছে এটার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিচ্ছি যে, কার সাথে আপনারা নিজের হাশর করতে চান? মানুষের মনগড়া নেতাদের সাথে, নাকি, আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (সাঃ)-এর মনোনীত বার ইমাম এর সাথে, কারণ ইসলামে কোন জোর জবরদস্তি নেই, এরশাদ হচ্ছে:-

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে।” (বাকারা-২৫৬)

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্য: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর মনোনীত বারোজন ইমামের জীবনী বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ন করতে চান, তাদের জন্য নিম্নে কিছু আহলে সুন্নাত এর লিখিত গ্রন্থ সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের গবেষণা ও ঐতিহাসিক তথ্যের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেখকের নাম সহ উল্লেখ করছি।

যেমন, সূত্র, মাতালিব আস সাউল ফি মানাকিবে আলে রাসুল। লেখকঃ আল্লামা কামাল উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন তালহা আশ শাফয়ী। আল ওয়াফাইয়াতঃ (ইমাম ইবনে খালকানে)। আল ফুসুল আল মুহিম্মাহ ফি শরিয়াতি আহওয়ালি আয়েম্মা। (লেখকঃ আল্লামা ইবনে সাব্বাগ আল মালেকি)। আশ শাযারাত আয যাহাবিয়্যাহ ফি তারাজিম আল আয়িম্মাতিল ইশনা আশারিয়্যাহ ইন্দাল ইমামিয়্যাহঃ (লেখকঃ আল্লামা ইবনে তুলুন)। নাযহাতুল কুলুবঃ (মাওলানা হামদুল্লাহ মুসতাওফি)। ফুতুফুল হারামাইনঃ (আল্লামা মানযুম মুহি লারী)। ওয়াসিলাতুল খাদিম ইলাল মাখদুম (আল্লামা ফাদলুল্লাহ বিন রুযবাহান খান), আস সাওয়ায়িক আল মুহরিকা (ইবনে হাজার হাইসামী)। মাকামাত জামি (আব্দুল ওয়াসী বয়িরবি)। আল মাকসাদ আল আকসা (কামালউদ্দিন খওয়ার্যমি)। আরজাহুল মাতালেব (ওবাইদুল্লাহ অমৃতসারী)। ইয়া নাবিয়ুল মুয়াদ্দাত (সুলাইমান কান্দুজী হানাফী তুর্কি।

অধ্যায়-৬

আহলে সুন্নাতের হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মাহদী (আঃ)।

"আর সে হচ্ছে কিয়ামতের একটি নিদর্শন।" **(যুখরুফ-৬১)**

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে সিহাহ্ সিততাহ্ ও আহলে সুন্নাতের অন্যান্য সূত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এখানে উদ্ধৃত

নিম্নোক্ত হাদীস ও বর্ণনাগুলো এমন যেগুলোর সত্যতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের হাদীস বিশারদগণ একমত।

১) মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "এমন কি সমগ্র বিশ্বের আয়ু যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কিয়ামত হতে যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও মহান আল্লাহ্ ঐ দিবসটিকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যাতে, তিনি ঐ দিবসেই আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির রাজত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন যাকে আমার নামেই ডাকা হবে। পৃথিবী অন্যায় ও অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর সে তা শান্তি ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে।"

সূত্র, তিরমিযী, খঃ, ২, পৃঃ, ৮৬; আবু দাউদ, খঃ, ২, পৃঃ, ৭; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৭৬, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬৩; মুস্তাদরাক (হাকেম), খঃ, ৪, পৃঃ, ৫৫৭; আল মাজমা' (তাবরানী), পৃঃ, ২১৭; তাহযীবুস সাবিত (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ, ৯, পৃঃ, ১৪৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা (ইবনে হাজার হাইসামী), পৃঃ, ২৪৯; কানযুল উম্মাল, খঃ, ৭, পৃঃ, ১৮৬; ইকরুদ দুরার ফী আখবারিল মাহদী আল মুনতাজার, খঃ, ১২; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান (গাঞ্জী শাফিয়ী), খঃ, ১২; আল ফুসুল আল মুহিম্মাহ (ইবনে সাব্বাগ মালেকী), পৃঃ, ১২; ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ, ৭, পৃঃ, ৩০৫; আল তাযকিরাহ্ (কুরতুবী), পৃঃ, ৬১৭; আল হাবী (সুয়ূতী), খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৫- ১৬৬; শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুনীয়াহ (যুরকানী), খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৪৮; ফাতহুল মুগীস (সাখাওয়ী), খঃ, ৩, পৃঃ, ৪১; আরজাহুল মাতালেব (উবাইদুল্লাহ হিন্দী), পৃঃ, ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ (ইবনে খালদুন), পৃঃ, ২৬৬; জামি'উস সাগীর (সুয়ূতী), পৃঃ, ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী (সুয়ূতী), পৃঃ, ২।

২) মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "মাহদী আমাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের সদস্যদের একজন।" সূত্র, ইবনে মাজাহ্, খঃ, ২, হাঃ, ৪০৮৫, হাদীসে যেমন আমরা দেখতে পাই, ইমাম মাহদী (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি হযরত ঈসা

মসীহ (আঃ) হতে পারেন না। ইমাম মাহদী (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) ভিন্ন দুই ব্যক্তি, তবে তাঁরা দু'জন একই সময় আগমন করবেন। নিম্নোক্ত হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধর হবেন।

৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী, ফাতেমার বংশধর।" সূত্র, ইবনে মাজাহ, হাঃ, ৪০৮৬; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা পৃঃ, ২৪৯।

৪) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ বেহেশতবাসীদের নেতা। স্বয়ং আমি, হামযাহ, আলী, জা'ফার, হাসান, হোসাইন ও মাহদী।" সূত্র, ইবনে মাজাহ, খঃ, ২ হাঃ, ৪০৮৭; মুস্তাদরাকে হাকেম (আনাস ইবনে মালিক-এর সূত্রে বর্ণিত); আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৪৫।

৫) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "মাহদী আমার উম্মাহর মাঝে আবির্ভূত হবে। সর্বনিম্ন ৭ বছর এবং সর্বোচ্চ ৯ বছরের জন্য আবির্ভূত হবে। এ সময় আমার উম্মাহ্ অফুরন্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, যা তারা আগে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। আমার উম্মাহ্ তখন বিপুল পরিমাণ খাদ্যের অধিকারী হবে, যার ফলে, তাদের (খাদ্য) সঞ্চয় করে রাখার আর প্রয়োজন হবে না। সে সময় ধনসম্পদের প্রাচুর্য এত বেশি হবে যে, তখন কোন ব্যক্তি মাহদী-এর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে সে বলবে, এখানে আছে নিয়ে যাও।" সূত্র, ইবনে মাজাহ, খঃ ২, হাঃ, ৫০৮৩।

৬) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আমার ও আমার আহলে বাইতের সদস্যগণের জন্য আল্লাহ্ পারলৌকিক জীবনকে ইহলৌকিক জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন ও মনোনীত করেছেন। আমার (ওফাতের) পরে আমার আহলে বাইতের সদস্যগণ অনেক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করবে এবং তাঁদেরকে ঘর বাড়ী থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে। তখন প্রাচ্য থেকে একদল লোক কালো পতাকাসহ আগমন করবে এবং তাঁদেরকে কিছু ভালো জিনিস (কল্যাণ/অধিকার) প্রদান করার জন্য তারা আবেদন ও অনুরোধ জানাবে। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যাত হবে অর্থাৎ তাদেরককে সেই

কল্যাণ/অধিকার দেওয়া হবে না। এ কারণে তারা যুদ্ধ শুরু করবে; সে যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে এবং তারা যা প্রথমে চেয়েছিল তাই তাদেরককে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে যতক্ষণ না আমার আহলে বাইত থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে এবং যেভাবে পৃথিবী অন্যায় অবিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে তা ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে। তাই যে ব্যক্তি ঐ যুগ প্রত্যক্ষ করবে তার উচিত হবে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়া।" সূত্র, ইবনে মাজাহ, খঃ, ২, হাঃ, ৪০৮২, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৫০-২৫১।

৭) আবু ন্যাদরাজ বর্ণনা করেছেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর সাথে ছিলাম। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মাহ্র সর্বশেষ যুগে একজন খলিফাহ্ হবে যে গণনা না করেই (বিনা হিসাবে) জনগণকে হাত ভরে ধন দৌলত দান করবে।" (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আবু নাদরাম ও আবুল আ'লাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে বুঝাতে চাচ্ছেন?" তাঁরা বললেনঃ না। (অর্থাৎ তিনি হবেন ইমাম মাহদী।)" সূত্র, মুসলিম, কিতাবুল ফিতান (ইংরেজি অনুবাদ, আব্দুল হামীদ সিদ্দীকীর,) খঃ, ৪, পৃঃ, ২২৩৪, হাদীস, ৬৭।

৮) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আখেরী যামানায়, আমার উম্মত অত্যন্ত কঠিন দুঃখ কষ্ট ও যাতনা ভোগ করবে যেরূপ তারা আগে কখনো ভোগ করে নি; তখন মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে না। ঠিক তখন আল্লাহ্ আমার বংশধারা থেকে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন যে অন্যায় পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে ন্যায় দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। পৃথিবীবাসী ও আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসবে। আকাশ থেকে পৃথিবীর সকল স্থান ও জায়গার ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং পৃথিবীও যা কিছু দিতে পারে তার সবকিছু উজাড় করে প্রদান করবে। আর সমগ্র পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে যাবে।" সূত্র, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৫০।

৯) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আরবদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না, যার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ।” সূত্র, তিরমিযী, খঃ, ৯, পৃঃ, ৭৪।

১০) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “মাহদী আমার আহলে বাইত থেকে আবির্ভূত হয়ে একটি বিপ্লব ঘটাবে এবং পৃথিবী অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাকে ন্যায় ও সাম্য দ্বারা পূর্ণ করে দেবে।”

সূত্র, মুসনাদে আহমাদ, খঃ, ১, পৃঃ, ৮৪; জামি’উস সাগীর, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী, পৃঃ, ২; কানযুল উম্মাল, খঃ, ৭, পৃঃ, ১৮৬, ইকরুদ দুরার, খঃ, ১২, আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান, খঃ, ১২, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ, পৃঃ, ২৬৬।

১১) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ্ শেষ বিচার দিবসের আগে, এমন কি এ পৃথিবীর আয়ুষ্কাল একদিনও যদি অবশিষ্ট থাকে, আমার আহলে বাইত ও বংশধরদের মধ্য থেকে মাহদীকে গাইবাত অর্থাৎ অন্তর্ধান থেকে আবির্ভূত করবেন। এ পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার সে প্রসার করবে এবং সব ধরনের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের মূলোৎপাটন করবে।”

সূত্র, মুসনাদে আহমাদ, খঃ, ১, পৃঃ, ৯৯ সুনানে আবু দাউদেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ইংরেজি অনুবাদ,) হাঃ, ৪২৭০।

১২) মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ “মাহদী আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এক রাতের মধ্যেই তাঁকে আবির্ভূত করবেন” (অর্থাৎ তিনি কখন আবির্ভূত হবেন সে ব্যাপারে পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় এবং তাঁর আবির্ভাব হবে আকস্মিক)। সূত্র, ইবনে মাজাহ, খঃ, ২, পৃঃ, ২৬৯; আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৫০।

১৩) হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) বলেছেন, “যখন মহানবী (সাঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কায়েম (আল মাহদী) আবির্ভূত হবে, তখন আল্লাহ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকদেরকে একত্র করবেন।” সূত্র, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৩২।

---

১৪) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল আনসারী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ কে বলতে শুনেছি, “আমার উম্মাহর একদল ব্যক্তি শেষ বিচার দিবসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। তখন ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন এবং তাদের নেতা (মাহদী) তাঁকে (ঈসাকে) নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবেন; কিন্তু ঈসা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলবেন, “না, আপনাদেরকে মহান আল্লাহ্ অন্যদের (সমগ্র মানবজাতির) জন্য ইমাম মনোনীত করেছেন এবং তিনি আপনাদের ওপর তাঁর নে'য়ামত দান করেছেন।”

সূত্র, “মুসলিম, খঃ, ২, পৃঃ, ১৯৩, মুসনাদে আহমাদ, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৫, ৩৮৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহরেকা, পৃঃ, ২৫১।

১৫) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ পর্যন্ত সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করলে তাদের ইমাম (মাহদী) তাঁকে নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে। কিন্তু ঈসা বলবেন, “এ কাজ করার জন্য আপনি অধিক হকদার। আর মহান আল্লাহ্ এ উম্মাতে আপনাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন।” (মুসনাদে আবু ইয়ালা; সহীহ্ হিব্বান) ইবনে আবী শাইবাহ (আহলে সুন্নাতের একজন প্রসিদ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার) ইমাম মাহদী সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন

যাতে বলা হয়েছে যে, ইমাম যিনি নামাযে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মেরও ইমাম হবেন, তিনি স্বয়ং মাহদী (আঃ)।

সুয়ূতী উল্লেখ করেছেনঃ “হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন তখন তিনি ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পিছনে নামায পড়বেন। এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ যে সব ব্যক্তি অস্বীকার করেছে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি সত্য অস্বীকার করে বলতে শুনেছি “এমন ব্যক্তি যিনি নবী নন তাঁর পিছনে নামায পড়ার চেয়ে ঈসা (আঃ)- এর মর্যাদা উচ্চতর।” কিন্তু পরম সত্যবাদী মহানবী (সাঃ) থেকে বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আঃ) এর পিছনে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের নামায পড়ার বিষয়টি খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটা হচ্ছে একটি অতি অদ্ভুত অভিমত।”

‘আল্লামাহ্ সুয়ূতী এতদসংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। (নুযুল ঈসা ইবনে মারইয়াম আখিরায যামান) ইবনে হাজার আসকালানী, “মাহদী এ উম্মতেরই একজন। হযরত ঈসা অবতরণ করে তাঁর পিছনে নামায পড়বেন। সূত্র, “ফাতহুল বারী”, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৬২। আহলে সুন্নাতের আরেকজন বিখ্যাত আলেম ইবনে হাজার হাইসামীও একই কথা উল্লেখ করে বলেছেন।

“আহলে বাইত আকাশের তারকারাজির ন্যায় যাদের মাধ্যমে আমরা সঠিক দিকে পরিচালিত হই এবং তারকারাজি যদি অস্ত যায় (ঢাকা পড়ে যায়) তাহলে

আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কিয়ামত দিবসের নিদর্শনাদির মুখোমুখি হবো। আর হাদীস অনুযায়ী এটা ঠিক তখনই ঘটবে যখন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন হবে, নবী হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর পিছনে নামায পড়বেন, দাজ্জালকে হত্যা করা হবে এবং তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে।” সূত্র, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৩৪।

আবুল হোসাইন আল আজীরী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে হাজার বলেছেন, "ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও উত্থান সম্পর্কিত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে এবং তা মুতাওয়াতির হওয়ার পর্যায়কেও ছাড়িয়ে গেছে। এসব হাদীসে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (মাহদী) তাঁর (রাসূলুল্লাহর) আহলে বাইতভুক্ত হবেন; তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন এবং হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) ও ঐ একই সময় আগমন করবেন। তিনি (মাহদী) ফিলিস্তিনে দাজ্জালকে বধ করার ব্যাপারে ঈসা (আঃ) কে সাহায্য করবেন। তিনি (মাহদী) এ উম্মাহ্র নেতা এবং হযরত ঈসা তাঁর পিছনে নামায পড়বেন।" সূত্র, আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৫৪।

ইবনে 'আলী আশ শাওকানী (ওফাত ১২৫০/১৮৩৪) "আত তাওহীদ ফী তাওয়াতুরি মা জাআ ফীল মুন্তাযার ওয়াদ দাজ্জাল ওয়াল মাসীহ।" (প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও মসীহ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থে ইমাম সম্পর্কে লিখেছেনঃ "মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বহু নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এ কারণেই এসব হাদীস নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য; কারণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে ঐসব হাদীসের ক্ষেত্রেও মুতাওয়াতির হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য ও বলবৎ যেগুলো ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সংখ্যার চেয়ে অল্প সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। মহানবীর সাহাবীদের প্রচুর বাণী আছে যেগুলোতে স্পষ্ট ও বিশদভাবে মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান। এসব বাণী বা উক্তি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ, ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব বাণী প্রতিষ্ঠিত করায় কোন সমস্যা নেই।" লেখক "আল ফাতহুর রাব্বানী" নামক তাঁর অপর এক গ্রন্থেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূত্র, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেখুন "মাওসু'আতুল ইমাম আল মাহদী", খঃ, ১, পৃঃ, ৩৯১, ৩৯২, ৪১৩, ৪১৪, ৪৩৪ এবং "তুহাফুল আহওয়াযী," খঃ, ৬, পৃঃ, ৪৮৫।

আস সাব্বাগ, তাঁর “ইসআফুর রাঘিবীন” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ-

“ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস সমূহ যে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তা বুঝা যায়। তিনি (মাহদী) মহানবীর আহলে বাইতের সদস্য এবং তিনি পৃথিবীকে ন্যায় সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।”

সুয়ূতী তাঁর “সাবাইকুস যাহাব” গ্রন্থে বলেছেন, আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মাহদী শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন। তাঁর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদীস বিপুল সংখ্যক।

হাফেয আবুল হাসান সিজিস্তানী (ওফাত, ৩৬৩ হিজরী, ৯৭৪ খ্রিঃ) বলেছেন, “মহানবী (সাঃ)-এর নিকট থেকে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মাহদী মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতভুক্ত হবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে ন্যায় ও সুবিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।”

“পরবর্তী যেসব খ্যাতনামা আলেম ও বক্তব্য মেনে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনে হাজার আসকালানী।”

সূত্র, তাহযীবুত তাহযীব, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৪৪, ফাতহুল বারী, খঃ, ৭, পৃঃ ৩০৫, কুরতুবী (আত তাযকিরাহ্, পৃঃ, ৬১৭), সুয়ূতী (আল হাবী, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৫- ১৬৬), মুত্তাকী হিন্দী (আল বুরহান ফী আলামাতি মাহদীয়ে আখিরিয যামান, পৃঃ, ১৭৫-১৭৬), ইবনে হাজার হাইসামী (আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃঃ, ২৪৯), যুরকানী (শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুনীয়াহ, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৪৮), সাখাওয়ী (ফাতহুল মুগীস, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪১)।

ইমাম মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আকীদার সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক চিত্রিত হয়েছেন, যিনি নিজেই ইমাম মাহদীর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহের সত্যতা অস্বীকার করেছিলেন। তিনি হলেন প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (ওফাত, ৮০৮ হিজরী/১৪০৬ খ্রিঃ)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুকাদ্দিমা'য় লিখেছেনঃ-

"এটা একটা প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাত বিষয় যে, সকল মুসলিম কর্তৃক সকল যুগে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বশেষ যুগে মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে আবির্ভূত হবেন। তিনি ইসলাম ও ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করবেন। আর মুসলমানগণ তাঁর অনুসরণ করবে এবং তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁকে আল মাহদী বলা হবে। সূত্র, আল মুকাদ্দিমাহ, ইতিহাস সংক্রান্ত ভূমিকা, (ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৯৬৭), পৃঃ, ২৫৭-২৫৮।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত আকিদাহ ইসলামের বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নয়, বরং এ হচ্ছে সকল মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত একটি সর্বজনীন আকিদা।

সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস ও তাফসীরশাস্ত্র বিশারদ শেখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (ওফাতঃ ১৩৭৭ হিজরী/১৯৫৮ খ্রিঃ) লিখেছেন, "মাহদীর আগমনের বিশ্বাস কেবল শিয়াদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়; কারণ, এ আকীদাহ মহানবী (সাঃ)-এর অনেক সাহাবীর বর্ণনা থেকে এমনভাবে এসেছে যে, কেউই এর সত্যতার ব্যাপারে সন্দিহান হতে পারেন না।"

এরপর, তিনি ইমাম মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ইবনে খালদুন কর্তৃক দুর্বল বলে আখ্যায়িত করার কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করেন। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের প্রণীত (ব্যাখ্যা সমেত)।

সূত্র, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, দারুল মা'আরেফ মিশর থেকে প্রকাশিত, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৯৬- ১৯৮, খঃ, ১৪, পৃঃ, ২৮৮।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের মুফতী আস সাইয়্যেদ সাবেক তাঁর গ্রন্থ "আল আকাইদুল ইসলামীয়াহ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত

‘আকিদাহ আসলেই সত্য যা ঐসব ইসলামী আকীদাহ ও মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।”

দু’জন বিখ্যাত শাফিয়ী আলেম আল্লামাহ্ গাঞ্জী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল বায়ান”-এ এবং শাবলাঞ্জী তাঁর গ্রন্থ “নুরুল আবসার”-এ “তিনিই সেই সত্তা যিনি রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন।” (ফাত্হ-২৮)

—কোরআন মজীদের এ আয়াতটির ব্যাপারে সা’ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুতি আল মাহদীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যিনি হবেন হযরত ফাতেমার বংশধর।

ইবনে তাইমীয়াহ (ওফাতঃ ৭২৮ হিজরী/১৩২৮) তাঁর “মিনহাজুস সুন্নাহ্ ” গ্রন্থে (খঃ, ৪, পৃঃ, ২১১-২১২) লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর শিষ্য তাঁর শিক্ষকের এ গ্রন্থের সারসংক্ষেপে এ বিষয়টা স্বীকার করেছেন। সূত্র, মুখতাসার মিনহাজুস সুন্নাহ্, পৃঃ, ৫৩৩-৫৩৪।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক ১১ই অক্টোবর ১৯৭৬ তারিখে প্রদত্ত এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, ২০ জনেরও অধিক সাহাবী ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া, যে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যারা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ওপর বই পুস্তক লিখেছেন তাঁদের একটি তালিকাও এ ফতোয়ার সাথে প্রদান করা হয়েছে। এ ফতোয়ায় বলা হয়েছেঃ হাদীসের হাফেজ এবং হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ প্রত্যয়ন করেছেন যে, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস সমূহের মধ্যে অনেক সহীহ্ এবং হাসান (গ্রহণযোগ্য) হাদীস বিদ্যমান। এর অধিকাংশ হাদীসই বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত (অর্থাৎ মুতাওয়াতির বা অকাট্য)। তাঁরা আরও প্রত্যয়ন করেছেন যে, মাহদীর আগমনে বিশ্বাস স্থাপন ফরয এবং সুন্নী মাযহাবের কেবল অজ্ঞ (জাহিল) ব্যক্তিরা ও বিদ’আতপন্থীরা মাহদী সংক্রান্ত আকিদাহ অস্বীকার করেছে।

সূত্র, এ ফতোয়া পূর্ণ পাঠের জন্য “আল বায়ান” গ্রন্থের লেখক আল গাঞ্জী আশ শাফিয়ীর ‘ভূমিকা’ দেখুন, বৈরুত, ১৪৯৯, হিজরী/১৯৭৯, পৃঃ, ৭৬-৭৯।

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট আলেম শেখ খাজা মুহাম্মাদ দাসা নাকশাবন্দীর বক্তব্যঃ “আবু মুহাম্মাদ হাসান আসকারী (আঃ) আহলে বাইত-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৮ই রবিউল আউয়াল ২৬০ হিজরী শুক্রবার ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে তাঁর পিতার কাছে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর ৬ বছর জীবিত ছিলেন এবং (মৃত্যুকালে) কেবল একটি পুত্রসন্তান রেখে যান যিনি হচ্ছেন আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (আঃ)। তিনিই (আবুল কাসেম মুহাম্মাদ) প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা। “প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ২৫৫ হিজরী সালের ১৫ই শা'বান জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর মায়ের নাম ছিল নারজিস (রাঃ)। যখন তাঁর বয়স ৫ বছর তখন তাঁর পিতা ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) ইনতেকাল করেন।” সাইয়্যেদাহ হাকীমাহ (রাঃ) বিনতে আবী জা'ফর মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ (আঃ) যিনি ছিলেন ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ)-এর ফুফু, তিনি বলেছেন, “২৫৫ হিজরী সালের ১৫ই শা'বান আমি ইমাম হাসান আসকারীর বাড়িতে ছিলাম এবং তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ করেন। ফজরের ওয়াক্ত হলে আমি দেখতে পেলাম যে, নারজিসের প্রসববেদনা শুরু হয়েছে এবং আমি সদ্যপ্রসূত একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শিশুকেও দেখলাম। ইমাম হাসান আসকারী তাঁকে (ঐ শিশুটিকে) দু'হাতে তুলে নিয়ে তাঁর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, “ফুফু! এই সদ্যপ্রসূত শিশুই হচ্ছেন প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা।” সূত্র, ফাসলুল খেতাব, পৃঃ, ৪৪৩, ৪৪৭, তাশখন্দ থেকে মুদ্রিত, গ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে “লামাহ আলামাতুল আউলিয়া”; আহলে সুন্নাতের অন্যতম মনীষী ভারতের মাদ্রাসায়ে দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছেন।”

শেখ ওয়াহাব ইবনে আহমাদ ইবনে 'আলীর বক্তব্যঃ “কিয়ামতের শর্তাবলীর অন্যতম ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, নতুন নতুন রোগের আকস্মিক প্রাদুর্ভাব, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, কুরআন উধাও হয়ে যাওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব ও বিজয়।” এরপর তিনি বলেন, এসব “ঘটনা ঘটবে এবং ঐ সময় ঘটবে, যখন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা করা হবে “যিনি হবেন ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর পুত্র এবং ২৫৫ হিজরী সালের ১৫ই শা'বান জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন” এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে।” সূত্র, আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জওয়াহির ফী আকাইদুল আকবার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ, ১২৭।

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম হোসাইন দিয়ার বাকরীর বক্তব্যঃ “ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আঃ) হচ্ছেন দ্বাদশ ইমাম। আবুল কাসেম তাঁর উপাধি এবং ১২ ইমামীয় আকিদাহ অনুসারে তাঁর উপাধিসমূহের অন্যতম হচ্ছে আল কায়েম (বিপ্লবকারী), আল মাহদী (সুপথপ্রাপ্ত), আল মুনতাযার (প্রতীক্ষিত), সাহেবুল আছর ওয়ায যামান (যুগের অধিপতি/যমানার ইমাম)। তাদের মতানুযায়ী, তিনি দ্বাদশ ও সর্বশেষ ইমাম। তারা আরও বিশ্বাস করে

যে, তিনি সামাররায় তাঁর মায়ের সামনে একটি কুয়ার ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে তিনি আর বের হননি। এ ঘটনাটি ২৬৪ অথবা ২৬৬ হিজরী সালে ঘটেছিল। আর এ ঘটনাটি সত্য। তাঁর মা ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ। তাঁর বেশ কিছু নাম, যেমনঃ সাকীল, সুসান ও নারজিস উল্লেখ করা হয়েছে।”

সূত্র, তারীখুল খামিস, ২য় সংস্করণ, পৃঃ, ২৮৮, বৈরুত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম ইবনে জওযীর বক্তব্য, “মুহাম্মাদ ইবনে হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুসা

বিন জা’ফর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)। ‘আবুল কাসিম’ আপনার উপাধি এবং আপনি খলিফা ও সকল যুগের ইমাম।” সূত্র, তাযকিরাতুল খাওয়ারাস, পৃঃ, ২০৪, মিশর থেকে প্রকাশিত।

শেখ ইবনে হাজার আল হাইসামী ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বলেছেনঃ “কথিত আছে যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল এবং আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (আঃ) ব্যতীত আর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (আঃ)-এর বয়স যখন ৫ বছর তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে (ঐ অল্প বয়সেই) জ্ঞান প্রদান করেন এবং তিনি প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি আত্মগোপন করে আছেন এবং কেউ জানে না তিনি কোথায় আছেন।” সূত্র, আস সাওয়াইকুল মুহরিকাহ, পৃঃ, ২০৮, মুলতান, পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত।

গ্র্যান্ড মুফতিয়ে দিয়ার (দেশের সর্বপ্রথম মুফতি) নামে খ্যাত আল হাযারমা আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন ইবনে ‘উমর আল মাসহুর ‘আলাভীর বক্তব্যঃ-

“শেখ ইরাকীর মতে, ইমাম মাহদী (আঃ) ২৫৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ ‘আলী আল খাওয়ারাসের জীবদ্দশায় অর্থাৎ ৯৫৮ হিজরী সালে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়স ৭০৩ বছর হয়ে থাকবে। আহমাদ রামলীও বলেছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) সত্য (বাস্তবে বিদ্যমান); আর ঠিক একই কথা ইমাম আবদুল ওয়াহাব শারানীও বলেছেন।” সূত্র, বকিয়াতুল মুস্তারশিদীন, পৃঃ, ২৯৪, বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

ইমাম কিরমানী নামে প্রসিদ্ধ আহমাদ ইবনে ইউসুফ ওয়া মুশকীর বক্তব্যঃ “পিতার মৃত্যুর সময় ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারীর বয়স ছিল ৫ বছর। মহান আল্লাহ্ যেমন নবী হযরত ইয়াহইয়াকে ঐ বয়সে জ্ঞান দিয়েছিলেন যখন তিনি ছিলেন অতি অল্পবয়স্ক শিশু, ঠিক তেমনি তিনি তাঁকে ঐ অল্প বয়সেই (অর্থাৎ ৫ বছর বয়সে) ঐশী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়েছিলেন। তিনি

সুন্দর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র বদনমন্ডল ছিল আলোকিত (নুরানী)।" (এসব বৈশিষ্ট্যই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিবরণ প্রদানকালে হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও উল্লিখিত হয়েছে।) সূত্র, তারীখে আখবারুদ দুওয়াল ফী আছারিল আউয়াল, পৃঃ, ১১৮।

বাগদাদ, ইরাক থেকে প্রকাশিত। "আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন আমীর আশ শিবরাভীর বক্তব্যঃ "প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা ইমাম মাহদী ইবনে ইমাম হাসান আল খালিস (আঃ) ২৫৫ হিজরী সালের ১৫ই শা'বান সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন।" আব্বাসী শাসনকর্তার অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদের উপাধিগুলো হচ্ছে মাহদী (হেদায়াতপ্রাপ্ত), কায়েম (বিপ্লবকারী), মুনতাযার (প্রতীক্ষিত), খালাফে সালেহ (পুণ্যবান উত্তরাধিকারী) এবং সাহেবুয যামান (যুগ বা যমানার অধিপতি); এসব উপাধির মধ্যে আল মাহদী সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।" সূত্র, ইলা তাহাফি বেহুবিল আশরাফ, পৃঃ, ১৭৯-১৮০, মিশর থেকে প্রকাশিত।

আহলে সুন্নাতের আরেক মনীষী ইমাম 'আল্লামাহ্ আল হাফেয মুহাম্মাদ বিন মুহতামাদ খান আল বাদাখশানী। "নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই হবে নির্বংশ।" (সূরা কাউসার) এ আয়াতের "আবতার" শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন, আবতার ঐ ব্যক্তি যার কোন ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খা বা ভবিষ্যৎ বংশধারা নেই। অতঃপর তিনি বলেন, "ইমাম হুসাইনের পুত্র আবুল হাসান আলী বিন হোসাইন যাইনুল আবেদীন তাঁর পুত্র আবু জা'ফর মুহাম্মাদ আল বাকের, তাঁর সন্তান আবদিল্লাহ জা'ফর আস সাদেক আবু ইসমাইল মুসা আল কাযেম, তাঁর সন্তান আবু আবুল হাসান আলী আর রেযা, তাঁর সন্তান আবু জা'ফর মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ। তাঁর সন্তান ছিলেন আবুল হাসান আলী আল হাদী এবং তাঁর সন্তান ছিলেন আবু মুহাম্মাদ আয যাকী, আর তাঁর সন্তান হচ্ছেন আল মুনতাযার আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল

মাহদী (আঃ)।” সূত্র, নাযালুল আবরার, পৃঃ, ১৭৪-১৭৫; ইরাক থেকে মুদ্রিত।

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম শেখ মু'মিন বিন হাসান মু'মিন আশ শিবলানজীর বক্তব্যঃ-

“মুহাম্মাদ বিন হাসান হচ্ছেন দ্বাদশ ইমাম। তিনি আবুল কাসেম মুহাম্মাদ বিন হাসান আলী আল হাদী বিন মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ বিন আলী বিন মুসা আল কাযেম বিন জা'ফর আস সাদেক বিন মুহাম্মাদ আল বাকের বিন আলী যাইনুল ‘আবেদীন বিন আল হোসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব। তাঁর মায়ের নাম নারজিস এবং কেউ কেউ তাঁকে সুসান ও সাকীল বলেও উল্লেখ করেছেন। আবুল কাসেম তাঁর কুনিয়া এবং তাঁর উপাধিসমূহ হচ্ছে আল হুজ্জাত (খোদায়ী প্রমাণ) মাহদী, খালাফে সালেহ আল কায়েম, আল মুনতাযার এবং সাহেবুয যামান। “আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ”র বিবরণ অনুসারে, তিনিই ১২ ইমামীয় দ্বাদশ ইমাম। ইবনুল ওয়াদীর ইতিহাস অনুযায়ী তিনি ২৫৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেছেন।” সূত্র, নূরুল আবসার।

আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট মনীষী আল্লামাহ্ কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন তালহা শাফিয়ীর বক্তব্যঃ “আবুল কাসেম মুহাম্মাদ বিন আল হাসান আল খালিস বিন আলী আল মুতাওয়াক্কিল বিন মুহাম্মাদ আল কামিয়াহ বিন আলী আর রেযা বিন মুসা কাযেম বিন জা'ফর আস সাদেক বিন মুহাম্মাদ আল বাকের বিন আলী যাইনুল 'আবেদীন বিন হোসাইন আয যাকী বিন আলী বিন আবী তালিব; তিনিই প্রতীক্ষিত ত্রাণকর্তা। তাঁর মায়ের নাম ছিল সাকীলাহ এবং তিনি হাকীমাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মাদ; তাঁর কুনিয়াত আবুল কাসেম; তাঁর উপাধিসমূহের মধ্যে আল হুজ্জাত, খালাফে সালেহ ও আল মুনতাযার প্রসিদ্ধ।” সূত্র, মাতালিবুস সুউল ফী মানাকিবে আলে রাসূল, পৃঃ, ৮৯; মিশর থেকে প্রকাশিত।

তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল হাসান আল আসকারীর পুত্র। তিনি সামাররা'য়

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (গ্রন্থকার) তাঁর “আদ দুরারুল মুনায়্যাম” গ্রন্থেও একই কথা উল্লেখ করেছেন।

আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম শেখ আসলাহুদ্দীন তাঁর “শারহে দায়িরাহ” গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত মাহদী (আঃ) আহলে বাইতের ইমামদের মধ্যে দ্বাদশ ইমাম। “হযরত আলী (আঃ) ছিলেন প্রথম ইমাম এবং ইমাম মাহদী (আঃ) হচ্ছেন সর্বশেষ ইমাম।”

আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম শেখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল হামুয়ানী আশ শাফিয়ী “ফরায়েদুস সিমতাইন” গ্রন্থে আবাল খায়াজ্ঞি থেকে লিখেছেন যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী আর রেযা বিন মুসা বলেছেন, “আমার পরে আমার পুত্র জাওয়াদ তাকী ইমাম হবে; তার পরে তার পুত্র আলী আল হাদী আন নাকী ইমাম হবে। তার পরবর্তী ইমাম হবে তার পুত্র আল হাসান আল আসকারী; আর তার পরে ইমাম হবে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ আল মাহদী। তার অবর্তমানে অর্থাৎ অন্তর্ধানকালে জনগণ তার পুনরাবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। তার পুনরাবির্ভাবের পর যারা তার আনুগত্য করবে তারাই হবে মু’মিন।”

সূত্র, আহলে সুন্নাতের অন্ততঃ ৩৫ জন বিখ্যাত আলেম ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে ৪৬ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ কিতাবুল মাহদী আবু দাউদ; 'আলামাতুল মাহদীঃ জালালুদ্দীন সুয়ূতী; আল কাওলুল মুখতাসার ফী 'আলামাতিল মাহদী আল মুনতাযারঃ ইবনে হাজার; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামানঃ আল্লামাহ্ আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইউসুফ আদ দামেশকী; মাহদী আলে রাসূলঃ আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আল হিরাভী আল হানাফী; মানাকেবুল মাহদীঃ আল হাফেয আবু নু'আইম আল ইসফাহানী; আল বুরহান ফী 'আলামাতিল মাহদী আখিরায যামানঃ মুত্তাকী আল হিন্দী; আরবা'উনা হাদীসান ফীল মাহদীঃ আবদুল আ'লা আল হামাদানী; আখবারুল মাহদীঃ আল হাফেজ আবু নুআইস; আস সাওয়ায়িকু আল মুহরিকা (ইবনে হাজার হাইসামী) মাকুয়ামাত জামি (আবদুল ওয়াসি বাখিরযি) আল মাকুয়াদ আল

আকুসা (কামালুদ্দিন খওয়ারযি) আরজাহুল মাতালেব (উবাইদুল্লাহ অমৃতসারী, সুন্নি)) ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত (শায়খ সুলাইমান কান্দুজি হানাফী, সুন্নি)।

অধ্যায়-৭

দ্বীন ও নে'য়ামতের পূর্ণতা যে স্থানে সংঘটিত হয় তার নাম "গাদীরে খুম"।

দশম হিজরীতে মদীনায় ঘোষণা করা হল যে, নবী (সাঃ) এ বছর হজ্ব পালন করতে পারেন। আর এটাও উল্লেখ করা হল যে এটাই হচ্ছে তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব বা বিদায় হজ্ব। এ খবর মদিনাবাসীর কানে পৌঁছা মাত্রই সকলেই মহা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠল। কারণ, সকল সাহাবাদেরই ইচ্ছা ছিল যে, নবী (সাঃ) এর সাথে হজ্ব করতে যাবে এবং নিকট থেকে হজ্বের আমল ইবাদতসমূহকে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিবে। মদীনার আশে পাশের অন্যান্য মুসলমান এলাকা থেকেও অনেক সাহাবা, রাসূল (সাঃ) এর সাথে হজ্বে যাওয়ার জন্য একত্রিত হল। সূত্র, তাবাকাতুল কুরবা ইবনে সা'দ, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৩৬। কিতাবুল সাকাত, খঃ, ২, পৃঃ, ১২৪।

"ইসলামী ইতিহাস বেত্তাগণ উল্লেখ করেছেন, ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজারের মত, পুরুষ ও মহিলা সাহাবী ওই বছর রাসূল (সাঃ) এর সাথে হজ্বে যোগ দিয়েছিলেন।" সূত্র, তাযকিরাতুল খাওয়ারাস, পৃঃ, ৩০। তারীখুল খামিস, খঃ, ২, পৃঃ, ১৪৯। সিরাহ্ হালবিয়াহ, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৫৭।

নবী (সাঃ) ওই বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে যিলকদ মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন আগে মদীনা থেকে রওনা হন এবং তাঁর মক্কায় পৌঁছাতে দশদিন সময় লাগে। এই হজ্বটি "হজ্জাতুল বিদা অর্থাৎ বিদায় হজ্ব" নামে ইসলামে পরিচিত। গাদীর একটি আরবী শব্দ। একটি নিচু স্থান, যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হয়ে থাকে, আরবীতে তাকে গাদীর বলে।

আর ওই এলাকার নাম হচ্ছে খুম। এই দুইয়ের সমন্বয়ে পরবর্তী নামকরণ হয়েছে "গাদীরে খুম।"

এই স্থানটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। বর্তমানে, এ স্থানটি ওয়াদিউল গুরবাহ নামে প্রসিদ্ধ। নবী (সাঃ) ওই বিশাল কাফেলা নিয়ে হজ্ব শেষে মদীনা অভিমুখে ফিরছিলেন। কাফেলাটি ১৮ই যিলহজ্ব "গাদীরে খুম" নামক স্থানে পৌঁছায়। তাঁর সেখানে পৌঁছানো মাত্রই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর উপর ওহী নাজিল করলেন, যা ছিল এরূপ।

"ইয়া রাসূল (সাঃ) পৌঁছে দিন আপনার রবের কাছ থেকে যা আপনার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি রিসালতের কোন কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের অনিষ্টর হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন।" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কখনো কোন অবাধ্যকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়দা- ৬৭)

উপরোক্ত আয়াত গাদীরে খুমে, "হযরত আলীর বেলায়েত (অভিভাবকত্ব) ঘোষণা করে হযরত আলীর শানে নাযিল হয়েছে।" যারা উল্লেখ করেছেন তাদের কিছু গ্রন্থের নাম।

সূত্র, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৭, তাফসীরে কাবির, খঃ, ১২, পৃঃ, ৫০, তাফসীরে মানারীজ, খঃ , ২ , পৃঃ , ৮৬, তাফসীরে আলুসি, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৮৪, আসবাবুন নুযুল, পৃঃ, ১৩৫, শাওয়াহেদুল তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৯২, তারিখে দামেস্ক, খঃ, ২, পৃঃ, ৮৬, ফাতহুল কাদীর, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০, মাতালবাস সাউল, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৪, ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ, ২৫। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১২০। আল মেনাল ওয়াল নেহাল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬৩, উমদাতুল কারী ফি শারহে বুখারী খঃ, ৮, পৃঃ, ৫৮৪, ফারায়েদুস সামতিন, খঃ, ১, পৃঃ, ১৮৫, ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদুল কোরআন, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬৩, তাযকিরাতুল হুফফাজ, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৯০, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১১৯ (উর্দু)।

নবী (সাঃ) এর ২৩ বছরের নবুওয়াতি জীবনে আল্লাহ্র সকল ওহীই তিনি মানুষের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এই বছরগুলোতে তিনি যত কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহ্র অন্য কোন নবী তা সহ্য করেননি। কিন্তু, তারপরও এ এমন কোন্ বিষয় যা, রিসালতের সাথে তুলনা করা হয়েছে বা বলা হচ্ছে নবী (সাঃ) যদি তা বর্ণনা না করেন, তবে তিনি রিসালতের কোন কাজই আঞ্জাম দিলেন না? অন্য আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই আয়াত বর্ণনা করলে নবী (সাঃ)-এর জীবননাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা বর্ণনা করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কেননা, যার কারণে আল্লাহ্ তায়ালা ওয়াদা দিচ্ছেন যে, নবীকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। কারা সেই ব্যক্তি, যারা সেদিন নবী (সাঃ) এর জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল? নবী (সাঃ) সকলকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং যারা দূরে চলে গিয়েছিল তাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করলেন। সূত্র, ফারাইদুস সিমতাইন, খঃ, ১, পৃঃ, ৭০, হাঃ, ৩৭।

হাজীগণ দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রচন্ড গরম ছিল। এতই গরম ছিল যে, হাজীরা তাদের পোশাকের এক অংশ মাথায় এবং অন্য অংশকে পায়ে পেঁচিয়েছিল। সূত্র, মানাকীব ইবনে মাগাযিলি, পৃঃ, ১৬।

কারণ, উত্তপ্ত বালুর উপর দাঁড়িয়ে থাকা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, তথাপিও নবী (সাঃ) কেন সবাইকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন সেটাই ছিল মুখ্য বিষয়। নবী (সাঃ) সাহাবীদের একটা মিম্বর তৈরি করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বললেন, হুজুর কিভাবে মিম্বর তৈরি করবো? তখন নবীজি (সাঃ) সবাইকে উটের পিঠ থেকে নেমে আসতে এবং উটের পিঠের বসার জন্য চামড়া দিয়ে জিন তা একত্রিত করতে বললেন। এরপর, তা একের উপর এক সাজিয়ে মিম্বর তৈরী হল, ততক্ষণে দূরে চলে যাওয়া হাজীরা এসে ওইস্থানে উপস্থিত হলেন। এবং তিনি নামাযের জন্য সাহাবাদের আহবান করলেন। সেই সময় নবী (সাঃ)-এর সাথে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর, তিনি নামাজ পড়ালেন ও নামাজ

সমাপ্ত করার পর তিনি সেই মিম্বরে উঠলেন খুৎবা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্র প্রশংসা ও ওয়াজ নসীহতের পর বললেন;

“হে মানবসকল! অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত করবেন এবং আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবো। আর আমার কাছে এবং তোমাদের কাছেও প্রশ্ন করা হবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? সাহাবারা বললেন, সাক্ষ্য দিব যে, আপনি এলাহী বার্তাকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন কষ্ট করেছেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আর বেহেশত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে, জীবের মৃত্যু হবে, কিয়ামত আসবে এবং সেদিন আল্লাহ্ সকল মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন? সাহাবারা বললেন হ্যাঁ এগুলোর সব কিছুকেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবী (সাঃ) সাহাবাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের স্বীকারোক্তি নেবার পর নিজের কর্তৃত্বের উপর তাদের স্বীকারোক্তি চাইলেন ওইভাবে। নবী (সাঃ) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো? সবাই উত্তর দিলেন, জ্বী ইয়া রাসূল আল্লাহ্। তখন তিনি বললেন, হে আমার সাহাবারা, আমি শীঘ্রই চলে যাবো এবং তোমরা হাউযে কাউসারে আমার কাছে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদেরকে দু'টি ভারী বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করবো। চিন্তা করো, আমার পর এ দু'টি ভারী বস্তুর সাথে তোমাদের কী আচরণ হবে?

কেউ একজন বললেন, ঐ দু'টি ভারী বস্তু কী? নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, “আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন ও আমার ইতরাত আহলে বাইত।” আমাকে উত্তম সাহায্যকারী ও মহান আল্লাহ্ জানিয়েছেন, এতদ্বয় ঐ পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ না তাঁরা আমার কাছে হাউযে কাউসারে উপস্থিত হয়। আমার রব এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অতএব এই দুইকে “কোরআন ও আহলে বাইতকে অতিক্রম করো না ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই দুইকে শিখাতে যেও না কারণ, তাঁরা তোমাদের চেয়ে বেশি জানে।” এরপর বললেন, তোমরা কি জানো না আমি

মু'মিনদের সত্তার উপর তাদের নিজেদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখি? (তিনবার বললেন) সকল সাহাবারা বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূল আল্লাহ্ (সাঃ) "আপনি আমাদের সব কিছুর উপর অধিকার রাখেন।" (নাফস-এর উপর) সে সময় নবী (সাঃ) হযরত আলীর বাহু উঁচু করলেন এবং এত উঁচু করলেন যে উপস্থিত সকলে তাঁদের দুজনের সাদা বাহুমূল দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, "হে সাহাবীরা আল্লাহ্ আমার মাওলা (অভিভাবক) এবং আমি তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। আমি যাদের মাওলা (অভিভাবক) এই আলীও তাদের তাদের মাওলা (অভিভাবক)।" ইয়া আল্লাহ্, আপনি তাকে বন্ধু হিসাবে নিন, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাকে আপনি শত্রু হিসাবে নিন, যে আলীর সাথে শত্রুতা করে এবং তাকে সাহায্য করুন, যে আলীকে সাহায্য করে এবং তাকে পরিত্যাগ করুন যে আলীকে পরিত্যাগ করে এবং তাকে ভালবাসুন, যে আলীকে ভালবাসে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখুন, যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ রাখে। ইয়া আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর তিনি বললেন, "হে মানব সকল! যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তারা এই বক্তব্যটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিও।"

নবী (সাঃ) ও হযরত আলী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই এই আয়াত ওহী মারফত নাযিল হল।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা- মায়দা-৩)

উক্ত আয়াত গাদীরে খুমে অবতীর্ণ হয়েছে বলে যারা উল্লেখ করেছেন, তাদের গ্রন্থের নাম)।

সূত্র, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৯, তাফসীরে আলুসি, খঃ, ৬, পৃঃ, ৫৫ তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ২, পৃঃ, ১৪, তারিখে দামেস্ক খঃ, ২, পৃঃ, ৭৫, ইবনুল মাগাযিলি আশ শাফিয়ী, পৃঃ, ১৯, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ৮, পৃঃ, ৯২, আল ইতকান, খঃ, ১, পৃঃ, ১৩, তাযকেরাতুল খাওয়ারাস, পৃঃ, ৩০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ,

৩, পৃঃ, ২১৩, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১১৫, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৭, মানাকিবে খাওয়ারেযমী আল হানাফী, পৃঃ, ৮০, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১২১ (উর্দু)।

"অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন আল্লাহুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছি দ্বীনের পূর্ণতার উপর ও নে'য়ামতের সম্পূর্ণতার উপর এবং আমার রিসালত ও আলীর বেলায়েতের বিষয়ে আমার রবের সন্তুষ্টির উপর।"

সূত্র, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৬, রুহুল মায়ানী আলুসী, খঃ, ২, পৃঃ, ২৪৯, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ২, পৃঃ, ২৫৯।

নবী (সাঃ) এর এ ঘোষণা দানের পর, সমবেত সাহাবীরা একে একে এসে আমিরুল মু'মিনীন আলীকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাতে থাকেন যেমন "হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর, হযরত আলীকে এ বলে স্বাগতম জানালেন যে, ইয়া আলী ইবনে আবু তালেব, আজ থেকে আপনি সকল মোমেন ও মোমেনার মাওলা (অভিভাবক) হয়ে গেলেন।"

সূত্র, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৪, তাফসীরে আল কাবীর, খঃ, ১২, পৃঃ, ৪৯, তারিখ আল খাতিব, খঃ, ৮, পৃঃ, ২৯০, কানজুল উম্মাল, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩৯৭, আর রিয়াযুন নাযরা, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৯, মিসকাত আল মাসাবিহ, পৃঃ, ৫৫৭, হাবিব আল সাইয়ার (মীর খান্দ), খঃ, ১, পৃঃ, ১৪৪, মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০৯ "সিররুল আলামীন, পৃঃ, ৯ (ইমাম গাজ্জালী)।

গাদীরের হাদীসটি যে নবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহু তায়ালার নির্দেশে হযরত আলীকে বেলায়েত এ স্থলাভিষিক্ত ঘোষণার জন্য বর্ণনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহু তায়ালা তাঁর নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে সাহাবাদের সামনে এর মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন

করেছেন, অভিধানে “মাওলা” শব্দটির অর্থ অনেক ভাবে দেয়া হয়েছে, কিন্তু গাদীরে খুমে নবী-এর পবিত্র মুখে যে “মাওলা” শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। তার বাস্তবতা ও সঠিক অর্থ নবী (সাঃ) এর উক্তি “আমি কি মু’মিনদের উপর তাদের নিজেদের থেকে “আওলা” নই?” যখন সাহাবারা এই প্রশ্নের পর, হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন, তখন তিনি বললেন “মান কুনতু মাওলা, ফা হাযা আলীউন মাওলা,” অর্থাৎ “আমি যাদের অভিভাবক, এই আলীও তাদের অভিভাবক।” আর এটাই হচ্ছে উত্তম দলিল যে, “মাওলা” শব্দটি “আওলা” শব্দের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। যদি তাই না হয়ে থাকে তবে নবী (সাঃ) এর প্রথমেই সাহাবাদের কাছ থেকে ওয়াদা নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতো না, বা এটাও অনর্থক হয়ে যাবে যে, তিনি তাদের থেকে তাদের উপর বেশি অধিকার রাখেন। তাই নয় কি? যার মাধ্যমে হযরত আলী যে নবী (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত তা প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

গাদীরে খুমের দিনটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ একটি দিন। যেদিন রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবীদের মহাসমাবেশে হযরত আলীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন এবং এ ঘটনার পরই আল্লাহু তায়ালা পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা দান করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু ছদ্মবেশী, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা এক (সুদূর প্রসারী) ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর হৃদয়বিদারক ওফাতের পর পরই তাঁরই মনোনীত স্থলাভিষিক্তকে উপেক্ষা করে নিজেরা খেলাফতের মসনদ দখল করে নেয়। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশে নেমে আসে এক ঘন কালো মেঘের ছাঁয়া। সে কালো ছায়া আজও মুসলমানদের জন্য কাল হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, আজ যদি আমরা মুসলিম উম্মাহর চরম দৈন্যদশা ও অধঃপতনের নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রকৃত উত্তরসূরী ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতকে উপেক্ষাই এ দুরবস্থার মূল কারণ। কেননা, রাসূল (সাঃ) বারংবার সাহাবাদেরকে “পবিত্র কোরআন ও তাঁর আহলে বাইত-এর অনুসরণ করার নির্দেশ

দিয়েছিলেন।” আল্লাহুর জমিনে মুসলমানরাই সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হবে, স্বাভাবিকভাবে এমনটিই সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু “নবী (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করার পরও কি আমরা সঠিক পথে থাকতে পারবো?” কারণ, নবী (সাঃ) বলেছেন যে, “যদি কোরআন ও আহলে বাইত-এর একটিকেও ছাড়, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” আর আমরা যারা দু’টিই ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারপরও নিজেকে আমরা সঠিক পথের পথচারী বলে দাবি করছি। মুসলিম উম্মাহ্ আজ আপনার আপলোড করা সর্বশেষ ছবিটির (image_625c91.png) সম্পূর্ণ অনুলিখন (Transcription) নিচে দেওয়া হলো:

নেতৃত্বশূন্য ও শতধাবিভক্ত। কিন্তু কেন? তাই আসুন! আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উন্মুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে ইসলামের সঠিক ইতিহাস চর্চা করি। আমাদের প্রত্যেকের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে, গাদীরে খুম দিবসের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং এই দিবসে রাসূল (সাঃ)-এর ঘোষিত সঠিক **“মাওলার অভিষেক”** বাণীকে মুসলিম উম্মাহুর নিকট সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি মাত্র। যারা এই গাদীরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কেউ বিস্তারিতভাবে, আবার কেউ সংক্ষিপ্তভাবে।

সূত্র, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ, ৭, পৃঃ, ৬১২-৬১৬, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৪৩-৩৫২, (ই,ফাঃ)। ইসলামী বিশ্বকোষ, খঃ, ১০, পৃঃ, ৩০৭, (ই,ফাঃ) বোখারী, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৮০, (হামিদীয়া) সীরাতুন নবী, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০৫ (তাজ কোং) শাহাদাতে আহলে বাইত, পৃঃ, ৮৫-৮৬ (মানকা আবুল উলাইয়া) পঞ্চ প্রধান, পৃঃ, ১৩৮ (মল্লিক আব্দুর রউফ যশোর) দৈনিক যুগান্তর, ৪ মার্চ ২০০২ ইং, দৈনিক যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারী ২০০৬ ইং, দৈনিক যুগান্তর, ২৮ জানুয়ারী ২০০৫, মেশকাত, খঃ, ১১, হাঃ, ৫৮৪৪, আশারা মোবাশশারা, পৃঃ, ১৬৩

(এমদাদীয়া) তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ৩, পৃঃ, ৭৩৩, ৭৫৩ (ই,ফাঃ) মাসিক মদীনা, পৃঃ, ১৫ (জুন, ২০০৫) হযরত আলী (এমদাদীয়া), পৃঃ, ৫৬, মদীনার আলো, পৃঃ, ৬০ (ডাঃ সুফি সাগর সামস) আল মুরাজায়াত, পৃঃ, ২২২, ঐতিহাসিক আল গাদীর, পৃঃ, ৫-১২৮ (মীর রেজা হোসাইন শহীদ) মাসিক সায়েল, পৃঃ, ৯-১০ (১৪২৩ হিজরী সংখ্যা, আবুল উলায়া) তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯৮ (মিশর) তারিখে ইবনে কাসির, খঃ, ৫, পৃঃ, ২০৯, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৭, তাফসীরে কাবির, খঃ, ১২, পৃঃ, ৫০, শাওয়াহেদুল তানযিল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৯২, ১৮৭, তাজকিরাতুল হুফফাজ, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৯০ (ভারত) আসবাবুল নুযুল, পৃঃ, ১৩৫, তারিখে দামেস্ক, পৃঃ, ৪৫২ (ইবনে আসাকির) মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১০৪, ১০৭, ১৬৩, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ১১৮, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৮১, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৪৭, এলানে গাদীর (ডাঃ তাহেরুল কাদরী) পৃঃ, ৪৮-৫০। ইযাহাতুল খিফা, খঃ, ২, পৃঃ, ৫০৩-৫০৪ (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) সুনানে ইবনে মাজা, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৩, খঃ, ১১৬, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০৯। তারিখে ইয়াকুবি, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৩ তারিখে ইবনে কাসির, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৮১, ৩৬৮, ৩৭০, তাবাকাতুল কুবরা, খঃ, ২, পৃঃ, ৫৭, সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ, ৩, পৃঃ, ৩৯০, তারিখে তাবারী, খঃ, ২, পৃঃ, ৪২৯, আস সাওয়ায়েক আল মুহরেকা, পৃঃ, ২৫, তারিখে দামেস্ক, খঃ, ২, পৃঃ, ৪৫, ফুসুল আল মুহিম্মা, পৃঃ, ২৪, আনসাব আল আশরাফ, খঃ, ২, পৃঃ, ৩১৫, কানজুল উম্মাল, খঃ, ৪, পৃঃ, ৫৩, হা, ১০৯২, ফাতহুল কাদীর, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০, মাতালবাস সাউল, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৪, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১২০, আল মেনাল ওয়াল নেহাল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬৩, উমদাতুল কারী ফি শারাহ বুখারী, খঃ, ৮, পৃঃ, ৫৮৪, রুহুল মায়ানী আলুসী, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৮৪, ফাতহুল বায়ান, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬৩ (আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভুপালি আহলে হাদীস) তারিখে বাগদাদ, খঃ, ৮, পৃঃ, ৯২, আল এতকান, খঃ, ১, পৃঃ, ১৩, আল গাদীর, খঃ, ১, পৃঃ, ২১৪-২৩০ (আল্লামা আমিনী) (আরবী) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১০৭-১৬৪, (ওবাইদুল্লাহ অমৃতসারী)।

গাদীরে খুমের এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি কমপক্ষে ১১০ জন সাহাবা, ৮৪ জন তাবেয়ীন, ৩৫৫ জন উলামা, ২৫ জন ঐতিহাসিক, ২৭ জন হাদীস সংগ্রহকারী, ১১ জন ফিকাহ্ বিদ, ১৮ জন ধর্মতাত্ত্বিক, ৫ জন ভাষাতাত্ত্বিক, বর্ণনা করেছেন এবং সবাই উক্ত ঘটনাকে সহীহ্ ও মোতাওয়াতের বলেছেন।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

যদি পবিত্র কোরআন ও তার তাফসীর এবং সকলের কাছে বিশ্বস্ত রাবীর হাদীস এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, নবী (সাঃ) আল্লাহ্র হুকুমে নিজের জীবনকালে হযরত আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর উত্তরসূরী ও জনগণের অভিভাবক নেতা, ও তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গেছেন, তা অমান্য করার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এই সত্য ঘটনা ও আল্লাহ্র কাছ থেকে উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ নে'য়ামত এর সুসংবাদটি যদি মুসলমানদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া হতো, তবে আজ নবী (সাঃ)-এর উম্মতরা এতভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজও কিছু আলেম উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছেন, তাদের হাশর কি হবে, তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। একটি কথা না বললেই নয়, আমাদের সবার আল্লাহ্ এক, আমাদের সবার কিবলা এক, আমাদের সবার দ্বীন এক, আমাদের সবার নবী এক, কিন্তু আমাদের সবার ইমাম (নেতা) এক নয়। যদি সবার ইমাম এক হয়ে যায় তবে আমরা সবাই এক হয়ে যাবো, একটু চিন্তা করুন?

"এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করে সেই আযাব সম্বন্ধে, যা আপতিত হবে" (মায়ারোজ-১)

হারিস বিন নোমান ফেহরীর ঘটনা, যে হযরত আলী (আঃ) এর "বেলায়েতকে" অস্বীকার করেছিল।

গাদীরে খুমের ঘটনা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা পাঠকের বুঝার জন্য একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরুপ উল্লেখ করছি। এ ঘটনাটি এমন এক ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কিত যে হযরত আলীর (আঃ) "বেলায়েতকে" অস্বীকার করেছিল। এ কাজটি সে তখন করেছিল যখন হযরত আলী রাসূল (সাঃ) এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন লোকেরা এ কথাও জানতে পেরেছিল যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যারা এখন এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে, অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ সংবাদ হযরত আলী (আঃ) রাসূলের (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত পৌঁছে দেয়া।" ঘটনাটি এরুপঃ-

হারিস বিন নোমান ফেহরী (নবীজির অনুচর) যখন এ সুসংবাদটি জানতে পারলো, তখন বিষয়টি তার কাছে ভাল লাগেনি। সে নিজের উটের পিঠ হতে নেমে সোজা রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, ইয়া মোহাম্মদ (সাঃ)! "আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেন সাক্ষ্য দেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আমরা আপনার এ কথা মেনে নিয়েছি। আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, মাহে রমজান মাসে রোযা রাখি, পবিত্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করি (হজ্ব পালন) ও যাকাত আদায় করি ইত্যাদি। আমরা আপনার সব কথা মেনে নিয়েছি। অতঃপর এই সব মেনে নেওয়ার পরও, আপনি সন্তুষ্ট হলেন না, এমনকি (ইহজগত ত্যাগ করার পূর্বে নিজের প্রতিনিধি) নিজের ভাইকে আমাদের উপর তাঁর অভিভাবক করে দিলেন, (যেমন আপনার হুকুম মানা বাধ্যতামূলক ঠিক তাঁর হুকুমও) এবং বললেন যে, "আমি যাদের যাদের মাওলা এই আলীও তাদের তাদের মাওলা।" এই আদেশ কি আপনার নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, নাকি আল্লাহ্র তরফ থেকে? এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর চক্ষুগুলো রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো তিনি বললেন, "এক আল্লাহ্র কসম!" একথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলেছি। আমার নিজের তরফ থেকে নয়।"

"আর তিনি **(**রাসূল**)** কোন মনগড়া কথা বলেন না। বরং তা ওহী যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়।**" (**নাজম**-**৩,৪**)**

হারেসা দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (সাঃ) যা বললেন, যদি তা সত্য হয়, তাহলে আকাশ থেকে আমার উপর আযাব স্বরূপ পাথর বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন যে, সে তখনো নিজের উটের নিকটে পৌঁছাতে পারেনি। অমনি একটি পাথর আকাশ থেকে তার মাথায় পতিত হল এবং তার নিম্নদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তারপর এই আয়াতটি নাজিল হলোঃ- এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করে সেই আযাব সম্বন্ধে, যা আপতিত হবে। (মায়ারোজ-১)

সূত্র, তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ১০, পৃঃ, ৬৭৫৭, তাফসীরে সালবী, খঃ, ২৯, পৃঃ, ৫২, সীরাতে হালবিয়া, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৭৫, আল মিনার, খঃ, ৮, পৃঃ, ২৬৮, জামেউল আহকামুল কোরআন, খঃ, ১৮, পৃঃ, ২৭৮, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ, ২, পৃঃ, ২৮৬, তাযকেরা সিবতে ইবনে জওজি, পৃঃ, ১৯, ফাযায়েলুন খামছা, খঃ ,১, পৃঃ, ৩৯, নূরুল আবসার, পৃঃ, ১৭৮, ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ, ২৬, কেফায়াতুল মোওয়াহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ ৩০০, আল গাদীর, খঃ, ১, পৃঃ, ২০৯, তাফসীরে মানারীজ, খঃ, ৬, পৃঃ, ৪৬৪, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১১৮ (উর্দু) নুহজাতুল মাজালিস, খঃ, ২, পৃঃ, ২৪২, বয়ানুস সায়াদাহ, খঃ, ৪, পৃঃ, ২০২। তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খঃ, ১০, পৃঃ, ৪৮ (আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী, আহলে হাদীস)।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আমি যে আলোচনাটি উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি, তাতে যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছি, আমার বিশ্বাস তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি চক্ষুষ্মান প্রশস্ত আত্মার অধিকারী ও সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এখন আর কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় এবং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নবী (সাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ) কে।

অধ্যায়-৮

আল্লাহ্ মানুষের হেদায়ত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

আল্লাহু তায়ালা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি ঐশী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রাসূলগণের ধারা। আল্লাহু তায়ালা শুধু ঐশী গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহু তায়ালা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাহলো, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু ঐশী গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয় বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়াত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন থাকে যাকে ঐশী গ্রন্থ বা পবিত্র কোরআন বলা হয়। অপরদিকে, একজন শিক্ষা গুরুরও প্রয়োজন হয়, যিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলতে সক্ষম। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না, তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে। ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতি পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।" (তওবা-১১৯)

"সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হল, সিরাতে মুস্তাকীমের পথ বা হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রাসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ, বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্ ভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে মুস্তাকিম এর সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছেঃ সিরাতে মুস্তাকিম হল তাদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহুর

নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে।” তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও পরবর্তীকালের জন্য কিছু সংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিজীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে নবী (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণের সময় বলেছেন। “হে মানবজাতি আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে (অনুসরণ করলে) তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, একটি আল্লাহ্র কিতাব (পবিত্র কোরআন) এবং অপরটি আমার ইতরাত আহলে বাইত।”

সূত্র, তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৯৩ (ই,ফাঃ) তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৭১-৭২ (মুফতি মোঃ সফি) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৩ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) কোরআনুল করীম, পৃঃ, ৬৫ (মাওঃ মহিউদ্দিন খান)।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন যে, নবী (সাঃ) আহলে বাইত এর কথা এজন্য তাগিদ করেছেন যে, “হে'দায়েত এবং বেলায়েতের ব্যাপারে আহলে বাইতই পথপ্রদর্শক। তাঁদের উসিলা ব্যতীত কেহ আল্লাহ্র অলীর মর্তবায় পৌঁছাতে পারবে না। আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন, হযরত আলী” (আঃ) অতঃপর তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান আসকারী পর্যন্ত, এই সিলসিলা অব্যাহত থাকে।

সূত্র, তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৯৩ (ই,ফাঃ) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৩ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম)।

ইবনে হাজার আল হায়তামী এ বিষয়ে বলেন যে, রাসূল (সাঃ) কোরআন ও তাঁর আহলে বাইতকে “সাকালায়েন” বলেছেন, কারণ, সাকাল অর্থ হলো পবিত্র সৎ ও সংরক্ষিত বস্তু এবং এ দুটো কোরআন ও আহলে বাইত প্রকৃতপক্ষে তাই। আহলে বাইত প্রকৃতপক্ষে ঐশী জ্ঞানের ভাণ্ডার, গুপ্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং দ্বীনের নির্দেশিত বিধান। সেজন্য রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে আহলে বাইতকে অনুসরণ করতে, তাঁদের আঁচল ধরে রাখতে এবং তাঁদের

কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আহলে বাইত এর প্রধান সদস্য হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব। তিনি রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে সরাসরি (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান লাভ করায় অতি উচ্চস্তরের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন (বেলায়েতের অধিকারী)। তাঁর জ্ঞানের সনদ রাসূল (সাঃ) নিজেই দিয়ে বলেছেন, "আমি জ্ঞানের মহানগরী এবং আলী সেই মহানগরীর দরজা, যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে, সে যেন সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে।" সূত্র, আস সাওয়াইক আল মুহরিকা, পৃঃ, ৯০, (ইবনে হাজার হাইতামী) (মিশর) নাহজুল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ, ১১১।

নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "নিশ্চয় ফাতেমা বেহেশতের সকল নারীর নেত্রী এবং হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুবকদের সরদার (নেতা) কিন্তু তাঁদের পিতা (আলী) তাঁদের ও সরদার (নেতা)।"

সূত্র, আল জামে আস সহীহ আত তিরমিজি, খঃ, ৫, পৃঃ, ৬৬৬ (মিশর) আল মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬২, ৬৪ (মিশর) সুনানে ইবনে মাজা, খঃ, ১, পৃঃ, ৫৬ (মিশর) আল মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৬৭ (হায়দারাবাদ) কানজুল উম্মাল, খঃ, ১৩, পৃঃ, ১২৭, মাজমা আয জাওয়াহিদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৮৩, (মিশর) তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১, পৃঃ, ১৪০, খঃ, ৬, পৃঃ, ৩৭২, খঃ, ১০, পৃঃ, ২৩০ (মিশর) তারিখ আসসাম (ইবনে আসাকীর) খঃ, ৭, পৃঃ, ৩৬৫ (মিশর) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ১০৯।

মহানবী **(**সাঃ**)** বলেছেন**, "**আমি মেরাজে গেলে বেহেশতের দরজায় কিছু নাম লেখা দেখলাম।**"**

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি মেরাজে গেলে বেহেশতের দরজায় কিছু নাম লেখা দেখলাম। আর সেই নাম গুলো হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্র হাবীব, আলী আল্লাহ্র ওয়ালী, ফাতেমা আল্লাহ্র খেদমতগার, হাসান ও হোসাইন

আল্লাহ্র মনোনীত। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে।”

সূত্র, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৫৩২, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১, পৃঃ, ২৫৯, ফাজায়েলে খামছা, খঃ, ৩, পৃঃ, ২২৭, মাকতালুল হুসাইন, পৃঃ, ১০৮।

হযরত আবুজর আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি পবিত্র কা’বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি **“সাবধান!** আমার আহলে বাইত হল তোমাদের জন্য নূহ **(**আঃ**)** এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহণ **(**অনুসরণ**)** করবে সে নাজাত পাবে। আর যে এটা হতে পশ্চাতে থাকবে সে ধ্বংস হবে **(**জাহান্নামী**)**।**”**

সূত্র, মিশকাত শরীফ, খঃ, ১১, হাঃ, ৫৯২৩ কাশফুল মাহজুব, পৃঃ, ৭০ (দাতাগঞ্জ বক্স) মাসিক মদীনা (সেপ্টেম্বর ২০০০) পৃঃ ৬, পীরের মর্যাদা ও ভূমিকা, পৃঃ, ১১৪ (মুহাঃ মুখলেসুর রহমান এডভোকেট) আলধারা, পৃঃ, ১০৬ (মুখলেসুর রহমান) আস সাওয়ায়েকে মোহরেকা (ইবনে হাজার হায়সামী), পৃঃ, ২৩৪, তাফসীরে কাবির, খঃ, ২৭, পৃঃ, ১৬৭, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ২, পৃঃ, ৭৮৬, কানজুল উম্মাল, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৫৬, মানাকেবে ইবনে মাগাযিলি, পৃঃ, ১৩২, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৫১, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৪৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ২৩৩, আরবাঈন নাবহানী, পৃঃ, ২১৬, তারিখে খোলফা, পৃঃ, ৩০৭, যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ, ২০, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ, ১৫০ (ইবনে হাজার মাক্কি) ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৩৭০, ৩০৮, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ৩৮, ১১১, নুরুল আবসার, পৃঃ, ১১৪, আল তাবরানি, খঃ, ৩, পৃঃ, ৩৭, ৩৮, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩০৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৫৫৯ (উর্দু)।

নবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, “আহলে বাইত এর আগে যাওয়ার চেষ্টা করো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।” তাঁদের থেকে সরে যেয়ো

না তাহলে দুঃখ কষ্ট তোমাদের চির সাথী হয়ে যাবে। তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করো না তাঁরা তোমাদের থেকে বেশি জ্ঞানী।"

সূত্র, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০, উসুদুল গাবা, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৩৭, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ, ১৪৮, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৫২৫, কানজুল উম্মাল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬৮, মাজমাউিক জাওয়ায়েদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ২১৭, তবাকাতুল আনোয়ার, খঃ, ১, পৃঃ, ১৮৪, আল সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৭৩, আল তাবরানি, পৃঃ, ৩৪২।

হাদীসে সাকালাইন দু'টি ভারী বস্তুর হাদীস। "পবিত্র কোরআন ও ইতরাত আহলে বাইত।"

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, নবী (সাঃ) এর বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ আমরা সবাই কমবেশি জানি এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক আলেমদের শরনাপন্ন হয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম যে, নবী (সাঃ) আমাদেরকে বিদায় হজ্বে কোন দু'টি বস্তু অনুসরণ করার কথা বলেছেন? তারা আমাকে উত্তরে বললেন যে, কেন "কোরআন ও হাদীস"। আর একজন আলেম উত্তরে বললেন, "কোরআন ও সুন্নাহ্"। আর একজন আলেম উত্তরে বললেন, "শুধু কোরআন"। আরেক জন আলেম উত্তরে বললেন, "কোরআন ও আহলে বাইত"। আমি তাদের কাছে অনুরোধ করলাম যে, আপনি যে, বললেন, নবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে একলক্ষ বিশ হাজার সাহাবাদের সামনে বলেছেন "কোরআন ও হাদীস" অনুসরণ করতে, আপনি আমাকে তা সিহাহ্ সিত্তাহ্ ৬টি সহীহ্ গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করুন। তখন সেই আলেমরা আমার কাছে সময় চেয়ে আর উত্তর দিলেন না, তখন আমি বুঝলাম এরা সেই আলেম "যারা সত্যকে জেনেও গোপন করে।" এইজন্যই আমি নিজে ইসলামী ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরীতে গিয়ে বিভিন্ন আলেম ও ওলামাদের তাফসির ও হাদীস গ্রন্থ থেকে সূত্র দেখা শুরু করলাম ও নোট নিলাম এবং ইন্টারনেটের সাহায্য ও তথ্য সংগ্রহ করলাম। অবশেষে যে তথ্য পেলাম, সেটা হচ্ছে যে, নবী (সাঃ) আমাদেরকে

বিদায় হজ্বে যে দু'টি বস্তু অনুসরণ করার কথা বলেছেন তা হচ্ছে, "পবিত্র কোরআন ও ইতরাত আহলে বাইত।" উক্ত হাদীসটি সহীহ্ ও মুতাওয়াতের। যেমন হাদীসটি হচ্ছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (সাঃ) কে দেখেছি তিনি বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রের উপর সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দান করছিলেন, আমি শুনেছি তিনি ভাষণে বলছিলেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এটাকে শক্তভাবে ধরে রাখ (অনুসরণ কর) তবে গোমরাহ হবে না, যদি একটিকে ছাড় তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তার "প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব (কোরআন) দ্বিতীয়টা হচ্ছে, আমার ইতরাত, আহলে বাইত," এ দু'টি কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমি দেখবো তোমরা তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করো।" বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী (সাঃ) আমাদেরকে কিতাবুল্লাহর বিধান ও আহলে বাইত-এর সীরাত ও রেওয়ায়েত অনুসরণ করতে হুকুম দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, সেই সময় নবী (সাঃ) এর সঙ্গে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবার জামাত ছিল এবং নবী (সাঃ) সাহাবাদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন যে, যদি কোরআন ও আহলে বাইত এর একজনকেও ছাড় তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, আর আমরা হলাম সাধারণ মানুষ, আমরা যদি সেই দু'টি বস্তুকে অনুসরণ না করি তবে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাবো কি?"

আবার অনেক আলেম আমাদের অনেকভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। যেমন তাঁরা বলেন, নবী (সাঃ) নাকি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ভাষণ দিয়েছেন যেমনঃ কোথাও "কোরআন ও সুন্নাহ্" বলেছেন, আবার কোথাও, "কোরআন ও হাদীস" বলেছেন, যখন আমি বললাম, ঠিক আছে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি? তখন আর সদুত্তর আসে না। আমি পাঠকদের অবগতির জন্য প্রমাণ স্বরূপ বলছি, "কোরআন ও সুন্নাহ্ বা হাদীস" এই হাদীসটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক মুরসাল হাদীস হিসাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেখানে সাহাবির ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন ও তাহকীক মিশকাতুল মাসাবিহ, খঃ, ১, পৃঃ, ১০৪, হাঃ, ১৮৬, তে দেখুন

সেখানে উল্লেখ আছে যে, “কোরআন ও সুন্নাহ্ বা হাদীস” হচ্ছে (মুরসাল ও যঈফ হাদীস) আহলে হাদীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

এবং যারা বলেন যে, নবী (সাঃ) বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটা সঠিক নয়, আমি নিজে যাচাই করে দেখেছি, নবী (সাঃ) সব জায়গায়তে একই কথা বলেছেন, “কোরআন ও আহলে বাইত,” যেমনঃ-

প্রথমবার তিনিঃ “আরাফার ভাষণে বলেছেন, কোরআন ও আহলে বাইত।” Al-Tirmidhi in his Sunan (v, 662, no. 3786, alKhatib, alMuttafiq Kanz al-'ummal, i, 48 and Majma' alzawa'id, v, 195; ix, 163, x, 363, 268; |

عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنيه يوم عرفه وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول ياأيها الناس، إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله و عترتي أهل بيتي.

দ্বিতীয়বার তিনিঃ “গাদীরে খুমের ভাষণে বলেছেন, কোরআন ও আহলে বাইত,” AlNasa'i in his alSunan alkubra, 96. No. 79. records the following tradition in the chapter "Khasa'is 'Ali": alTabarani, alMu'jam alkabir, iii, 2679, 2681, 2683, 3052, v, 4969, 4970, 4971, 4986, 5026, 5028; alHakim, al-Mustadrak 'ala alSahihayn, iii, 109, 110।

أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن

الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه .

তৃতীয়বার তিনিঃ "মসজিদে নববীতেঃ বলেছেন, কোরআন ও আহলে বাইত," Ibn 'Atiyyah in the introduction of his tafsir, alMuharrar alwajiz, i, 34 records the following narration:, Ibn Hajar, alSawa'iq almuhriqah, 75, 136 :

وروي عنه عليه السلام أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم: كتاب الله سبب بينكم وبينه طرفه بيده وطرفه بأيديكم فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واحلوا حلاله وحرموا حرامه، ألا وعترتي أهل بيتي هو الثقل الآخر، فلا تسبقوهم فتهلكوا.

চতুর্থবার তিনিঃ বলেছেন নিজের হুজরাতে, যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন "দেখ তোমরা আমার পর আমার আহলে বাইতকে অনুসরণ করবে", Ibn Abi Shaybah, as cited by Al'Isami in Simt alnujum al-'awali, ii, 502, no. 136, has narrated the following tradition:, Ibn Hajar, alSawa'iq almuhriqah, 89, from Umm Salamah :

أخرج الحافظ ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته، أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا وإني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي، ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فسئلوهما ما خلفت فيهما.

এখন আর আমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, নবী (সাঃ) চার জায়গায় একই কথা প্রচার করেছেন আর তা হচ্ছে, "কোরআন ও আহলে বাইত।" "সুন্নাহ্ বা হাদীস" বলেননি, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

"আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" **(**মু'মিনুন**-**৭০**)**

"আর তাদের মধ্যে একদল সত্যকে জেনেও গোপন করে।" **(**বাকারা**-**১৪৬**)**

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।" **(**বাকারা**-**৪২**)**

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যখন কোন কাজের হুকুম দেয়, যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব-৩৬)

এখন সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের জন্য সেই সূত্রগুলো উল্লেখ করছি যে, নবী (সাঃ) বিদায় হজ্বে আমাদের "কোরআন ও ইতরাত, আহলে বাইতকে অনুসরণ করতে বলেছেন," আমি সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অনুরোধ করছি, আপনারা নিজেরা যাচাই করে দেখুন, সত্য কোনটি।

সূত্র, সহীহ্ তিরমিজি, খঃ, ৬, হাঃ, ৩৭৮৬, ৩৭৮৮ (ই,ফাঃ)। সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৬, হাঃ, ৬০০৭, ৬০১০, (ই:ফা:)। মেশকাত, খঃ, ১১, হাঃ, ৫৮৯২, ৫৮৯৩, (এমদাদীয়া)। তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ২, পৃঃ, ১৮১, ৩৯৩, (ইফাঃ)। তাফসীরে হক্কানী (মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী) পৃঃ, ১২, ১৩ (হামিদীয়া)। তাফসীরে নূরুল কোরআন, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৩ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম)। মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী)। তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৭১ (মুফতি মোঃ সফি) (ই,ফাঃ) কুরআনুল করীম, পৃঃ, ৬৫, (মহিউদ্দিন খান)। সীরাতুন

নবী, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০৫ (আল্লামা শিবলি নুমানী) (তাজ কোং)। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ, ৫, পৃঃ, ৩৪৫, খঃ, ৭, পৃঃ, ৬১৬ (ই, ফাঃ)। শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী, খঃ, ১, পৃঃ, ৩১৫, (বাংলা একাডেমি)। কাতেবীনে ওহী, পৃঃ, ১৬৬ (ই,ফাঃ)। আশারা মোবাশশারা (ফায়েলে দেওবন্দ), পৃঃ, ১৬৩ (এমদাদীয়া)। বোখারী শরীফ, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৮০, ২৮২, (হামিদীয়া)। রিয়াদুস সালেহীন, খঃ, ১, পৃঃ, ২৫৫ (ই, সেন্টার)। মাসিক মদীনা (জুন ২০০৫), পৃঃ, ১৫,। সুফিদর্শন, পৃঃ, ৩৩, ৩৮, (ই,ফাঃ)। দিওয়ানে মইনুদ্দিন, পৃঃ, ৪৭১ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)। বিশ্বনবী বিশ্বধর্ম (ফজলুর রহমান) পৃঃ, ১৮৮ (মল্লিক ব্রাদার্স কলকাতা)। বিশ্ব নবী, পৃঃ, ৫৩৩ (অধ্যাপক মাওঃ সিরাজ উদ্দিন)। দৈনিক যুগান্তর, ২৮ জুন ২০০২, ইং। ২৭, ফেব্রু ২০০৪, ইং। ২৮,ফেব্রু ২০০৫, ইং। ১৩, ফেব্রু, ২০০৬, ইং। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মার্চ ২০০২ ইং। যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা (মাওঃ আমিনুল ইসলাম), পৃঃ, ২৩০,। নেয়ামতে খোদা আহলে বাইতে মুস্তাফা, পৃঃ, ২২,। রক্তের মূল্যে, পৃঃ, ৭৯ (মজিদ পাবলিঃ)। পঞ্চ প্রধান, পৃঃ, ১০৬, ১৩৩, ১৩৮, ১৪১, ৩৭৭, ৩৭২ (মল্লিক আব্দুর রউফ)। শাস্তির নবী, পৃঃ, ১৫৯-১৬২ (ফজলুর রহমান খান, দায়েরমী কমপ্লেক্স)। মাসিক সুরেশ্বর, (মার্চ, ২০০১), পৃঃ, ১০, শাহাদাতে আহলে বাইতেত, পৃঃ, ৮৪, (মানকা আবুল উলাইয়া)। মহর শরীত, পৃঃ, ২৮, ২৯ (মাওঃ মোঃ যাকরিয়া) মহানবীর ভাষণ, পৃঃ, ২১১।

(আব্দুল কাইয়ুম নদভী (ই, ফাঃ), আল মুরাজায়াত, পৃঃ, ২৮, ২২৩ (আল্লামা শারাফুদ্দীন মুসাভী), ওহাবী পরিচয়, পৃঃ, ১৫৫-১৫৭, (রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরি ১৯৯০ইং)। ইসলামিয়াত, পৃঃ, ৩৩ (ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি (ই,ফাঃ)। রহমতে দো আলম মোহাম্মদ, পৃঃ, ১১২ (ইস্টার্ন লাইব্রেরী)। জুলফিকারই মুর্তজা, পৃঃ, ১৫৪ (আতরশি)। মদীনার আলো, পৃঃ, ৫৮ (ডাঃ সুফী সাগর সামস্ আজিমপুর দায়রা শরীফ)। কাসাসুল আম্বিয়া, পৃঃ, ৫২১-৫২২ (তাজ কোং, ১৪১০, বাংলা)। মারেফাতের গোপন রহস্য, পৃঃ, ৫৬-৫৭ (মৌলভী হামিদুর রহমান খান)। পীরের মর্যাদা ও ভূমিকা, পৃঃ, ১১৪ (মুহাঃ মুখলেছুর রহমান চৌধুরী এডভোকেট)। জানধারা, পৃঃ, ১১৬ (অধ্যাপক মুহাঃ

মুখলেছুর রহমান চৌধুরী এডভোকেট)। হযরত আলী, পৃঃ, ৫৬ (এমদাদীয়া)। আমি কেন তাবলিগ করি, পৃঃ, ২৭-২৮ (তাবলিগি কুতুবখানা)। মাসিক মদীনা, পৃঃ, ৬ (সেপ্টেম্বর ২০০০)। নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা, পৃঃ, ৯, ১১, ১৭, ৬০ (মাওঃ মাহমুদুল হাসান)। জামে আত তিরমিজি, খঃ, ৬, হাঃ, ৩৭২৬ (ই, সেন্টার)। রিয়াদুস সালিহীন, খঃ, ১, পৃঃ, ৩০৯ (হোসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহলে হাদীস)। সংক্ষিপ্ত তাফসীর আল মাদানী, খঃ, ৮, পৃঃ, ১৫ (হোসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আহলে হাদীস)। ইতিহাসগত বিভ্রান্তির রহস্য, পৃঃ, ২৩৫ (মোফাকখরুল ইসলাম)। নবী বংশ পরিচিতি ও মহান কোরবানী, পৃঃ, ২৮, ৭৬, (সৈয়দ মোঃ ইসহাক)। নবীর আহলে বাইত-এর অনুসরণ কি অপরিহার্য, পৃঃ, ৪৭, ৪৮, (এম রহমান)। নবীর (সাঃ) বংশধর, পৃঃ, ৯২, (মোনা খানম)। আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৫৬৮ (উর্দু)। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৬৭-৭৬, (উর্দু)। মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ, ২, পৃঃ, ৫৪৫ (উর্দু)। আল জামে আল সাগির (আল সিয়ুতী), খঃ, ১, পৃঃ, ৩৫৩,। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, (আল হাইতামি), খঃ, ৯, পৃঃ, ১৬৩,। ফাতহুল কাবির, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৫১,। উসুদুল গাবা (ইবনে আসির), খঃ, ২, পৃঃ, ১২,। তাবাকাতুল কুবরা (ইবনে সা'দ), খঃ, ২, পৃঃ, ১৯৪,। আল কাবির (আল তাবরানি), খঃ, ৩, পৃঃ, ৬২, ৬৩, ১৩৭,। আস সাওয়ায়েক আল মুহরেকা (ইবনে হাজার হাইতামি), পৃঃ, ২৬০। তাবাকাতুল আনোয়ার, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬,। সুনানে (দারামি), খঃ, ২, পৃঃ, ৪৩২,। আল খাসাইস আন নিসাঈ, পৃঃ, ২১, ৩০,। মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৬৬, ৩৭০, খঃ, ২, পৃঃ, ৫৪৫, হাঃ, ৯৯০,। সহীহ্ তিরমিজি, খঃ, ৫, হাঃ, ৩৭৮৫, ৩৭৮৮ (বৈরুত)। মিনহাজুস সুন্নাহ (ইবনে তাইমিয়া) খঃ, ৪, পৃঃ, ৮৫ (মিশর)। সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৭, পৃঃ, ১২২, ১২৩ (মিশর)। ইয়াতিয়াতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ, ১, পৃঃ, ৫৬৬, খঃ, ২, পৃঃ, ৫০৩,। তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ, ৫, পৃঃ, ৪৩৬। আল তাজ আল জামেলিল উসুল, খঃ, ৩, পৃঃ, ৩০৮,। তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ২, পৃঃ, ৬০,। সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৮৭৪ (বৈরুত)। মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৭, ২৬, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৮২ (মিশর)। তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৩ (মিশর)।

জামেউল উসুল ইবনে আসির, খঃ, ১, পৃঃ, ১৮৭ (মিশর)। তাফসীরে দুররে মানসুর খঃ, ৬, পৃঃ, ৩০৬, (মিশর)। তাফসীরে খাজেন, খঃ, ১, পৃঃ, ৪, (মিশর)। সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ, ২২৬, (মিশর)। মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১০, ১৪৮, ৫৩৩। হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৫৫,। নুরুল আবসার, পৃঃ, ৯৯,। তাফসীরে কাবির, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৬ (মিশর)। কানজুল উম্মাল, খঃ, ১, পৃঃ, ৪৭, হাঃ, ৯৪৫,। সিবতে ইবনে জওজি, পৃঃ, ১৮২,। ফুসুলুল মোহিম্মা, পৃঃ, ২৫। কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১৩০,। মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ৪২,। মোহাঃ সা'দ খতিব তাবাকা, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৬। আল ইসাফবিঘুর আল আশরাফ (বালাগী) পৃঃ, ২২। আলা আল রহমান (বালাগী), পৃঃ, ৪৪,। মুশকিল আসার (তাহাভী) খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৬৮,। এলানে গাদীর (ডাঃ তাহেরুল কাদরী) পৃঃ, ২৯।

অধ্যায়**-**৯

এখন আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে, পবিত্র কোরআনে ও হাদীসে তাঁদের আহলে বাইত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা –

“আল্লাহ্ **(**হযরত**)** আদম **(**আঃ**)** কে সৃষ্টির পর তাঁকে কিছু নাম শিক্ষা দিলেন।**” (**বাকারা**-**৩৭**)**

পরে সে নামের উসিলায় হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। এবং আল্লাহ্ সেই নামের উসিলায় হযরত আদম (আঃ) এর দোয়া কবুল করেছিলেন তাঁরা হলেন, **“**হযরত মোহাম্মদ **(**সাঃ**)** হযরত আলী**,** হযরত ফাতেমা যাহরা**,** ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন **(**আঃ**)**।**”**

সূত্র, হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে, পৃঃ, ১৫৬, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (মদীনা পাবঃ) তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ,৯৭, কেফায়াতুল মোওয়াহেদীন, খঃ, ২, পৃঃ, ৩২, মানাকিব ইবনে মাগাজেলি, পৃঃ,

৫৯, সাইয়্যেদআল নিসা আহলুল জান্নাহ (আব্দুল আজিজ আল সামাওয়ে) পৃঃ, ১৫৯, শাওয়াহেদুত তানজিল, (হাসকানী) খঃ, ১, পৃঃ, ১০১।

নবী (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছে আমাদের আত্মাকে পাক পবিত্র করার জন্য। পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনকে কেউই বুঝতে পারবেন না। সুতরাং নবীর পর যারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন তাদেরকেও অবশ্যই জন্মসূত্রে পাকপবিত্র ব্যক্তিত্ব হতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র কোরআনে আহলে বাইতকে পবিত্র ব্যক্তিত্বের সনদ দেওয়া হয়েছে। যেমন,

"আহলে বাইতের সদস্যগণ আল্লাহ্ চান যে**,** আপনাদের কাছ থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে রাখতে এবং পূর্ণরুপে পূতঃপবিত্র রাখতে যতটুকু রাখার তাঁর **(**আল্লাহুর**)** হক আছে।**" (**আহ্যাব**-**৩৩**)।**

নবীর পত্নী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, "পবিত্রতার আয়াত আমার ঘরে নাযিল হয়। মহা নবী (সাঃ) হাসান, হোসাইন, আলী, ফাতেমা-এর উপর একটি চাদর টেনে প্রার্থনা করলেন, ইয়া আল্লাহ্ **"**এরাই আমার আহলে বাইত**"** এরাই আমার একান্ত আপনজন পরমাত্মীয়। এঁদেরকে সব ধরনের অপবিত্রতা হতে দূরে রাখুন। তখন নবীর পত্নী উম্মে সালমা (রাঃ) বললেন, ইয়া আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), আমিও কি এই চাদরের ভেতরে আসতে পারি? মহা নবী (সাঃ) বললেন, না, তবে তুমি মঙ্গলের উপর আছো (**"**এরাই আমার আহলে বাইত**"**)**।**

এবার সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের জন্য সূরা আহ্যাব-এর ৩৩ নং আয়াতের সূত্র উল্লেখ করছি, যেখানে, এই আয়াত আহলে বাইত-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। ("আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন" (আঃ) এর শানে)

আপনার আপলোড করা সর্বশেষ ছবিটির (image_62d188.png) সম্পূর্ণ অনুলিখন (Transcription) নিচে দেওয়া হলো। এটি মূলত আগের পৃষ্ঠায় শুরু হওয়া আয়াতে

তাতহীর (সূরা আহ্যাব-৩৩) সংক্রান্ত দীর্ঘ তথ্যসূত্র তালিকার অবশিষ্টাংশ এবং আহলে বাইতের পবিত্রতা বিষয়ক একটি নতুন বর্ণনা:

সূত্র, সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৭, হাঃ, ৬০৪৩, (ই,ফাঃ) সহীহ্ তিরমিযী, খঃ, ৬, হাঃ, ৩৮৭১, ৩৭৮৭ (ই,ফাঃ) তাফসীরে মারেফুল কোরআন, খঃ, ৭, পৃঃ, ১৩২, (মুফতি মোঃ সফি) (ই,ফাঃ)। তাফসীরে মাযহারী খঃ, ১০, পৃঃ, ৩৩, ৩৪, (ই,ফাঃ) সহীহ্ তিরমিজী, খঃ, ৫, হাঃ, ৩১৪০, ৩১৪৪, খঃ, ৬, হাঃ, ৩৭২৫, ৩৮০৮ (ই,সেন্টার) মেশকাত, খঃ, ১১, হাঃ, ৫৮৭৬ (এমদাদীয়া) শেখ আব্দুর রহিম গ্রন্থাবলী, খঃ, ১, পৃঃ, ৩০৮ (বাংলা একাডেমি) তাফসীরে মাদানী, খঃ, ৮, পৃঃ, ১৩-১৫ (আহলে হাদীস লাইব্রেরী) মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৬, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী) তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৯০, (মিশর), তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৮৪, (মিশর) তাফসীরে কাসসাফ, খঃ, ১, পৃঃ, ১৯৭, (মিশর) তাফসীরে কুরতুবি খঃ, ১৪, পৃঃ, ১৮২ (মিশর) তাফসীরে এতকান, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৪০ (মিশর), তাফসীরে কাবির, খঃ, ২, পৃঃ, ৭০০ (মিশর), তাফসীরে সালবি, খঃ, ৩, পৃঃ, ২২৮ (মিশর) তাফসীরে তাবারী, খঃ, ২২, পৃঃ, ৮ (মিশর), ফাতহুল কদীর সাওকানী, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৭৯। উসুদুল গাবা (ইবনে আসির) (মিশর), খঃ, ২, পৃঃ, ১২, খঃ, ৫, পৃঃ, ৫২১, সহীহ্ তিরমিজী খঃ, ৫, পৃঃ, ৩ (মিশর), ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১৭৪ (উর্দু) পৃঃ, ১০৭ (ইস্তাম্বুল) মানাকেবে খাওয়ারেজমি, পৃঃ, ২৩, সাওয়ায়েকে মোহরেকা পৃঃ ১১৭, সুনানে বায়হাকী, খঃ, ২, পৃঃ, ১৪৯, ইমাম নাসায়ী পৃঃ, ১৪৯, মুয়াদ্দাতুল কুরবা পৃঃ, ১০৭ আল ইসাবা খঃ, ২, পৃঃ, ৫০২ তাবরানি, খঃ, ১, পৃঃ, ৬২, আস সিরাতুল হালবিয়া, খঃ, ১৩, পৃঃ, ২১২, তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ, ১, পৃঃ, ১৬৫, আহকামুল কোরআন, খঃ, ২, পৃঃ, ১৬৬ (ইবনুল আরাবি) কানজুল উম্মাল (মুত্তাকী হিন্দি), খঃ, ৫, পৃঃ, ৯৬ তারিখে তাবারী খঃ, ৫, পৃঃ, ৩১, তারিখে দামেস্ক, পৃঃ, ৬০ (বৈরুত) কেফায়াতুল

মোওয়াহেদিন, খঃ, ২, পৃঃ, ১৭৩, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৩১, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৭, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৯২ (বৈরুত), যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ, ২১, মুসতাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ২০৮, সাওয়াহেদূত তানজিল, খঃ, ৩, পৃঃ, ১০, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৩, ফাজায়েলুল খামসা, খঃ, ১, পৃঃ, ২২৪ ইসাবা, খঃ ৫, পৃঃ, ৪৮৯, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৬৭, মাকতালুল খাওয়ারেজমী, খঃ, ২, পৃঃ, ৬১, মাশকিলুল আসার, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৩৫, উসুদুল গাবা, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪১০, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৬, মুসনাদে তায়ালাসী, খঃ, ৮, পৃঃ, ২৭৪, রিয়াজুন নাজরাহ, খঃ, ২, পৃঃ, ২৪৮, সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ৫, পৃঃ, ১৮৮৩ (বৈরুত) তাহজিবুত তাহজীব, খঃ, ২, পৃঃ, ২৯৭, তরজামাহ-ই-ইসতিয়াব, পৃঃ, ৬৩৭, তায়সিরুল উসুল, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৯৭, ইয়াহিয়াতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ, ২, পৃঃ, ৫০৫ (উর্দু) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৯৪, ৫৫০ (উর্দু) আল ফাতওয়া আল কোবরা, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৭০, (ইবনে তাইমিয়া) তারিখে ওহাবীয়া (আলী আকপার ফাকহি), পৃঃ, ২২০-২২২। ফাতহুল বারী শারাহ সহীহ্ বুখারী, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪২২, খঃ, ৭, পৃঃ, ৬০, আল ইতিয়াব, খঃ, ৫, পৃঃ, ৫৯৭, জামেউল উসুল, খঃ, ১০, পৃঃ, ১০১, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১২৬।

উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, "এটা আমার মসজিদ এতে যে কোন হায়েয অবস্থার মহিলা **(**স্ত্রীগণ**)** ও যে কোন ব্যক্তি **(**সাহাবারা**)** যার উপর গোসল ফরজ তাদের জন্য পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমার জন্য ও "আমার পবিত্র আহলে বাইত **{**আলী**,** ফাতেমা**,** হাসান**,** হোসাইন**,** **(**আঃ**)}** দের উপর যে কোন অবস্থায় তাঁরা আমার মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেন**,** **(**কারণ তাঁরা সব সময় পাক ও পবিত্র**)**।"

সূত্র, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৫৬২) সুনানে বাইহাকী, খঃ, ৭, পৃঃ, ৬৫, হাঃ, ১৩১৭৮, কানজুল উম্মাল, খঃ, ১৪, পৃঃ, ১০১ হাঃ, ৩৭১৬০, তারিখে ইবনে আসাকির, খঃ, ১৪, পৃঃ, ১৬৬, খাসাইস

আল কুবরা, খঃ, ২, পৃঃ, ৪২৪, মারাজুল বাহরাইন ফি মানাকেবে আল হাসনাইন, পৃঃ, ৪৮ (ডাঃ তাহেরুল কাদরী)।

কামালিয়াত অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্র ও আদব কায়দা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য আদর্শ মডেল। তাঁদের মহানুভব অবস্থান ও পবিত্র উচ্চপদমর্যাদার প্রতি পবিত্র কোরআন বিশেষ গুরুত্ব ও নির্দেশ করেছে যাতে মুসলিম উম্মাহ্ তাঁদের উজ্জ্বল উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে এবং মহানবী (সাঃ)-এর পর শরীয়তের আইন ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তথ্যাদি ও পথ নির্দেশের জন্য তাদেরকে মেনে চলে। তাঁরা হচ্ছেন, সেই ব্যক্তিত্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য যারা ইসলামের বাস্তব নমুনা এবং মতামত ও চিন্তার মতদ্বৈধতা নিরসনের বিষয়ে ঐক্যের প্রতীক।

আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনে উদ্রেক হতে পারে, এমন যে কোন ধরনের সন্দেহ অপনোদন করা প্রয়োজন, যেমন এই আয়াতে (আহ্যাব-৩৩) উম্মুল মোমিনিনগণকেও "আহলে বাইত" এর অন্তর্ভুক্ত করে কি না? কিছু কিছু আলেম নিশ্চিতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রকৃত সত্য হলো, এই আয়াতে উম্মুল মোমেনীনগণকে কোনভাবেই "আহলে বাইত" এর অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ, পূর্ববর্তী আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কেবল মাত্র বিশেষ পাঁচ ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যাদের মধ্যে চার জন পুরুষ, ব্যতিক্রম কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহর (সাঃ) কন্যা ফাতেমা (আঃ)।

অধিকন্তু, পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে পুংবাচক লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষা সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট যে "আনকুম" এবং "ইউতাহ্‌হিরাকুম" শব্দ (যাদের অর্থ তোমাদের থেকে ও তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র রাখতে)। পুং বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিদেরকে যাদের অধিকাংশ হলো পুরুষ যৌথভাবে নির্দেশ করেছে। যদি এর দ্বারা আল্লাহ্'তায়ালা উম্মুল মোমেনীনদের

বোঝাতে চাইতেন, যেমন কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। তবে আরবী ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআনে অবশ্যই অবশ্যই পুং বাচক ঐ শব্দ দুটির পরিবর্তে স্ত্রী বাচক শব্দ "আনকুন্না" এবং "ইউতাহহিরাকুন্না" ব্যবহার করা হতো। কারণ, তারাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্য আহলে সুন্নাতের আলেমরা যারা তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "আহলে বাইত হচ্ছেন, নবীর কন্যা হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান, ও ইমাম হোসাইন (আঃ)।"

সূত্র, তাফসীরে কবির, খঃ, ২, পৃঃ, ৭০০ (মিশর) আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকা), পৃঃ, ১১৭, ১৪১, (ইবনে হাজার আসকালানী) মিশর) উসুদুল গাবা (ইবনে আসীর), খঃ, ২, পৃঃ, ১২, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪১০, তাফসীরে এতকান, খঃ, ৪, পৃঃ, ২৪০ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৮৩ (মিশর), তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ১৪, পৃঃ, ১৮২ (কায়রো) তাসকেরাতুল খাওয়ারাস ইবনে জাওজী হানাফী, পৃঃ, ২০৩, তাফসীরে কাশশাফ যামাযশরী, খঃ, ১, পৃঃ, ১৯৩, (মিশর) মানাকেবে খাওয়ারেজমী হানাফী, পৃঃ, ২৩, মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ১৯৩, ৩৯৯, (মিশর)।

পবিত্র কোরআনে নবী (সাঃ) এর আহলে বাইত-এর অনুসরণ ও মোয়াদ্দাত ফরজ করা হয়েছে।

নবী (সাঃ) যে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কাছ থেকে নবীজির রিসালাতের পারিশ্রমিক বাবদ তাঁর আহলে বাইত-এর মুয়াদ্দাত (প্রাণাধিক ভালবাসা ও অনুসরণ) ফরজ করে দিয়েছেন। যদি আমরা আহলে বাইতকে অনুসরণ না করি, তাহলে আল্লাহ্র হুকুম অকার্যকর থেকে যাবে বা মানা হবে না, তাই হুকুম হচ্ছে—

(রাসূল সাঃ) "বলুন! যে, আমি আমার রিসালাতের পারিশ্রমিক বাবদ তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, শুধু আমার কুরবা-এর

মুয়াদ্দাত (প্রাণাধিক ভালবাসা ও অনুসরণ) ব্যতিত।” (সূরা শুরা-২৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), কারা আপনার কুরবা (নিকট আত্মীয়), যাঁদের মুয়াদ্দাত পবিত্র কোরআনে উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছে? উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন— “আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ) এর মুয়াদ্দাত।”

এখন সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সেই সূত্র উল্লেখ করছি, যেখানে সবাই উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত আয়াত আহলে বাইত-এর (“আলী, ফাতেমা, হাসান, ও হোসাইন” (আঃ) এর) শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূত্র, “কোরআন শরীফ (শুরা, ২৩) (আশরাফ আলী থানভী), পৃঃ, ৬৯২, তাফসীরে মাযহারী, খঃ, ১১, পৃঃ, ৬০ (ই,ফাঃ) তাফসীরে নুরুল কোরআন (মাওঃ আমিনুল ইসলাম), খঃ, ২৫, পৃঃ, ৬৭, মাদারেজুন নাবুয়াত, খঃ, ৩, পৃঃ, ১১৭, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী) তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ, ৬, পৃঃ, ৭ (মিশর) তাফসীরে যামাখশারী, খঃ, ২, পৃঃ, ৩৯৯, (মিশর) তাফসীরে তাবারী, খঃ, ২৫, পৃঃ, ২৫ (মিশর) তাফসীরে কাশশাফ, খঃ, ৩, পৃঃ, ৪০২, খঃ, ৪, পৃঃ, ২২০ (মিশর) তাফসীরে কাবির, খঃ, ২৭, পৃঃ, ১৬৬ (মিশর) তাফসীরে বায়যাবী খঃ, ৪, পৃঃ, ১২০ (মিশর) তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ, ৪, পৃঃ, ১১২ (মিশর) তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ১৬, পৃঃ, ২২ (মিশর) তাফসীরে নাসাঈ, খঃ, ৪, পৃঃ, ১০৫ (মিশর) তাফসীরে আবু সাউদ, খঃ, ১, পৃঃ, ৬৬৫, তাফসীরে জামে আল বয়ান (তাবারী), খঃ, ২৫, পৃঃ, ৩৩, তাফসীরে আল আকাম, খঃ, ২, পৃঃ, ১২১, তাফসীরে বাহরুল মুহিয়াত (ইবনে হায়ান), খঃ, ৯, পৃঃ, ৪৭৬, তাফসীরে বিহার আল মদিন (ইবনে আজি), খঃ, ৫, পৃঃ, ৪০১, তাফসীরে আবু সাউদ, খঃ, ৬, পৃঃ, ৮০, তাফসীরে কবির, খঃ, ১৩, পৃঃ, ৪০২, তাফসীরে বাইদাবী, খঃ, ৫,

পৃঃ, ১৫৩, তাফসীরে আল নাসাঈ, খঃ, ৩, পৃঃ, ২৮০ তাফসীরে আল নিশাপুরি, খঃ, ৬, পৃঃ, ৪৬৭, আল মুহররার আল ওয়াজিজ, খঃ, ৬, পৃঃ, ৫০, মুসতাতুল কবির (আল তিবরানী), খঃ, ৩, পৃঃ, ৪৭, ৭৭, খঃ, ১০, পৃঃ, ১০৬, খঃ, ১১, পৃঃ, ৩৫১, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৩, পৃঃ, ২১০, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৬৮, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৫৮, খঃ, ৭, পৃঃ, ১০৩, উসুদুল গাবা, খঃ, ৫, পৃঃ, ৫৬৭, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ৩, পৃঃ, ২০১, নাসাঈ, খঃ, ৪, পৃঃ, ১০৫, মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃঃ, ৩০৭, সওয়ায়েকুল মুহরেকা, খঃ, ২, পৃঃ, ১৭০, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ৩১, মুসনাদে হাম্বল, পৃঃ, ২২, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ, ১০৯।

মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ২২৯, মাতালেবাস সাউল, পৃঃ, ৪৮, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ, ১০১, যাখায়েবুল উকবা (মহিউদ্দিন তাবারী), পৃঃ, ৯, ১২, নুরুল আবসার পৃঃ, ১২২ ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ১৭৩ (উর্দু), আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১০২, ৫৮৭ (উর্দু)।

তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন পবিত্র আহলে বাইতের সাথে মুসলিম উম্মাহর নিছক আবেগ ধর্মী কোন সম্পর্ক উপস্থাপন করেনি, বরং গুরুত্বারোপ করেছে, গভীর ও আন্তরিক ভালবাসার প্রতি। আহলে বাইতের প্রতি মুসলমানদের সত্যিকার ভালবাসার অভিব্যক্তির সবচেয়ে উত্তম বহিঃপ্রকাশ হল, আহলে বাইত এর প্রদর্শিত মহান অনুকরণীয় চারিত্রিক মডেল অনুসরণ করা, দৈনন্দিন জীবনাচরণে তাঁদের শিক্ষা ও নীতি নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং মহানবীর (সাঃ) পরে তাঁদেরকে পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া।

মহানবী (সাঃ)-এর জবানীতে এই আয়াত (সূরা শুরা-২৩) উপস্থাপন করে এবং নবুয়্যতী কাজের বিনিময়ে তাঁর "কুরবাদের" প্রতি ("আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন" (আঃ) এর) গভীর ভালবাসা ও অনুসরণ ব্যতিত অন্য কোন প্রতিদান তিনি চান না। এই বিষয়টি মুসলমানদেরকে জানানোর জন্য তাঁকে সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ্ তায়ালা

মুসলমানদের নিকট এটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আহলে বাইতের আনুগত্য ও তাঁদের নেতৃত্বের স্বীকৃতিই কেবলমাত্র দুনিয়ায় তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে এবং আখেরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়।

"আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা ফাকরে রাজী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত দু'জন তাফসীর কারক ও বিজ্ঞ আলেম, তারা তাদের সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থদ্বয় আল কাশশাফ ও আল কাবীর তাফসীরদ্বয়ে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলো (শুরা-২৩) তখন রাসূল (সাঃ) বলেন।"

- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, সে শহিদী মর্যাদা পায়।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, সে নাজাতপ্রাপ্ত হয়ে ইহজগত ত্যাগ করে।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, সে তওবাকারী হিসাবে ইহজগত ত্যাগ করে।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, সে পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে ইহজগত ত্যাগ করে।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, তাকে মালেকুল মউত, মুনকীর ও নকীর ফেরেশতারা সুসংবাদ দেয়।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, তাকে এমন ভাবে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে যেমন বিবাহের দিন কন্যা তার শ্বশুরালয়ে যায়।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, তার কবরে জান্নাতমুখী দু'টি দরজা খুলে দেওয়া হবে।
- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তার কবরকে রহমতের ফেরেশতাদের জিয়ারতের স্থানের মর্যাদা দেন।

- যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের ভালবাসা নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করে, সে নবীর সুন্নত ও মুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে ইহজগত ত্যাগ করলো।

“সাবধান যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতে তার কপালে লেখা থাকবে সে আল্লাহপাকের রহমত হতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কাফের হয়ে মারা যায়। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না।”

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) আপনার আল, আহলে বাইত, কারা? নবীজি বললেন, “আলী, ফাতেমা, হাসান, ও হোসাইন,” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহ্র কসম যাঁর হস্তে আমার জীবন, “যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে শত্রু মনে করবে, সে জাহান্নামী।”

সূত্র, তাফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বয়ান, খঃ, ৩, পৃঃ, ৬৭, (মিশর), তাফসীরে কাবির, খঃ, ২৭, পৃঃ, ১৬৫, (মিশর), তাফসীরে কুরতুবি, খঃ, ১৬, পৃঃ, ২২, (মিশর), এহইয়াউল মাহিযাত, পৃঃ, ৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৪১৮, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ, ১০৪, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৫৫, ৪৯৯।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের চার ইমামের অন্যতম**,** ইমাম শাফেয়ী**,** আহলে বাইতের শানে নিম্নলিখিত রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

“ইয়া আহলে বাইতে রাসূল (সাঃ) আপনাদের ভালবাসা (অনুসরণ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনে ফরজ করা হয়েছে। আপনাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি নামাজে আপনাদের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে না, তার নামাজ কবুল হবে না।

যখন লোকজনদের দেখেছি তারা তাদের পথকে গোমরাহীর সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন আমি আল্লাহ্রনামে উঠে পড়লাম আহলে

বাইতে মোস্তফার নাজাতের কিস্তিতে। আল্লাহ্র রশ্মি আঁকড়ে ধরেছি যা হচ্ছে, তাঁদের (আহলে বাইতের) প্রতি ভালবাসা কেননা এ রশ্মিকে আঁকড়ে ধরে থাকার দেয়া হয়েছে নির্দেশ।"

সূত্র, নুরুল আবসার, পৃঃ, ১০৪, সাওয়ায়েক আল মুহরিকা, পৃঃ, ১৪৮, শারাহ্ আল মাওয়াফেকলি আযহার কলী, খঃ, ৭, পৃঃ, ৭।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেন, "যদি কেবল মুহাম্মদ (সাঃ) এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা রাখলেই, মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্ব জগতের সমস্ত জ্বীন ও মানব সাক্ষী থাকুক আমিও রাফেযী।"

আপনার আপলোড করা ছবিটিতে থাকা টেক্সট নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো:

মারেফাতে ইমামত ও বেলায়েত ৮৬

সূত্র, কোরআনুল করিম, পৃ: ১২১৫, (মহিউদ্দিন খান)। ইয়া মাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ: ৫৭৭, (শেখ সুলাইমান কান্দুযী হানাফী)। আরজাহুল মাতালেব, পৃ: ৮৮৬ (ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারি)।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, "হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও।" (তওবা-১১৯)।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্যবাদীদের সাথে থাকতে বলছেন কারণ কি? শুধু ঈমান আনা যথেষ্ট নয়, কারণ সত্যবাদীদের সাথে থাকলে ঈমান সতেজ ও মজবুত থাকবে। তাই এখন আমরা সেই সত্যবাদীদের কোথায় পাবো? দেখি যে পবিত্র কোরআনে সত্যবাদীদের সাথে থাকার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, সেই কোরআনেই খুঁজি সত্যবাদী কাঁরা।

একদা নাজরানের খ্রিষ্টানদের একটি দল পাদ্রীসহ রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হন। তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় বিষয়ে নবীজির সাথে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হন নবীজির কোন যুক্তিই তারা মানছিলেন না। তখন নবীজির প্রতি পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

"আপনার নিকট যথাযথ জ্ঞান আসার পরও যে কেউ এই বিষয়ে তর্ক করবে, সন্দেহ করবে তাদের বলুন; আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদের, আমরা আমাদের নারীদের এবং তোমরা তোমাদের নারীদের এবং আমরা আমাদের নাফসদের (সত্তাদের) ডাকি তোমরা তোমাদের নাফসদের (সত্তাদের) ডাক। অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত (লা'নত) বর্ষিত হোক।" (আলে ইমরান-৬১)।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন "নবী (সাঃ) ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা, ও হযরত আলী (আঃ) কে ডাকলেন" এবং ইমাম হোসাইন কে কোলে নিলেন, ইমাম হাসানের হাত ধরলেন এবং খাতুনে জান্নাত ফাতেমা নবীজির পিছনে এবং হযরত আলী, খাতুনে জান্নাতের পিছনে হাঁটছিলেন, যেভাবে আয়াত নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবেই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হাঁটছিলেন। নবী (সাঃ) আহলে বাইত-এর উদ্দেশ্যে বললেন, (আমার মিশনের সদস্যগণ) আমি যখন অভিসম্পাতের জন্য প্রার্থনা করব, তখন তোমরা আমিন বলবে।

মুবাহেলার মাঠে নাজরানের পাদ্রী এই সত্যবাদী আহলে বাইত (পাক পাঞ্জাতন)কে দেখে ভীত হয়ে খ্রিষ্টানদের বল্লেন, আমি তাঁদের চেহারারতে এমন নূরের জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি, যদি তাঁরা এই পাহাড় ও পর্বতকে সরে যেতে বলে, তবে তা নিজ

অবস্থান থেকে সরে যাবে। সুতরাং, তাঁদের সাথে অভিসম্পাতের প্রার্থনায় মুবাহেলা করোনা। যদি করি, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। তাঁরা যে জিজিয়া কর ধার্য করেন তা মেনে নাও।

সূত্র, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ২, পৃ: ৩১২ (ইফা), তাফসীরে তাবারী, খণ্ড ৬, পৃ: ১৯-২২ (ইফা), তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃ: ৪৭৭ (ইফা), তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড ২, পৃ: ৯৪ (ইফা), তাফসীরে কানযুল ঈমান (আহমদ রেজা খাঁ বেরলভী), পৃ: ১২২, তাফসীরে নুরুল কোরআন (মাওঃ আমিনুল ইসলাম), খণ্ড ৩, পৃ: ২৭০, কোরআনুল করিম (মহিউদ্দিন খান), পৃ: ১৮১, কোরআন শরিফ (আশরাফ আলী থানভী), পৃ: ৯০, (মীনা বুক হাউস) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৬, হাঃ ৬০০২, (ইফা), সহীহ তিরমিজী, খণ্ড ৫, হাঃ ২৯৩৭ (ই. সেন্টার) বোখারী (হামিদিয়া), খণ্ড ৫, পৃ: ২৮২, মিশকাত (এমদাদীয়া), খণ্ড ১১ হাঃ ৫৮৭৫, কাতেবীনে ওহী, পৃ: ১৬৫ (ইফা), আশারা মোবাশশারা, পৃ: ১৬২ (এমদাদীয়া) মাসিক মদীনা, (৯/২০০০), পৃ: ৬, মাসিক সুরেশ্বর (এপ্রিল-২০০০), পৃ: ৭, শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী, পৃ: ৩০৮, (বাংলা একাডেমী), ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খণ্ড ২, পৃ: ৪৯৮; তাফসীরে দুরে মানসুর, খণ্ড ৬, পৃ: ৩৯, (মিশর) তাফসীরে তাবারী, খণ্ড ৩, পৃ: ২৯৯, (মিশর) তাফসীরে কাশশাফ, খণ্ড ১, পৃ: ৩৬৮, (বৈরুত) তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ৪, পৃ: ১০৪, (মিশর) তাফসীরে কাবীর (ফখরে রাজী), খণ্ড ২, পৃ: ৬৯৯, (মিশর) আহকামুল কোরআন (আবু বকর জাসাস), খণ্ড ২, পৃ: ১৬, কেফায়াতুল মোওয়াহেদ্দীন খণ্ড ২, পৃ: ১৭২, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ১, পৃ: ১৮৫ (মিশর) শাওয়াহেদুত তানজিল, খণ্ড ১, পৃ: ১২০, সহীহ মুসলিম খণ্ড ৪, পৃ: ১৮৭১, (মিশর) মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃ: ১৫০ (ভারত) ফতহুল কাদীর

শওকানী, খণ্ড ১, পৃ: ৩৪৭, আসবাবুল নুযুল, পৃ: ৬৮, জামেউল উসুল ইবনে আসির, খণ্ড ৯, পৃ: ৪৭০। আরজাহুল মাতালেব, পৃ: ৫৫৪, মাদারেজুন নাবুয়াত, খণ্ড ২, পৃ: ৫৬২, মানাকেবে মূর্তজাউই, পৃ: ১৫৬ (সালে কাসাফী, হানাফী)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম ইসলামের সত্যতা নিরুপণের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নবী (সাঃ) আর কাউকেও সঙ্গে নিলেন না, শুধু আহলে বাইত { (হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (আঃ) } গণকেই নিলেন। যেমন আল্লাহ্‌র পছন্দসই ধর্ম সত্য ও পবিত্র, ঠিক তেমনি সাক্ষ্যও সত্য ও পবিত্র হতে হবে, তাই তিনি আহলে বাইতগণকেই সাথে নিলেন। পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন পুত্রদের, নারীদের ও নাফসদের। নবী (সাঃ) পুত্রদের সাথে আরো অনেককে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি শুধু ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন কে নিলেন ও নারীদের সাথে নবীজির স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিতে পারতেন। কিন্তু, তিনি শুধু খাতুনে জান্নাত ফাতেমা সিদ্দীকাকে সঙ্গে নিলেন ও নাফসদের সঙ্গে বড় বড় সাহাবাদের সঙ্গে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি শুধু হযরত আলীকে সঙ্গে নিলেন, কারণ তাঁরাই ছিলেন আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাঃ) এর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সত্যবাদী।

অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে খ্রিষ্টানেরা আহলে বাইত (পাক পাঞ্জাতন) কে চিনে গেলেন কিন্তু আজ আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বলে দাবি করি কিন্তু তাঁর আহলে বাইতকে ঠিক মত চিনি না, জানি না। আবার অনেকে এখন পর্যন্ত আহলে বাইত-এর নামও শুনিনি। আর অনুসরণ করার তো প্রশ্নই আসে না।

উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, নবীজির পর যারা তাঁর উত্তরসূরী হবেন, তাঁরা পাক পবিত্র ও মাসুম হবেন।

অধ্যায়-১০

পবিত্র কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে হযরত আলী **(**আঃ**)** এর শুভ জন্ম হয়।

আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা যে, "পবিত্র কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হযরত আলী (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতরে জন্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন," সন ৩০ উম্মোল ফিল মোতাবেক ৫৯৯ সন যখন নবী (সাঃ) এর বয়স মোবারক ৩০ বৎসর তখন ইসলামী চাঁদের রজব মাসের ১৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার পবিত্র কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে হযরত আলীর (আঃ) শুভ জন্ম হয়। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর জন্ম আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর, কা'বাতে হয় এবং শাহাদাতও আল্লাহ্‌র ঘরে নামাজরত অবস্থায় হয়েছে, ২১শে রমজানুল মোবারক ৪০ হিজরী, কুফার মসজিদে।

সূত্র, নবীর বংশধর (মোনা-খানম), পৃ: ১৮-২২ (আনজুমানে কাদেরীয়া চট্টগ্রাম) কাতেবীনে ওহী, পৃ: ১৫২ (ই,ফাঃ) হযরত আলী, পৃ: ৭, (এমদাদীয়া)। আশারা মোবাশশারা, পৃ: ১৫৩, (এমদাদীয়া) দৈনিক যুগান্তর, (১৯, আগষ্ট, ২০০৫) সিরাতে উলুবিয়া, খণ্ড ১, পৃ: ২১, ২২, কউতকাবে দুবরী, পৃ: ৮৭, ৮৮, আরজাহুল মাতালেব, পৃ: ৪৪৫, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃ: ৪৮৩, মাতালেবাস সউল, পৃ: ১১, সিরাতে হালবিয়া, খণ্ড ১, পৃ: ১৬৫, সিবতে ইবনে আল জাওজি, পৃ: ৭, ফুসুল আল মোহিম্মা, পৃ: ১৪, কেফায়াতুত তালেব, পৃ: ২৬১, ৪০৬,

নুরুল আবসার, পৃ: ৭৫, নুজহাত আল্ মাজালিস, খণ্ড ২, পৃ: ২০৪, ইয়াযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খণ্ড ২, পৃ: ৪৮৭,।

"সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা বিধ্বস্ত হয়েছে মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসশীল।"

হযরত আলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি নবী (সাঃ) এর সঙ্গে কা'বাগৃহে প্রবেশ করলাম। নবী (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন, আলী বসে পড়। আমি বসে পড়লাম তখন নবী (সাঃ) আমার কাঁধের উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমাকে মূর্তিগুলোর দিকে উঠাও। আমি উত্তোলন করলাম, যখন নবী (সাঃ) আমার দুর্বলতা অনুভব করলেন, তখন আমাকে বললেন, আলী বসে পড়। নবী (সাঃ) আমার কাঁধ হতে নামলেন এবং স্বয়ং বসে পড়লেন। আর আমাকে আদেশ করলেন, "ইয়া আলী, আমার কাঁধের উপর উঠ," আমি উনার কাঁধের উপর উঠলাম, রাসূল (সাঃ) আমাকে এতদূর উপরে উঠালেন যেন, আমার মনে হচ্ছিল আমি চাইলে আসমান ধরতে পারবো। অতঃপর, আমি সবচাইতে বড় মূর্তি নিয়ে নিক্ষেপ করলাম। মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলে, নবী (সাঃ) বললেন, "সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা বিধ্বস্ত হয়েছে মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসশীল। (বনী ইসরাঈল-৮১) "

সূত্র, হযরত আলী-এর জীবনী (শিরিন পাব.), পৃ: ২৩, হযরত আলী, পৃ: ৫০ (এমদাদীয়া) আশারা মোবাশশারা, পৃ: ১৬১ (এমদাদীয়া) কাতেবীনে ওহী (ইফা.), পৃ: ১৬৩, হযরত আলী, পৃ: ৬৪ (১৯৯৭,ইং তাজ কোং) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃ: ৭৯, ইয়াযাতুল খিফা, খণ্ড ২, পৃ: ৪৯০ (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) তারিখে খামিস, খণ্ড ২, পৃ: ৯২, কেফাইয়াতুল মোওয়াহেদ্দীন, খণ্ড ২, পৃ: ৩৮৪, শাওয়াহেদুত তানজিল, খণ্ড ১, পৃ: ৫৫০, মাদারেজুন নাবুয়াহ, খণ্ড ২, পৃ: ৪০৪, রওজাতুস সাফা খণ্ড ২, পৃ: ১৪৭

ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ: ৪০৯, আরজাহুল মাতালেব, পৃ: ৬৭৫-৬৭৭।

ইয়া আলী, তোমার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কারো মধ্যে নেই।

একবার হুজুর আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (আঃ) কে বললেন, "ইয়া আলী, তোমার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কারো মধ্যে নেই এমনকি আমার মধ্যেও নেই।" তখন হযরত আলী (আঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আপনি কি বলছেন? আমার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা আপনার মধ্যেও নেই? আপনি হলেন "সাইয়্যেদুল মুরসালীন," তখন নবী (সাঃ) বললেন, "তোমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেমন তোমার পবিত্র জন্ম পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরে হয়েছে, আমার হয়নি, তোমার শ্বশুর সাইয়্যেদুল মুরসালীন আমার নয়, তোমার শাশুড়ী হযরত খাদীজাতুল কোবরা সিদ্দীকা, আমার নয়, তোমার স্ত্রী খাতুনে জান্নাত আমার নয় এবং তোমার দুই পুত্র, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সাবাবে আহলে জান্নাহ, জান্নাতের যুবকদের সরদার, আমার নয়, তাই তুমি কত ভাগ্যবান ও মর্যাদাবান? তবে, তোমরা সবাই আমা থেকে আর আমি তোমাদের থেকে।"

সূত্র, নবীর (সাঃ) বংশধর, (মোনা খানম, আঞ্জুমানে কাদেরীয়া চট্টগ্রাম), পৃ: ২২। আরজাহুল মাতালেব, পৃ: ৪১২, ইয়া মাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ: ৪৬, শাওয়াহেদুত তানজিল, খণ্ড ১, পৃ: ৪১৪, নুরুল আবসার, পৃ: ১০২, জাখায়েরুল উকবা, পৃ: ৩০, আর রিয়াদুন নাদরাই, খণ্ড ৩, পৃ: ১৭২, নায়মুল দুরারিস সামতাইন, খণ্ড ১, পৃ: ১১৩।

আলীর ঘরের দরজা ব্যতীত সকল সাহাবাদের দরজা বন্ধ করবার আদেশ হলো।

রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করান এবং উহারই সংলগ্ন নিজের ও হযরত আলীর ঘর তৈয়ার করান ও উভয়ের ঘরের যাতায়াতের পথ মসজিদের ভিতর দিয়ে রাখেন এবং বলেন, "ইয়া আলী গোসল ফরজ হলে আমি এবং তুমি ব্যতীত অপর কেহ এই মসজিদে আসবে না (অবস্থান করবে না)", কিন্তু নবী (সাঃ) এর সাহাবারাও নিজ ইচ্ছায় নিজেদের ঘরের দরজা মসজিদের দিকে রাখেন? কিন্তু, আল্লাহ্র আদেশে কেবল "নবী (সাঃ) ও হযরত আলীর ঘরের দরজা ব্যতীত সকল সাহাবাদের দরজা বন্ধ করবার আদেশ হয়।"

সূত্র, জামে আত তিরমিজী, খণ্ড ৬, হাঃ ৩৬৬৫, ৩৬৬৯ (ই, সেন্টার) মেশকাত, খণ্ড ১১, হাঃ ৫৮৩৯, ৫৮৪৬ (এমদাদীয়া), কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২১৩, (ই,ফাঃ), আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৭ (এমদাদীয়া) আল মুরাজায়াত, পৃঃ ১৭৭, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭৫, খণ্ড ২, পৃঃ ২৬, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৬৯; খাসাইসে নেসাঈ, পৃঃ ১৩, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১১৭, সিবতে ইবনে জাওজি, তাযকিরা, পৃঃ ২৪, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৬৮৩-৭০২, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ৭৬, তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ৭, পৃঃ ২০৫, তারিখে ইবনে কাসীর খণ্ড ৭, পৃঃ ৩৪২, কানজুল উম্মাল, ৬, পৃঃ ৪৮, হাঃ ৬১৫, আর রিয়াদ (তাবায়ী), খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫১, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৮৩, তারিখে খোলফা, পৃঃ ১১৬, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৮৭ (মিশর) ইরসাদে বারী ,খন্ড ৬, পৃঃ ৮১, ইযাযাতুল খিফা, খন্ড ২, পৃঃ ৫০৯, ৫১৬, ২১৬, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) ।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেন, হযরত আলীকে তিনটি বস্তু দান করা হয়েছে, এর একটিও যদি আমার হত, তবে আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ (লাল চুলের উষ্ট্র) হতে তা আমার নিকট উত্তম বলে পরিগণিত হত। "তাঁর স্ত্রী রাসূলের কন্যা", তাঁর ঘর, রাসূলের ঘর ও মসজিদ সংলগ্ন ছিল। সেখানে "রাসূলের (সাঃ) জন্য যা হালাল ছিল তা তাঁর জন্যও হালাল ছিল এবং খায়বারের দিন রাসূল (সাঃ) তাঁর হাতেই পতাকা তুলে দেন।" অন্য একটি সহীহ হাদীস মতে, একদিন সাইদ ইবনে মালিক হযরত আলীর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর চাচা ইবনে আব্বাস ও সাহাবাদের মসজিদ হতে বাইরে যাবার নির্দেশ দিলে, তাঁর চাচা ইবনে আব্বাস বললেন; আমাদের বের হতে বলছ অথচ আলীকে কাছে রেখেছ? রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমি তোমাদের বের হতে বা তাঁকে (আলীকে) থাকার নির্দেশ দেই নি, বরং "আল্লাহ্ তোমাদের বাইরে যেতে ও আলীকে এখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" সূত্র, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১১৭, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৬৯, খণ্ড ৫, পৃঃ ২৬।

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "ইয়া আলী! তুমি ও আমি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে বৈধ নয় অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা।" সূত্র, সাওয়ায়েক আল মোহরেকা (ইবনে হাজার আসকালানী), পৃঃ ৪৭৩, হাঃ ১৩।

বাসসার অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে নবী (সাঃ) হযরত আলীর হাত ধরে বললেন, "হযরত মুসা আল্লাহ্‌র নিকট চেয়েছিলেন যেন হযরত হারুনের মাধ্যমে তাঁর মসজিদকে পবিত্র রাখেন এবং "আমি তাঁর নিকট আলীর মাধ্যমে আমার মসজিদ পবিত্র রাখার প্রার্থনা করছি।" তারপর একজনকে হযরত আবু বকরের নিকট পাঠালেন, যেন তিনি মসজিদের দিকে তার ঘরের উন্মুক্ত দরজাটি বন্ধ করে

দেন। অতঃপর একে একে হযরত ওমর, হযরত আব্বাসসহ সকল সাহাবার নিকট এ নির্দেশ পাঠালেন। অতঃপর তিনি বললেন “আমি তোমাদের দরজাসমূহ বন্ধ করি নি, আর আলীর দরজাও উন্মুক্ত রাখি নি, বরং আল্লাহ্ই আলীর দরজা উন্মুক্ত করেছেন ও তোমাদের দরজাসমূহ বন্ধ করেছেন।” সূত্র, কানজুল উম্মাল, (মুত্তকী হিন্দি), খণ্ড ৬, পৃঃ ৪৮, হাঃ ৬১৫।

নবী (সাঃ) এর পরে হযরত আলীই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মানব এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, এবং তিনিই নবী (সাঃ)-এর পর তাঁর সঠিক উত্তরসূরী এটাও প্রমাণিত হল।

নবম হিজরিতে সূরা তওবার আয়াতের প্রচার, "যে আমার আ’ল (আমার বংশ) থেকে, তাঁকেই প্রচার করতে হবে।"

মুসনাদে হাম্বল বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরিতে রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকরকে সূরা তওবার কয়েকটি আয়াত প্রদান করে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ দেন। পরে, হযরত আলীকে নিজের বাহন দিয়ে হযরত আবু বকরের পশ্চাতে প্রেরণ করে বলেন, "যেখানেই আবু বকরের সাক্ষাৎ পাও, তার হতে তা গ্রহণ করে নিজে পাঠ কর;" হযরত আলী জুহফাতে, হযরত আবু বকরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার নিকট হতে আয়াতগুলো গ্রহণ করেন এবং তিনি তা প্রচার করেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, হযরত আবু বকর মদীনায় নবীর নিকট ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন, "আমার ব্যাপারে কিছু নাযিল হয়েছে কি?"

রাসূল (সাঃ) বললেন "না, তবে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন এ দায়িত্ব যেন স্বয়ং আমি পালন করি অথবা সে, যে আমার আ’ল থেকে (আমার বংশ) তাঁকে প্রচার করতে হবে।"

সূত্র: তাফসীরে কানজুল ঈমান, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭ (আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলভী) তাফসীরে নূরুল কোরআন, খঃ ১০, পৃঃ ১০৬, (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) সীরাতে ইবনে হিশাম, খঃ ৪, পৃঃ ২০০-২০৪ (ই. ফাঃ) সহীহ্ বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪২৯৪, ৪২৯৫, (আধুনিক) কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ১৫৫ (ই.ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৬২ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ৬৭ (তাজ কোং) হযরত আলী, পৃঃ ৯৮ (মাওঃ মুজিবুর রহমান) শেখ আব্দুর রহীম গ্রন্থাবলী খঃ ১, পৃঃ ৩০৪ (বাংলা একাডেমী) তাফসীরে শওকানী, খঃ ২, পৃঃ ৩১৯ (মিশর) তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ ৩, পৃঃ ২০৮ তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ ২, পৃঃ ৩৩৩ (মিশর) তাফসীরে আলুসি, খঃ ৩, পৃঃ ২৬৮, (মিশর) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৫, পৃঃ ৩৮, খঃ ৭, পৃঃ ৩৫৭ (মিশর) মাতালেবাস সাউল, পৃঃ ১৭, রিয়াজুন নাজরাহ, পৃঃ ১৪৭, যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ ৬৯, খাসাইসুল আলাভী, পৃঃ ১৪, ইসাবা (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ ২, পৃঃ ৫০৯, জামেউল বয়ান (তাবারী), খঃ ১০, পৃঃ ৪১, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১৯, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খঃ ৭, পৃঃ ২৯, কিফায়াতুত তালেব, পৃঃ ১২৫ মুসনাদে হাম্বল খঃ ১, পৃঃ ১৫১, খঃ ৩, পৃঃ ২৮৩, খঃ ৪, পৃঃ ১৬৪, কানজুল উম্মাল, খঃ ১, পৃঃ ২৪৬, খঃ ৬, পৃঃ ১৫৪, বাইহাকী, পৃঃ ২২৪, আরজাহুল মাতালেব পৃঃ ৮১৪-১৮ (উর্দু) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৩৩৮ (উর্দু) ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ ১, পৃঃ ৪০৯ (উর্দু)।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

হযরত নবী (সাঃ) পবিত্র কা'বা ঘরের পবিত্রতা রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশে এমন কাউকে প্রচারের দায়িত্ব দিতে হবে, যে এক মুহূর্তের জন্যেও মূর্তির সামনে মাথা নত করেনি। পবিত্র কা'বাঘরের পবিত্রতার ঘোষণা পবিত্র ব্যক্তির মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

এটাই আল্লাহ্ আমাদের শিক্ষা দিলেন। আর এটাও প্রমাণ করলেন যে, নবী (সাঃ) এর সময় পবিত্র কোরআনের কয়েকটি মাত্র আয়াত প্রচার করার যোগ্যতা যে রাখে না, সে নবীর পর সম্পূর্ণ কোরআন প্রচারের দায়িত্ব কিভাবে পাবে?"

সমস্ত সাহাবারাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র হযরত আলী বাল্যকালেও মূর্তিপূজা করেননি (কারণ, তাঁর লালন পালন সাইয়্যেদুল মুরসালীনের হাতে এবং তাঁর প্রথম আহার রিসালাতের লালা মুবারক)। সূত্র, হযরত আলী, পৃঃ, ১১ (এমদাদীয়) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৬৬৭।

আমি জ্ঞানের নগরী আলী (আঃ) সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার।

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন "আমি জ্ঞানের নগরী আলী সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার, যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে সে যেন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর লিসান গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই হাদীসের বহুবিধ সূত্র রয়েছে, হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর রায় পেশ করতে গিয়ে বলেন এ হাদীসটি বিশুদ্ধ।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আব্দুল হোসাইন আহমদ আল আমীনী আন নাজাফী, তার আল গাদীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একটি তালিকা দিয়েছেন যাদের সংখ্যা হচ্ছে, ১৪৩ জন। সূত্র, আল গাদীর, খঃ, ৬, পৃঃ, ৬১-৭৭।

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আলী আমার ভাই এবং সে আমা থেকেই এবং আমিও আলী থেকেই আর সে আমার জ্ঞানের দরজা এবং আমার উত্তরসূরী।"

সূত্র, আল গাদীর, খঃ, ৬, পৃঃ, ৬১, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ১৮৭, লিসানুল মিজান, খঃ, ২, পৃঃ, ৪১৩।

তাবরানী তার কাবীর গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী তার জামেউস সগীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম নিশাবুরী তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে মানাকিবে আলী অধ্যায়ে দু'টি সহীহ্ সনদে একটি ইবনে আব্বাস হতে ও অপরটি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক মাগরেবী কায়রোর অধিবাসী ও আলেম।

"আমি জ্ঞানের নগরী আলী সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার, যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে সে যেন সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে।"

এই হাদীসটি যে বিশুদ্ধ তা প্রমাণের জন্য ফাতহুল মূলকিল আলী বি সিহাহ্ বাবি মাদীজাতুল ইলমী আলী নামক, একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন গবেষকদের জন্য এ মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অধ্যয়ন করলেই তারা বুঝতে পারবেন যে, ইমাম আলীর বিদ্বেষীরা এ

হাদীসটিকে আরবের প্রচলিত একটি প্রবাদ বলে প্রচারের যে অপচেষ্টা চালিয়েছে তা কতটা অসার।

সূত্র: সহীহ্ মুসলিম, খঃ ১, পৃঃ ২৩ (মোহাম্মাদীয়া লাইব্রেরী) কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২০৭ (ই.ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯২, (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ১৫ (এমদাদীয়া) মুস্তাদরাক হাকেম খঃ ৩, পৃঃ ১২৬, উসদুল গাবা, খঃ ৪, পৃঃ ২২ (মিশর), আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খঃ ৭, পৃঃ ৩৫৭, খঃ ৮, পৃঃ ৩৫০, (মিশর) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৮৩। আস সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ৩৭, (মিশর) তারিখে কামিল, খঃ ৪, পৃঃ ২২, তাফসীরে তাবারী, খঃ ৩, পৃঃ ১৭১, (মিশর) মাকতালুল হুসাইন, খঃ ১, পৃঃ ৪৩, খাতিব খাওয়ারেজমি মানাকেব, পৃঃ ৪৯, আলিফ বাস, খঃ ১, পৃঃ ২২২ (মোঃ আন্দোলুসি) হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ ১, পৃঃ ৫৫, শাওয়াহেদুত তানযিল, খঃ ২, পৃঃ ৩৫৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১৮৪, তাসকিরাতুল খাওয়াজ, পৃঃ ৫৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ ৯৮, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ ৬, পৃঃ ৩৭৯ (মিশর) যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ ৭৭ (মিশর) জামেউস সগীর, খঃ ১, পৃঃ ৩৭৪ (মিশর) উমদাতুল কারী ফি শারাহ্ সহীহ্ বুখারী, খঃ ৭, পৃঃ ৬০১, (মিশর), কানজুল উম্মাল, খঃ ১৫, পৃঃ ১৩০, মিরকাত, খঃ ১১, পৃঃ ৩৪৬, ইস্তিয়াব, খঃ ২, পৃঃ ৪৬১, খঃ ৩, পৃঃ ১১০২, (মিশর), রেয়াজুন নাজরা, খঃ ১, পৃঃ ১২৯, ফাইজুল কাদীর, খঃ ৩, পৃঃ ৪৭ তাযকিরাতুল হুফফাজ, খঃ ৪, পৃঃ ৪৭, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ ৯, পৃঃ ১১৪, (মিশর) হায়াতুল হায়ওয়ান, খঃ ১, পৃঃ ৫৫, তাহজিবুত তাহজিব, খঃ ৭, পৃঃ ৩৩৭, খঃ ৬, পৃঃ ৩২০, কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, পৃঃ ১৫৬, মাতালেবাস সাউল, পৃঃ ২২, ফুসুলুল মহিম্মা, পৃঃ ১৮, ইসাফুর রাগেবিন পৃঃ ১৫৬, মুয়াদ্দাতুল কুরবা পৃঃ ৩০, তারিখে বাগদাদ, খঃ ২, পৃঃ ৩৩৭, খঃ ৭, পৃঃ ১৭০, খঃ ১১, পৃঃ

৪৮ (মিশর) লিসান আল মিজান, খঃ ২, পৃঃ ১২২ তারিখ আল খুলফা, পৃঃ ১৭০ (মিশর) সিরাজুল মুনির জামেউস সগীর, খঃ ৩, পৃঃ ৫৩, ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ ২, পৃঃ ৫০৯।

হযরত আলী **(**আঃ**)** হিকমতের মহভাণ্ডার।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি হিকমতের মহভাণ্ডার এবং আলী উহার দরজা। যদি কেউ হিকমত অর্জন করতে চায় তবে তাকে এ দরজা দিয়েই আসতে হবে।"

সূত্র**:** হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ ১, পৃঃ ৬৪ (মিশর) মাসাবিহ আল সুন্নাহ খঃ ২, পৃঃ ২৭৫ (মিশর) তারিখে বাগদাদ, খঃ ১১, পৃঃ ২০৪ (মিশর) কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, পৃঃ ৪০১, রিয়াজ আননাদিরা, খঃ ২, পৃঃ ১৯৩ (মিশর) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১৮৬।

হযরত আলী **(**আঃ**)** রয়েছে সত্যের সাথে এবং সত্য রয়েছে আলীর সাথে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, যে, "আলী রয়েছে সত্যের সাথে এবং সত্য রয়েছে আলীর সাথে ইয়া আল্লাহ্**!** সত্যকে সেই দিকে ফিরিয়ে দাও যেদিকে আলী যায়।"

সূত্র, ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) খঃ, ১, পৃঃ, ১৫৮, ৫৪৮,। আল খাতীব আল খাওয়ারিজমী আল মানাকিবে, পৃঃ, ৫৬, তারিখে বাগদাদ, খঃ, ১৪, পৃঃ, ৩২১, কেফায়াতুত তালেব, অধ্যায়, ৪৪, ইমামত ওর সিয়াসাত, খঃ, ১, পৃঃ, ১১১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৯১, তাফসীরে কাবির, খঃ, ১, পৃঃ, ১১১, (মিশর) জামেউস সাগির, খঃ, ২, পৃঃ, ৭৪, ৭৫,

১৪০, তারিখুল খোলফা, পৃঃ, ১১৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ৯৮২।

হযরত আলী **(**আঃ**)** সব সময় সত্যের সাথে আছে আর সত্য সব সময় আলীর সাথে আছে।

নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "আলী সব সময় সত্যের সাথে আছে আর সত্য সব সময় আলীর সাথে আছে। উভয়ে কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে আমার কাছে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"

সূত্র, মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ, ৩, পৃঃ, ১২৪, জামেউন উসুল ইবনে হাজার আসকালানী, খঃ, ৯, পৃঃ, ৪২০ (মিশর) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৯১, (ইস্তাম্বুল) আল মানাকিব, পৃঃ, ২৮, ফাইজুল কাদির, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৫৮, খাসায়সুল উলেমা (সিবতে ইবনে জাওজি), পৃঃ, ২০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ, ৭, পৃঃ, ৩৬।

হযরত আলী **(**আঃ**)** কোরআনের সাথে এবং কোরআন হযরত আলীর সাথে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আলী কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে, উভয়ে হাউজে কাউসারে আমার সামনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"

সূত্র, হযরত আলী (এমদাদীয়া), পৃঃ, ১৭ তাকমীলুল ঈমান, পৃঃ, ৯৭, (শায়খ আব্দুল হক দেহলভী) (ই.ফাঃ) ইযালাতুল খিফা, খঃ, ২, পৃঃ, ৫৪৭, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ, ১৯৪, (উর্দু), কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ, ২৫২, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ, ৯, পৃঃ, ১৩৪ (আবু বকর হাইতামী, কায়রো) আস সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃঃ, ৭৪,

(মিশর) তারিখুল খোলফা, পৃঃ, ৬৭, (মিশর) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৯০, (ইস্তাম্বুল), পৃঃ, ১৫০ (উর্দু) নুরুল আবসার, পৃঃ, ৭৩ (আল্লামা শাবলাঞ্জী) (মিশর)।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার ওফাতের পরপরই বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেবে এ সময় তোমরা আলী ইবনে আবু তালিবকে অনুসরণ করো। কারণ, শেষ বিচারের দিন সেই হবে প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে দেখবে এবং আমার সাথে করমর্দন করবে; 'সেই হচ্ছে সিদ্দীকে আকবার' (আলী ইবনে আবু তালিব), আমার উম্মতের.

মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং সে হলো মোমেনগণের ইয়াসুব আর সম্পদ হলো মোনাফেকগণের ইয়াসুব।"

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খঃ, ১২, পৃঃ, ২১২। উসদুল গাবা, খঃ, ৫, পৃঃ, ২৮৭, তারিখ আশ শাম, খঃ, ৯, পৃঃ, ৭৪, ৭৮, আস সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৮০ (মিশর) যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ, ৫৬, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ, ৬২, ৮২, ২০১, ২৯১ (ইস্তাম্বুল), শারাহ নাহজ আল বালাঘা, খঃ, ১৩, পৃঃ, ২২৮ (ইবনে আবিল হাদিদ) (মিশর), ফয়েজ আল কাদীর ফি শারাহ আল জামি আস সাগির, খঃ, ৪, পৃঃ, ৩৫৮। আল ইসাবাহ, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৭১ আল ইস্তিয়াব, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৭০।

"আমরা সাহাবাগণ হযরত আলীর (আঃ) প্রতি ঘৃণা দ্বারা মুনাফেক খুঁজে বের করতাম।"

হযরত আলী বলেন, "আমার এ তরবারি দ্বারা কোন ঈমানদারের নাকে যদি আমি আঘাতও করি তবু সে আমাকে ঘৃণা করবে না। আবার, আমার ভালবাসার জন্য যদি আমি মোনাফেকের সামনে দুনিয়ার সকল সম্পদ স্তূপীকৃত করে দেই

তবুও সে আমাকে ভালবাসবে না।” এর কারণ হলো পরম প্রিয় রাসূল (সাঃ) তাঁর নিজ পবিত্র মুখে বলেছেন যে, “ইয়া আলী ঈমানদারগণ কখনো তোমাকে ঘৃণা করবে না এবং মুনাফেকগণ কখনো তোমাকে ভালবাসবে না।” সূত্র, নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ ৪১২।

এ হাদীসটি সহীহ্ বলে সর্বসমক্ষে গৃহীত এবং এতে কেউ কোনদিন কোন সংশয় প্রকাশ করেনি। এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইমরান ইবনে হুসাইন, উম্মুল মোমিনিন উম্মে সালমা (রাঃ) অন্যান্য অনেক হতে বর্ণিত হয়েছে। আমিরুল মোমিনিন নিজেও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, “যিনি বীজ হতে চারা গজান ও আত্মা সৃষ্টি করেন। সেই আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রকৃত মোমিন ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফেকগণ ছাড়া কেউ আমার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করবে না।” রাসূলের (সাঃ) সাহাবাগণ হযরত আলীর প্রতি ভালবাসা অথবা ঘৃণা দ্বারা কোন লোকের ঈমান ও নিফাক পরখ করতেন।

আবুজার গিফারী, আবু সাইদ খুদরী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, “আমরা সাহাবাগণ হযরত আলীর প্রতি ঘৃণা দ্বারা মুনাফেক খুঁজে বের করতাম।”

সূত্র, সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ১, হাঃ, ১৪৪, (ই.ফাঃ), জামে আত তিরমিযী, খঃ, ৬, হাঃ, ৩৬৫৫, ৩৬৫৪ (ই. সেন্টার) মিশকাত, খঃ, ১১, হাঃ, ৫৮৪১ (এমদাদীয়া), কাতেবীনে ওহী, পৃঃ, ২১২ (ই.ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ, ১৯৭ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ, ১৪ (এমদাদীয়া) সহীহ্ মুসলিম, খঃ, ১, পৃঃ, ৬০, (মিশর), সহীহ্ তিরমিযি, খঃ, ৫,

পৃঃ, ৬৩৫ (মিশর), ইবনে মাজাহ্ খঃ, ১, পৃঃ, ৫৫ (মিশর) সুনানে নাসাঈ খঃ, ৮, পৃঃ, ১১৫, (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ, ১, পৃঃ, ৮৪, ৯৫, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৯২ (মিশর) আল মুস্তাদরাক, খঃ, ৩, পৃঃ, ১২৯, (মিশর) হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৮৫, খঃ, ৬, পৃঃ, ২৯৪, (মিশর), জামেউল উসুল, খঃ, ৯, পৃঃ, ৪৭৩, (মিশর) আপনার ই-বুক তৈরির জন্য ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার (image_18f05d.png) টেক্সট নিচে দেওয়া হলো। আপনি এটি কপি করে নিতে পারেন:

মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃঃ ১০৩ (মিশর) ইবনে মাগাযেলী শাফায়ী, পৃঃ ১৯০, উসুদুল গাবা, খণ্ড ৪, পৃঃ ২৬, (মিশর) তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ২, পৃঃ ২৫৫, খণ্ড ৮, পৃঃ ৪১৭, খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৫৩, খণ্ড ১৪, পৃঃ ৪২৬, (মিশর) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩৫৪, তাফসীরে দুরে মানসুর, খণ্ড ৬, পৃঃ ৬৬-৬৭, জামেউল কাবীর (সুয়ূতী), পৃঃ ১৫২, ৪০৮, মাতালেবাস সাউল, পৃঃ ১৭, শারাহু নাহজুল বালাগাহ (ইবনে হানীদ), খণ্ড ১, পৃঃ ৩৬৭, ইসাবা (ইবনে হাজার), খণ্ড ২, পৃঃ ৫০৯, খাসাইস-ই-উলুবিয়া, পৃঃ ২৭, ইসতিয়াব (ইবনে আব্দুল বার), খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৭ শারাহু নাহজ আল বালাগাহ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৬৪ (ইবনে আবিল হাদীদ মুতাজেলী)। আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৪৮৮, ৮৬০। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৮৮-৮৭।

রাসূল (সাঃ) বারবার তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন যেন তারা আলীকে ভালবাসে এবং তিনি আলী সম্পর্কে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ নিষিদ্ধ করেছেন যেমন,

“যে আলীর সাথে হিংসা করলো, সে আমার (রাসূল (সাঃ)-এর) সাথে হিংসা করলো, আর যে আমার সাথে হিংসা করলো, সে কাফের।” সূত্র, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ২, পৃঃ ৬২৬।

রাসূল (সাঃ) এর চৌদ্দজন সাহাবী হতে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাঃ) বলেছেন, “যে আলীকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো, যে আমাকে ভালবাসলো সে আল্লাহকে ভালবাসলো, যে আল্লাহকে ভালবাসলো তিনি তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন। যে আলীকে ঘৃণা করলো সে আমাকে ঘৃণা করলো। যে আমাকে ঘৃণা করলো সে নিশ্চই আল্লাহকে ঘৃণা করলো, যে আল্লাহকে ঘৃণা করলো সে অবশ্যই দোযখবাসী হলো। যে আলীকে আঘাত দিলো সে আমাকেই আঘাত দিলো, যে আমাকে আঘাত দিলো নিশ্চই সে আল্লাহকে আঘাত দিল।” আর আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন:-

“নিশ্চয়ই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আঘাত দেয়, আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত দেন এবং তার জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” (আহযাব-৫৭)।

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১২, পৃঃ ২০২, খণ্ড ১৫, পৃঃ ৯৫, খণ্ড ১৭, পৃঃ ৭০। হিলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৬-৬৭ (মিশর) উসুদুল গাবা, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৮৩, আল ইসতিয়াব, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৯৬ (মিশর), মাজমা আজ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃঃ ১০৮, রিয়াজ আন নাদীরা, খণ্ড ২, পৃঃ ১৬৬ (তাবারী) ইবনে মাগাযেলী শাফায়ী মানাকবে, পৃঃ ১০৩, ১৯৬, ৩৮২।

রাসূল (সাঃ) বারবার তাঁর উম্মতকে বলেছেন, “আল্লাহর কসম যাঁর হস্তে আমার জীবন, যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতকে শত্রু মনে করবে সে জাহান্নামী।”

সূত্র, তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ২৭, পৃঃ ১৬৫, (মিশর), তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃঃ ২২, (মিশর)। সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১০৪, এহইয়াউল মাইয়াত, পৃঃ ৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৪১৮, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৫৫, ৫৯৯, তাফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বয়ান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৭, (মিশর)।

কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, "যাঁদের উপর দরূদ শরিফ না পড়লে, নামাজ কবুল হয় না," (আহযাব-৫৬) "যাঁদের অনুসরণ ও প্রাণাধিক ভালবাসা পবিত্র কোরআনে ফরজ করা হয়েছে," (শুরা-২৩) সেই পাক পবিত্র আহলে বাইত-এর প্রথম সদস্য হযরত আলীর (আঃ) সাথে নবীর পর, কতইনা জালিমের মত ব্যবহার করা হয়েছে, তা এখন পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো। ৪১ হিজরিতে আমির মুয়াবিয়া যখন কোরআন পরিপন্থী আইন রাজতন্ত্র কায়েম করলো, তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের ৭০ হাজারেরও অধিক মসজিদে জুম্মার খুতবায় হযরত আলী ও নবী (সাঃ) এর পবিত্র আহলে বাইত (আঃ) দের উপর অভিসম্পাত প্রদানের হুকুম কার্যকর করে, তাঁর আদেশটি ছিল এরূপ, "আল্লাহ্ কসম। কখনও আলীকে অভিসম্পাত দেওয়া বন্ধ হবে না, যতদিন শিশুগণ যুবকে এবং যুবকগণ বৃদ্ধে পরিণত না হয়। সারা দুনিয়ায় আলীর ফজিলত বর্ণনাকারী আর কেউ থাকবে না।" মুয়াবিয়া নিজে এবং তাঁর গভর্নররা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র রওজা মোবারকের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, তাঁর প্রিয় আহলে বাইতদের অভিসম্পাত দেওয়া হতো, হযরত আলীর সন্তানরা ও নিকটাত্মীয়রা তা শুনতে বাধ্য হতেন, আর নীরবে অশ্রুপাত করতেন।

কারণ, তারা নিরীহ (মাজলুম) ছিলেন। সহীহ মুসলিম ফাজায়েলে আলী অধ্যায়ে লেখা আছে যে, মুয়াবিয়া তার সমস্ত প্রদেশের গভর্নরদের উপর এ নির্দেশ জারি করে, যেন সকল

মসজিদের খতীবগণ মিম্বরে রাসূল (সাঃ) এর উপরে দাঁড়িয়ে থেকে আলীর উপর অভিসম্পাত করাকে যেন তাদের দায়িত্ব মনে করেন।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, "তিনি সেই আলী যিনি নবী (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ও সর্বপ্রথম নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদানকারী। আল্লাহ্ যাঁদেরকে পবিত্র কোরআনে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন (আহযাব-৩৩) এবং যাঁদের অনুসরণ ও প্রাণাধিক ভালোবাসা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, (শুরা-২৩) নামাজে নবীজির সাথে যাঁদের উপর দরুদ শরিফ ও সালাম না পাঠালে নামাজ কবুল হয় না, (আহযাব-৫৬) সেই আহলে বাইত (আঃ) দের অভিসম্পাতের প্রথা প্রচলন করে মুয়াবিয়া কি জঘন্য অপরাধ করেনি? প্রায় ৯০ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে মুসলিম জাহানের প্রতিটি মসজিদে আহলে বাইত (আঃ) ও আহলে বাইত-এর প্রধান সদস্য আলী (আঃ) কে অভিসম্পাতের প্রথা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, যখন ওমর বিন আব্দুল আজিজ-এর শাসনামল শুরু হলো, তখন তিনি এই জঘন্য পাপ ও বেঈমানী কর্মকাণ্ড রহিত করেন।" তখন নবী (সাঃ) এর আহলে বাইত (আঃ) বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চারিদিকে নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে হৈ চৈ এর রব তুললো।

"ওমর বিন আব্দুল আজিজ, সুন্নাত তরক করে দিলেন, সুন্নাত তরক করে দিলেন।"

অতঃপর, ওমর বিন আব্দুল আজিজ জুমার খুতবা থেকে মুয়াবিয়া র প্রতিষ্ঠিত অভিসম্পাতের অংশটি পরিবর্তন করে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি পাঠের আদেশ দেন।

“নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুবিচার এবং সৌজন্যের নির্দেশ দেন আর নির্দেশ দেন, নিকট আত্মীয়দের দান করার আর বারণ করেন অশ্লীল ঘৃণ্য কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরা, নাহল-৯০)

যে ব্যক্তি হযরত আলী **(**আঃ**)** কে গালি দিল**,** সে যেন হযরত নবী **(**সাঃ**)** কে গালি দিল।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আলী (আঃ) কে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল।” (আর যে নবী (সাঃ) কে গালি দিল, সে এবং তার সঙ্গীরা নিশ্চিত জাহান্নামী, যা আমরা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে পড়েছি, তাই নয় কি?)।

সূত্র, মেশকাত, খণ্ড ১১, হাঃ ৫৮৪২, ইয়াযাতুল খিফা, খণ্ড ২, পৃঃ ৫০৪ মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৪৪, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩২৩, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩০। সুনানে নাসাঈ, খণ্ড ৫, পৃঃ ১৩৩, মাজমা আজ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃঃ ১৩০।

আবুজার গিফারী, আবু সাইদ খুদরী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, “আমরা সাহাবাগণ হযরত আলীর প্রতি ঘৃণা দ্বারা মুনাফেক (সাহাবা) খুঁজে বের করতাম।”

সূত্র, সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, হাঃ ১৪৪, (ই,ফাঃ), জামে আত তিরমিজী, খণ্ড ৬, হাঃ ৩৬৫৫, ৩৬৫৪ (ই, সেন্টার) মিশকাত, খণ্ড ১১, হাঃ ৫৮৪১ (এমদাদীয়া), কাতেবীনে ওহী,

পৃঃ ২১২ (ই,ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৭ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ১৪ (এমদাদীয়া)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতে তার কপালে লেখা থাকবে, সে আল্লাহ্ পাকের রহমত হতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কাফের হয়ে মারা যায়। যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদের শত্রুতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেস্তের সুগন্ধও পাবে না।"

সূত্র, তাফসীরে আল কাশশাফ ওয়াল বয়ান, খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৭, (মিশর), তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ২৭, পৃঃ ১৬৫, (মিশর), তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃঃ ২২, (মিশর), এহইয়াউল মাইয়াত পৃঃ ৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৪১৮, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১০৪, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৫৫, ৫৯৯।

এখন সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের জন্য সেই সূত্র উল্লেখ করছি, যেখানে স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, হযরত আলী (আঃ) কে অভিসম্পাত দেওয়া হতো।

সূত্র, সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৭, হাঃ ৬০৮১, ৬০৮৯ (ই, সেন্টার) জামে আত তিরমিজী, খণ্ড ৬, হাঃ ৩৬৬২ (ই, সেন্টার) খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ১৪২, ১৪৯, মাসিক জিজ্ঞাসা, পৃঃ ১৩-১৭ (আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ৯৫) কারবালা ও মুয়াবিয়া (সৈয়দ গোলাম মোরশেদ), পৃঃ ৪৬-৪৮ খেলাফতের ইতিহাস, পৃঃ ১০৯, (ইফাঃ) কারবালা, পৃঃ ২১৪ (মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ) আরব জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১২২, ১৬৮, (বাংলা একাডেমী) ইসলামের ইতিহাস (কে আলী) পৃঃ ২৮১, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৭, ১৪৯ (সৈয়দ মাহমুদুল হাসান) শাহাদাতে আহলে বাইয়ত, পৃঃ ১৪০-১৪৬ (খানকাহ আবুল উলাইয়াহ) আল

বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩৪১, খণ্ড ৮, পৃঃ ৫০, ৫৫, তারিখে তাবারী, খণ্ড ৪, পৃঃ ১২২, ১৯০, ২০৭, খণ্ড ৫, পৃঃ ২৫৩, ইমাম যাহাবী ইবনে ইবর, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৮, আল কামিল, খণ্ড ৩, পৃঃ ২০৩, ২৪২, জামেউস সিরাত, পৃঃ ৩৬৬ (ইমাম ইবনে হাযম) তাতহিরুল জিনান ওয়াল লিসান (ইবনে হাজার মাক্কি), পৃঃ ৭৪ তারিখুল মাযহাবিল ইসলামিয়া, পৃঃ ৩৮, আল মুখতার ফি আখবারিল বাশার, পৃঃ ৯৮, আত তাকরীর লিত তিরমিজি, পৃঃ ১৯ (মাওঃ মাহমুদুল হাসান) তারিখে ইসলাম, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩০ (মাওঃ শাহ মহিউদ্দিন নদভী) ইবনে খালদুন, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০ আল ইসতিয়াব, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫, ইবনুল আসির, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৫৪, মুয়াদাতুল কুরবা, পৃঃ ৪৮। ইযাযাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খণ্ড ২, পৃঃ ৫০, ৩০৬, ৫০৫, ৫০৮।

খন্দকের দিন হযরত আলীর **(**আঃ**)** একটি আঘাতের মর্যাদা আমার উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের ইবাদতের চাইতে উত্তম।

খন্দকের যুদ্ধে নবী (সাঃ) হযরত আলীর জন্য প্রার্থনা করেন এবং এ বিখ্যাত উক্তিটি করেন।

"সমগ্র ঈমান (কুল্লে ঈমান) আলী, সমগ্র কুফরের মুখোমুখি হয়েছে।" কারণ হচ্ছে, হযরত আলী (আঃ) যদি পরাজিত হন, প্রকৃত পক্ষে ইসলাম ও ঈমান পরাজয় বরণ করবে। আর যদি ওমর ইবনে আবদুকে হত্যা করেন, তবে সমগ্র কুফর পরাজয় বরণ করবে। এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) বলেন, "খন্দকের দিন আলীর একটি আঘাতের মর্যাদা মানব ও জ্বীন উভয় জাতির ইবাদতের চাইতে উত্তম।" আরেক ভাবে বলেন, "খন্দকের দিন আলীর একটি আঘাতের মর্যাদা আমার উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের ইবাদতের চাইতে উত্তম।" শত্রুর উপর হযরত

আলীর একটি আঘাতের এতখানি মূল্য কেন, সে বিষয়টিও পরিষ্কার। কেননা, হযরত আলীর এ আঘাত যদি সেদিন না হত, তাহলে কুফরী শক্তি জয়লাভ করত। পরিণামে ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেত। অন্যদের ইবাদত বন্দেগী করার অবকাশ তখন কিভাবে থাকত?

সূত্র, হযরত আলী, পৃঃ ৫৬ (তাজ কোং) কিতাবে মুস্তায়াফেক (আল্লামা ইয়াক্কীন), পৃঃ ৬১৭, (ইস্তাম্বুল) নেয়ামাতুল উল দেরায়াতিল উসুল পৃঃ ১১৪, (ফখরুদ্দীন রাজী) সাবয়েল মাকাসিদ (ইমাম তাবারানী), খণ্ড ২, পৃঃ ২০০, ইয়ানাবিউল মুয়াদাত, পৃঃ ৯৫, ১৩৭, (আল্লামা কান্দুযী)। (ইস্তাম্বুল) তাজহীদুল ইয়াহিন, পৃঃ ৪০৭ (আল্লামা মওলভী আদ দেহলভী) তারিখে আলে মুহাম্মদ, পৃঃ ৫৭, (আল্লামা বেহজাত আফিন্দি) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৩২২, ৭৯৬, (ওবাইদুল্লাহ ওমরিতসারি) মাদারেজুন নাবুয়াত, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭৩, (মুহাদ্দিস দেহলভী) (ভারত)।

আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি যেমন মুসার কাছে হারুনের মর্যাদা।

রাসূল (সাঃ) তাবুক অভিযানে বের হলেন। হযরত আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। আলী বললেন "আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "তুমি কি ওতে সন্তুষ্ট নও যে আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি যেমন মুসার কাছে হারুনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে আমার পরে আর কোন নবী নেই।"

সূত্র, সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ৪, হাঃ ৪০৬৮, (আধুঃ) সহীহ আল বুখারী, খণ্ড ৬, হাঃ ৩৮৬৮, ৩৪৩৩ (ই,ফাঃ) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৭, হাঃ ৬০৪০, ৬০৪২, (ই, সেন্টার) কাতেবীনে

ওহী, পৃঃ ১৬৪, (ই,ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৬ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ৫২, ৫৩ (এমদাদীয়া) সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৪, (মিশর) সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৬ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল খণ্ড ১, পৃঃ ৯৮, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩১, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৬, হাঃ ৬০২৯, ৬০৩২, খাসায়েসুল আলাভীয়া, পৃঃ ১৯, ইসাবা (ইবনে হাজার), খণ্ড ২, পৃঃ ৫০৭, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ৩৩, ৩৪, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৯, তারিখুল খোলফা, পৃঃ ৬৫, ইকদুল ফারিদ, খণ্ড ২, পৃঃ ১৯৪ নুরুল আবসার, পৃঃ ৬৮, ফুসুলুল মোহেম্মাহ, পৃঃ ২৩, সিরাতুল হালবিয়া, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৯, আল মুরাজায়াত, পৃঃ ১৬৭।

হযরত আলী **(**আঃ**)** মোমেনদের সরদার**,** মোত্তাকীদের ইমাম**,** উজ্জ্বল চেহারা ও হাতওয়ালাদের শায়খ।

নবী (সাঃ) হযরত আলীর কাঁধে হাত রেখে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করলেন, "এই আলী সৎ কর্মশীলদের ইমাম অন্যায়কারীদের হন্তারক। যে তাঁকে সাহায্য করবে, সে সাফল্য লাভ করবে এবং যে তাঁকে হীন করার চেষ্টা করবে সে নিজেই হীন হবে।" এবং নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "আলী সম্পর্কে আমার প্রতি মিরাজে আল্লাহ্ তিনটি উপাধি শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় সে মোমেনদের সরদার, মোত্তাকীদের ইমাম, উজ্জ্বল চেহারা ও হাতওয়ালাদের শায়খ।"

সূত্র, কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২১৩, (ই,ফাঃ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৭, (এমদাদীয়া) মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩৮, ১৩৯ কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৬, হাঃ ১৬২৭, ২৫২৭, ২৬২৮, শারাহু নাহজু আল বালাগাহ, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫০, (ইবনে হানীদ)।

নবী (সাঃ) বলেছেন "হে আমার আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি চাও? তোমাদের আমি এমন বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেব, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ ও বিপথগামী হবে না সেটি হলো, আলী। আমাকে তোমরা যেরূপ ভালবাস, তাঁকেও সেরূপ ভালবাসো। আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা কর, তাঁকেও সেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান কোরো এবং আমি তোমাদের যা বলছি তা আল্লাহ্ জিবরাইলের মাধ্যমে আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৬, হাঃ ২৬২৮ শারাহু নাহজু আল বালাগাহ (ইবনে হানীদ), খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫০, হাঃ ১০, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৫২, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০০ (উর্দু)।

লক্ষ্য করুন যে, হাদীসটিতে কিরূপ হযরত আলীকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে বিচ্যুতি থেকে মুক্তি এবং তাঁর হতে দূরে থাকাকে বিপথগামিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটিতে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) কে যেরূপ ভালোবাসো, আলীকেও সেরূপ ভালোবাসো ও সম্মান কর। এ নির্দেশ একারণেই যে, তিনি রাসূল (সাঃ) এর পরে স্থলাভিষিক্ত। তদুপরি, রাসূল (সাঃ) এ নির্দেশ, আল্লাহ্র পক্ষ হতে উল্লেখ করে বিষয়টির গভীরতার দিকে হেদায়েত করেছেন।

আমার ও আলীর **(আঃ)** হাত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান।

হযরত নবী (সাঃ) হতে হযরত আবু বকর বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার ও আলীর হাত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান।"

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৩, হাঃ ২৫৩৯; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ২৩৪ (ইস্তাম্বুল) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৬৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৭৫৮, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৪, আত তাবারী, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭২।

নবী (সাঃ) একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে, যে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য যুদ্ধ করবে, যেমনটি আমি এর অবতীর্ণ হবার জন্য যুদ্ধ ও প্রচেষ্টা চালিয়েছি।” হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ঘাড় সজাগ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হযরত আবুবকর বললেন আমি কি সেই ব্যক্তি? রাসূল (সাঃ) বললেন “না”। হযরত ওমর বললেন, আমি কি সেই ব্যক্তি? নবী (সাঃ) আবার বললেন, “না, বরং সেই ব্যক্তি, যে এখন তাঁর জুতায় তালি দিচ্ছে।” তখন হযরত আলী তাঁর জুতা সেলাই করছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, “হযরত আলীর নিকট গিয়ে এ সুসংবাদ দিলাম কিন্তু তিনি তাঁর মাথা নীচু করেই রইলেন যেন তিনি রাসূল (সাঃ) হতে অসংখ্যবার একথা শুনেছেন।”

সূত্র, হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থের খণ্ড ৩, পৃঃ ১২২ হাদীসটি এনে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন, যাহাবী ও তা স্বীকার করেছেন। ইমাম হাম্বল তার মুসনাদে খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৩। ৮২ হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী তার শুআবুল ঈমান গ্রন্থে সাদিস ইবনে মানসুর এবং আবু ইয়ালী তাদের সুনানে আবু নাঈম হুলিয়াহ গ্রন্থে এবং মুত্তাকি হিন্দী তার কানজুল উম্মাল এ, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৫, হাঃ ২৫৮৫ উল্লেখ করেছেন ও আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯৮৮ খাসাইস আল নিসাঈ, পৃঃ ৪০, মাজমা আজ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃঃ ১৩৩।

নবী (সাঃ) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলেন, "হে আম্মার, যখন দেখবে আলী এক পথে চলছে আর বাকী সাহাবারা অন্য পথে, তখন তুমি আলীর সঙ্গে যেও ও অন্যদের ত্যাগ করবে। কারণ, সে তোমাকে পতনের পথে পরিচালিত করবে না এবং হেদায়েতের পথ হতেও বের হতে দেবে না।"

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৬, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০২, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১০২৩ মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৬০।

রাসূল (সাঃ) খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) কে বললেন, "মা, তুমি কি সন্তুষ্ট নও? নিশ্চয় আমার উম্মাহর মধ্যে যে সব চাইতে অগ্রণী তাঁর সাথে তোমার বিবাহ দিয়েছি। সে ঈমানে, জ্ঞানে, আর বিনম্রতায় অগ্রণী ও সর্বোত্তম।"

সূত্র, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ৫, পৃঃ ২৬ (মিশর) আল মুসান্নাফ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪৯০ (মিশর) আল ইসতিয়াব, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০৯৯ (মিশর) উসুদুল গাবা, খণ্ড ৫, পৃঃ ৫২০ (মিশর) কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১২, পৃঃ ২০৫ (হায়দারাবাদ) খণ্ড ১৫, পৃঃ ৯৯, মাজমা আজ যাওয়ায়েদ খণ্ড ৯, পৃঃ ১০১, ১১৪ (মিশর) আস সিরাহ আল হালবিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ২৮৫ (মিশর)।

হযরত আলী এবং খাতুনে জান্নাতের (আঃ) বিবাহের সাথে দুনিয়ার অন্য কারো বিবাহের তুলনা হতে পারে না।

হযরত আলী ও খাতুনে জান্নাতের (আঃ) শুভ বিবাহ সম্পন্ন হবার পর হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে আয়মন (রাঃ) হযরত রাসূল (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূল (সাঃ) কিছু দিন পূর্বে এক সাধারণ আনসার এর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যেও তো কত জাঁকজমক দেখলাম কতরকমের খাদ্য মিষ্টি ফলমূলাদি বিতরণ করা হল,

আর আজ দুই জাহানের বাদশার কন্যার বিবাহ এইরূপে সাধারণভবে সম্পন্ন হল।” উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, “আল্লাহ্র শপথ করে বলছি আলী এবং ফাতেমার বিবাহের সাথে দুনিয়ার অন্য কারো বিবাহের তুলনা হতে পারে না।

কারণ, আজ তাঁদের বিবাহ উপলক্ষ্যে আরশে মোয়াল্লার নিকট আল্লাহ্র হুকুমে জিবরাইল, মিকাইল এবং অন্যান্য প্রধান ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়ে উৎসবরত রয়েছেন। আজ বেহেশতকে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে।

বেহেশতের হুর-গেলমানগণ সুবেশ পরিধান করে আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা রয়েছে। বেহেশতের পক্ষীকুল খুশির কুজন তুলে চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে এবং বেহেশতের তুবা বৃক্ষ থেকে উজ্জ্বল মণি মুক্তা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতের তত্ত্বাবধায়ক রেজওয়ান ফেরেশতাকে আদেশ করলেন চতুর্থ আসমানে বাইতুল মামুরের তোরণ দ্বারে একটি বেদী নির্মাণ করে; রাহিল নামক ফেরেশতাকে তোরণ নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাহিল ফেরেশতা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করে ঘোষণা করলেন, “হে স্বর্গবাসী ও মর্ত্যবাসী সৃষ্টিকুল। তোমরা জেনে রাখ, আজ দয়াময় আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা খাতুনে জান্নাত এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হযরত আলীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো।”

সূত্র: খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ৪৫ (রহমানীয়া লাইব্রেরি); হযরত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ৩৯-৪০ (তাজ কোং); হযরত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ৮৫-৮৬, (হামিদীয়া); হযরত আলী, পৃঃ ৩৪ (তাজ কোং); জাওয়াহেরুল উকবা, পৃঃ ৩১; আরজাহুল মাতালেব পৃঃ

৪৩৬, ৪৩৯; মাদারেজুন নবুয়াত, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩০; তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭২-২৭৭, (ই.ফা.)।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "ইয়া ফাতেমা। তুমি কি জান**?** মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে হতে তোমার পিতাকে নবুওতের জন্য মনোনীত করলেন। অতঃপর**,** দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তোমার স্বামীকে মনোনীত করলেন এবং আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন**,** যেন 'আলীকে তোমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করি ও আলীকে আমার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করি'।"

সূত্র**:** ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খণ্ড ২, পৃঃ ৫১০; কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৩, হাঃ ২৫৪৩; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩১, ৩৯; মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২৯; শারাহ নাহজ আল বালাগা, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫১; মাদারেজুন নবুয়াত, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩১; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৩৫-১৩৬; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৪৯।

লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ্ কিরূপে 'পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে থেকে শেষ নবী (সাঃ) কে মনোনীত করার পর, হযরত আলী (আঃ) কে মনোনীত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী (সাঃ)-এর মনোনয়নের বিষয়ের মত তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের বিষয়টিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। নিজ কন্যাকে হযরত আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ও তাকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার জন্য আল্লাহ্‌র ওহী প্রেরণের বিষয়টিও লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী নবীগণের স্থলাভিষিক্তরা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন কি?

সুতরাং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক হবে কি? অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে কি?

সাধারণ মানুষ যে ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে নির্বাচন করেছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তির ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিয়ে, তাঁর আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা যুক্তিসংগত কি? এটি কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে আমরা নিজেরা মনগড়া ব্যক্তিকে নির্বাচন করি? অথচ পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দানের পর কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই যে, কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করবে সে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।" (আহযাব-৩৬)।

হযরত আবু হুরাইরা, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, "ইয়া রাসূল (সাঃ), আল্লাহ্ যে নবীকেই প্রেরণ করেছেন, তাঁকেই বলে দিয়েছেন যে, কে তাঁর উত্তরসূরী হবে। তবে কি আল্লাহ্ আপনাকেও বলেছেন যে, কে আপনার উত্তরসূরী হবে?" নবী করিম (সাঃ) বললেন, **"**আমার উত্তরসূরী**,** আলী ইবনে আবু তালিব হবে**,"।**

> সূত্র**:** শারহে বোখারী ইবনে হাজার আসকালানী, খণ্ড ১৮, পৃঃ ১০৫।

আমার উত্তরসূরী হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালিব।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নবীরই একজন উত্তরসূরী থাকে, আর আমার উত্তরসূরী হচ্ছে, আলী ইবনে আবু তালিব।"

> সূত্র: কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৮; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ১১, পৃঃ ১৭৩; শাওয়াহেদুল তানজিল, খণ্ড ২, পৃঃ ২২৩; তারিখে ইবনে আশাকীর শাফেয়ী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫; মানাকিবে খাওয়ারেজমী, পৃঃ ৪২; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৫০; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৩৩; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৪৬।

আমি আমার উত্তরসূরী হিসাবে আলী ইবনে আবু তালেবকে নিযুক্ত করেছি।

নবী (সাঃ) এর কাছে সালমান ফারসি (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূল (সাঃ), "আপনি কি আপনার পর আপনার উত্তরসূরী নিয়োগ করেছেন?" নবী (সাঃ) বললেন, "সালমান তুমি কি উত্তরসূরী সম্বন্ধে কিছু অবগত আছ?" সালমান ফারসি বললেন "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)ই সবচেয়ে বেশি জানেন।" রাসূল (সাঃ) বললেন, "হযরত আদম (আঃ)-এর উত্তরসূরী শীশ (আঃ) ছিলেন, যিনি আদম সন্তানগণের মধ্যে তাঁর গত হওয়ার পর যাঁরা বর্তমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন।

তার পরে হযরত নূহ (আঃ)-এর উত্তরসূরী ছিলেন তাঁর পুত্র সাম (আঃ), যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, যাকে নূহ (আঃ) তাঁর পর উত্তরসূরী ঘোষণা করে যান, হযরত মুসা (আঃ)-এর উত্তরসূরী, ইউসা (আঃ) ছিলেন, যিনি, হযরত মুসা (আঃ)-এর পর তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন,

হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর উত্তরসূরী আসিফ বিন বারখিয়া ছিলেন, যিনি হযরত সোলাইমান (আঃ) এর পর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উত্তরসূরী শামউন বিন ফরখিয়া যিনি ঈসা (আঃ)-এর পর সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। আর আমি আমার উত্তরসূরী হিসাবে আলী ইবনে আবু তালেবকে নিযুক্ত করেছি। আমার পর আমি যাদের ছেড়ে যাচ্ছি, তাদের মধ্যে আলীই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।"

সূত্র: ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০৭ (উর্দু) (শেখ সুলাইমান কান্দুযী হানাফী) ফাজায়েলে মুর্তুজাভী, পৃঃ ২২০ (মোহাঃ সালে কাসাফী) মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ৭০ (সৈয়দ আলী হামদানী শাফেয়ী সুন্নী)।

হযরত আলীর (আঃ) অসন্তুষ্টি বা গযব, আল্লাহ্‌রই অসন্তুষ্টি বা গযব।

হযরত আবু মুসা হামিদী'র বর্ণনা, আমি আরাফার মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত আবু বকর, হযরত ওসমান এবং অন্যান্য আসহাবও সঙ্গে ছিলেন। নবী (সাঃ) আবু বকরকে সম্বোধন করে বললেন "হে আবু বকর। এই ব্যক্তি যাঁকে তুমি দেখছো আলী ইবনে আবু তালেব, ঊর্ধ্বাকাশে সে আমার উত্তরসূরী, পৃথিবীতেও আমার উত্তরসূরী। যদি তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হতে চাও, তবে আলীর সন্তোষ কামনা কর, তাঁর সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আর আলীর অসন্তুষ্টি বা গযব, আল্লাহ্‌রই অসন্তুষ্টি বা গযব।"

সূত্র: ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০০, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৬০।

নবী (সাঃ) বলেছেন, আমার সাথে আলীর সম্পর্ক আমার দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের ন্যায়।

সূত্র: আর রিয়াদ আন নাদীয়া, খণ্ড ২, পৃঃ ২১৯, নুরুল আবসার, পৃঃ ৪, ৭৩, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৫৩, আস-সওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ ৭৫ (মিশর) জামেউস সগীর, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪০ (মিশর) মানাকিবে খাওয়ারেজমী, পৃঃ ৮৯, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৪১, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮২, তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৫১, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৭৭৫।

হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, "পুলসিরাত পুলের ওপর দিয়ে কেউ যেতে পারবে না, যদি তাদের কাছে হযরত আলীর প্রদত্ত সনদ না থাকে।

সূত্র: ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১১২, আস-সওয়ায়েক, পৃঃ ১০১, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯০৬।

হযরত আবু বকর, রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন যে, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি হযরত আলীর লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না।"

সূত্র: জাওয়াহেরুল উকবা, পৃঃ ৭১, সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ ১২৪, ইয়া নাবিতুল মুয়াদ্দাত, পৃঃ

৩৩৯ আল মুরতাজা, পৃঃ ১৬৪, মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ৬৮।

হযরত আলীর (আঃ) চেহারা মোবারক দেখা ইবাদতের শামিল।

হযরত আবু বকর প্রায়ই হযরত আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাই হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, (বাবা) আপনি কেন (সবসময়) হযরত আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন? হযরত আবু বকর উত্তরে বললেন, "আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, হযরত আলীর চেহারা মোবারক দেখা ইবাদত।"

সূত্র: কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২১২ (ইফাউ) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৯ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ১৫ (এমদাদীয়া) সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃঃ ১৭৫, আল মুরতাজা, পৃঃ ১৬৫, রিয়াজুন নাজরাহ, খণ্ড ২, পৃঃ ২৯১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৩৯, ইযাযাতুল খিফা, খণ্ড ২, পৃঃ ৫১২ (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ১১২, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৮৪২, ৮৪৬।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "হযরত আলীর জিকির (ফজিলত বর্ণনা) করা ইবাদত।"

সূত্র: কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫২, মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ১১২, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪২২, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১৭১।

যদি আজ হযরত আলী (আঃ) না হতেন, তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।

পবিত্র কোরআন হতে মাসআলা বের করার কাজে হযরত আলীর দক্ষতা ছিল অপূর্ব। একদা হযরত ওমর জেনার অপরাধে জনৈকা উন্মাদিনীর ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, হযরত আলী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন, উন্মাদের কার্যকলাপ ধর্তব্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমর স্বীয় নির্দেশ রহিত করেন এবং বললেন "যদি আজ আলী না হতেন, তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।" (এভাবে ইতিহাসে ৭২ বার হযরত ওমর বলেছেন, হযরত আলী না থাকলে, ওমর ধ্বংস হয়ে যেত)।

> সূত্র: কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২০৭, (ই.ফা.) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৩ (এমদাদীয়া) ইসাবা (ইবনে হাজার) খণ্ড ২, পৃঃ ৫০৯, সাওয়ায়েকে মুহরেকা (ইবনে হাজার মাক্কী), পৃঃ ৭৮, উসুদুল গাবা, খণ্ড ৪, পৃঃ ২২, তারিখুল খোলফা, পৃঃ ৬৬, আল ইস্তিযাব, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৭৪, নুরুল আবসার, পৃঃ ৭৩, ইসাফুর রাগেবীন, পৃঃ ১৫২, ফুসুলুল মোহিম্মাহ, পৃঃ ১৮, মানাকিবে খতীব খাওয়ারেজমী ...পৃঃ ৪৮, ৬০; মাতালেবাস সাউল পৃঃ ২৯; সিবতে ইবনে জাওজি; তাকিরা পৃঃ ৮৫; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১২৭।

হযরত আলীকে জ্ঞানের সাগর বলা হত অর্থাৎ, সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হত। এই কারণে অপর তিনজন খলিফাই তাঁর পরামর্শ নিতেন। হযরত ওমর নিজেই বলেছেন, হযরত আলী না হলে ওমরের ধ্বংস ঘটত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, হযরত আলীর ন্যায় সমস্যা সমাধানকারী আর

কেহই ছিলেন না। আমরা যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি তখনই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি। হযরত আলী নিজ মুখেই বলেছেন যে, "আল্লাহর প্রতি শোকর যে, আমার শত্রুও ধর্মীয় ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করে।" কোরআন, হাদীস, ফিকাহ্, আদব, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি এলেমের প্রতিটি শাখায় তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তাঁর জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। মহানবী (সাঃ) এর সংস্রবে থাকতে পারাতেই তিনি কোরআনের ও হাদীসের এত অধিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, "পবিত্র কোরআনের এমন আয়াত নাই যার নাজিল ও শানে নুযুল তারতীব আমার জানা নাই!" নবী (সাঃ) নিজ পবিত্র মুখেই স্বীকার করেছেন যে, "আলী কোরআনের সহিত এবং কোরআন আলীর সহিত।"

সূত্র**:** হযরত আলী, পৃঃ ২২৪ (এমদাদীয়া) হযরত আলী, পৃঃ ৮৯ (শিরীন পাবঃ) হযরত আলী পৃঃ ৩১ (তাজ কোং) সাহাবা চরিত, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৭ (ই.ফা.) মাতালেবাস সাউল, পৃঃ ১৩। তাহজিবুত তাহজিব, পৃঃ ৩৩৪, রিয়াযুন নাজরাহ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯, তারিখে ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩৬৯, কিফায়াতুত তালেব, অধ্যায়, ৫৭, তারিখে খোলফা, পৃঃ ৬৬, নুরুল আবসার, পৃঃ ৭৩, হিদায়াতুল মুরতাব, পৃঃ ১৪৬, ইসাফুর রাগেবীন, পৃঃ ৫২, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ৭৮, ইসাবা (ইবনে হাজার আসকালীন), খণ্ড ২, পৃঃ ৫০৯। নাহজ আল বালাগাহ (অনুবাদ, ফেদাদুল ইসলাম), পৃঃ ১৭২, ১৮২।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন?

আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে এক অদ্ভুত প্রচারণা চালানো হয়েছিল ও এখনও হচ্ছে। একদিকে বলা হতো, তিনি প্রায়োগিক রাজনীতিতে অদক্ষ ছিলেন ও প্রশাসনের বাস্তব পদ্ধতির সাথে পরিচিত ছিলেন না। উমাইয়াদের ক্ষমতালিপ্সাই যে তাদের বিদ্রোহের কারণ তা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই বলা হতো যে, আমিরুল মোমেনিনের দুর্বল শাসনব্যবস্থাই তাদের ক্ষমতা গ্রহণের কারণ। অপরদিকে, খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের সাথে পরামর্শ করতেন। বস্তুত, এহেন পরামর্শ দ্বারা আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (আঃ) এর চিন্তা বা বিচারের বিশুদ্ধতা বা তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা জনসমক্ষে তুলে ধরা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, আমিরুল মোমেনিনের সাথে তাদের কোন মতবিরোধ নেই। খেলাফত বিষয়ে হযরত আলী (আঃ) কে বঞ্চিত করার ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে কেউ কোন উপদেশ বা পরামর্শ চাইলে, সে বিষয়ে নীতিগতভাবে সৎ পরামর্শ দেয়া থেকে আমিরুল মোমেনিন বিরত থাকতে পারেন না, কারণ তিনি সুন্নাহ্র ধারক ও বাহক। আমিরুল মোমেনিনের চারিত্রিক মহত্ব এত উচ্চমাপের ছিল যে, তাঁর শত্রু পরামর্শ চাইলেও তিনি ক্ষতিকর কোন পরামর্শ দিতে পারতেন না। এ কারণে মতদ্বৈধতা এবং নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও খলিফাগণ তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন। এটা তাঁর চারিত্রিক মহত্ব, চিন্তা ও বিচারের বিশুদ্ধতা এবং গভীর প্রজ্ঞার প্রতিই আলোকপাত করে। এটা রাসূলের (সাঃ) এর চরিত্রের অন্যতম মহৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। মুশরিকগণ তাঁকে নবী

বলে স্বীকার করেনি, তাঁর বাণী গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাঁকে আল-আমীন বলে কখনো অস্বীকার করেনি। যখন তাদের সাথে রাসূলের (সাঃ) দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলছিল তখনও তারা তাদের ধনসম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। এতে তারা এতটুকুও ভয় পেত না যে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ হয়ে যেতে পারে। একইভাবে খলিফাদের সাথে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন, জাতীয় ও উম্মাহ্র স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং ইসলামের অভিভাবক হিসাবে ইসলামের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে অপ্রভাবিত পরামর্শ দান করে আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (আঃ) রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ পালন করেছেন। অন্য খলিফাগণও প্রায়ই বিচারের কঠিন সমস্যায়, কখনো প্রশাসনের সমস্যায়, কখনোবা দ্বীনবিষয়ক সমস্যায়, কখনো যুদ্ধ বিষয়ক সমস্যায় পতিত হলেই আমিরুল মোমেনিনের কাছে উপদেশ চাইতেন। তিনিও নির্দ্বিধায় তাদেরকে সৎ ও সঠিক পরামর্শ দিতেন। তবে আমার প্রশ্ন, সেই সঠিক পরামর্শের সঠিক প্রয়োগ হয়েছিল কি? তাঁর এহেন পরামর্শের সূত্র ধরে অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, খেলাফত বিষয়ে আমিরুল মোমেনিনের কোন মতদ্বৈধতা বা কোন দুঃখ ছিল না। তিনি অন্যদের খেলাফতের সাথে একমত পোষণ করতেন। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। অন্য খলিফাত্রয়ের তুলনায় আমিরুল মোমেনিন অনেক বেশি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। নাহলে তিনি “জ্ঞান-নগরীর দুয়ার” হবেন কেন? এবং সে দুয়ারে সকলকেই যেতে হয়। অপর পক্ষে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যে কেউ পরামর্শ চায় তাকে সৎ ও সঠিক পরামর্শ দেয়া তাঁর সহজাত নীতি। এটা রাসূলের আখলাক। ঘোরতর শত্রু আবু জেহেল, আবু সুফিয়ানদের কাছেও রাসূল (সাঃ) ‘আল-আমীন’ ছিলেন। এটা বিশ্বস্ততার প্রতীক। কাজেই বিরোধী লোককেও সৎপরামর্শ দেয়া বিশ্বস্ততার প্রতীক। এসব পরামর্শের সূত্র ধরে খেলাফত বিষয়ে, আমিরুল মোমেনিনের

ঐক্যমত্য সাব্যস্ত করা সঠিক হবে না। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গবেষণার জন্য গাদীরে খুমে, ১৮ জিলহজ্বে (বিদায় হজ্বের) রাসূলের ভাষণ, তার পরবর্তী ৭০ দিনের ঘটনা প্রবাহ, রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন ঘটনাবলী, সকিফা-ই বনী সাইদার ঘটনাবলী, রাসূলের (সাঃ) দাফনের ঘটনাবলী, আবু বকর কর্তৃক ফেদাক রাষ্ট্রীয়করণসহ অন্যান্য ঘটনাবলী, ওমরের সময়ের ঘটনাবলী, ফাতেমা (আঃ) এর ওফাতের ঘটনাবলী, খলিফা দাফনের ঘটনাবলী, আবু বকর কর্তৃক ফেদাক রাষ্ট্রীয়করণসহ অন্যান্য ঘটনাবলী, ওমরের সময়ের ঘটনাবলী, ফাতেমা (আঃ) এর ওফাতের ঘটনাবলী, খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিসমূহ ইত্যাদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে।

নবী **(**সাঃ**)** বলেছেন**, "**আমার উম্মতের মধ্যে আলী ন্যায় বিচারে সব চাইতে জ্ঞান সম্পন্ন।**"**

> সূত্র**:** মাসাবীহ আশ সুন্নাহ্, খণ্ড ২, পৃঃ ২০০ (মিশর) আল ইস্তিয়াব, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬ (মিশর) মাজমা আজ জাওয়াহিদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১০২ (মিশর) রিয়াজ আন নাদিরা (তাবারি), খণ্ড ২, পৃঃ ১০৮ (মিশর) আকবার আল কুজাত, খণ্ড ১, পৃঃ ৭৮ (মিশর) শারাহ্ সহীহ্ বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৫৫ (আল আইনি হানাফী) (মিশর) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৫৪৪।

হযরত আলী সম্পর্কে হযরত ওমর বলতেন**, "**আলী হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী বিশেষ করে বিচারকার্যে।**"**

সূত্র: সহীহ্ আল বুখারী, খণ্ড ৪, হাঃ ৪১২৩
(আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খণ্ড ৬, পৃঃ ২৩
(মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ৫, পৃঃ ১১৩
(মিশর) মুস্তাদরাক হাকেম, পৃঃ ৩০৫ (মিশর)
তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খণ্ড ২, পৃঃ ১০২
(লেইডেন) আল ইস্তিয়াব, খণ্ড ৩, পৃঃ ১১০২
(মিশর) তারিখুল খোলফা, পৃঃ ১৮২;
সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১২৪, ১৭৭।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "জুলফিকারের ন্যায় আর কোন তরবারী নাই এবং এজগতে আলীর ন্যায় আর কোন বাহাদুর নাই।"

সূত্র: হযরত আলী, পৃঃ ৫১ (তাজ কোং, ১৯৮৭, ইং) সীরাতুন্নবী (ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩, পৃঃ ৬২ (ই.ফা)) মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৮৫; সুনানে বাইহাকী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৭৬; ইবনে মাজাহেলী (শাফেয়ী), পৃঃ ১৯৭; আত তাবারি, পৃঃ ৫১৪; আল রিয়াদ আন নাদিরা (তাবারি), খণ্ড ২, পৃঃ ১৯০; হিস্ট্রি অব আরব, পৃঃ ১৮৩; মাদারেজুন নবুয়াত (শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী), খণ্ড ২, পৃঃ ২১১ (উর্দু) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০৪; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৭৮০; মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ৬৫।

সমস্ত জ্ঞানকে দশ ভাগে ভাগ করে, নয় ভাগ জ্ঞান একাই হযরত আলীকে (আঃ) দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "সমস্ত জ্ঞানকে দশ ভাগে ভাগ করে নয় ভাগ জ্ঞান একাই আলীকে দেওয়া হয়েছে এবং এক ভাগ জ্ঞান হতে

সবার মধ্যে বন্টন করা হয়েছে এবং এই এক ভাগ জ্ঞান থেকেও আলী ভাগ পেয়েছেন।”

সূত্র, কাতেবীনে ওহী, পৃঃ ২০৭ (ই.ফা.); আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ১৯৩ (এমদাদীয়া); আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩৫৯ (মিশর); মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ৭৭; ইযাযাতুল খিফা, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩ (শাহ ওয়ালিউল্লাহ); হুলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ৬২; আসমুন মাতালেব (মুহাম্মদ জাখারী), পৃঃ ১৪; কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৬; মাতালেবাস সাউল, পৃঃ ১৪; ইয়া নাবিতুল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৭৭ (ইস্তাম্বুল); মানাকিবে খতিব খাওয়ারেজমি, পৃঃ ৫৯।

নবী **(**সাঃ**)** হযরত আলীকে বলেছিলেন যে**, “**আমার পর তোমাকে বায়াত ভঙ্গকারী **(**জামালের লোকেরা**),** অত্যাচারী **(**সিরিয়ার লোকেরা**)** ও ধর্মত্যাগীদের **(**খারিজীগণ**)** বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।”

সূত্র**:** তাফসীরে দুররে মানসুর, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৮ (মিশর); আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩০৪ (মিশর); রিয়াজ আন নাদিরা, খণ্ড ২, পৃঃ ২৪০ (মিশর); খাসাইস আল কুবরা, খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৮; কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃঃ ২১৫, খণ্ড ৬, পৃঃ ৭২, ৮২, ৮৮, ১৫৪, ৩১৯, ৩৯১; শারাহ আল মাওয়াহির আল লাদুন্নিয়া, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩১৬; মাজমা আজ জাওয়াহিদ, খণ্ড ৭, পৃঃ ২৩৮ (মিশর); তারিখ শাম, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪১; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড ৮, পৃঃ ৩৪০, খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৮৬ (মিশর); উসুদুল আল গাবা, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩২ (মিশর); আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, খণ্ড ৩, পৃঃ ১১১৭

(মিশর); মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩৯; নাহজ আল বালাঘা, পৃঃ ১২৬ (অনুবাদ, জোহাদুল ইসলাম)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, "পবিত্র কোরআনে তিন শতাধিক আয়াত হযরত আলীর শানে নাযিল হয়েছে।"

সূত্র: তারিখে বাগদাদ খণ্ড ৬, পৃঃ ২২১, খণ্ড ৩, পৃঃ ৮৬; কেফায়াতুত তালেব পৃঃ ২৩১; রাওয়ুন নাজির, খণ্ড ৫, পৃঃ ২১; ইবনে শাহার আশুব, খণ্ড ১, পৃঃ ২৮০; তারিখে দামেস্ক, খণ্ড ৪২, পৃঃ ৩৬৪; ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৯৯; আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯৩।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব যে সকল হতে উত্তম সিদ্দীক, সিদ্দীকে আকবার।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি সিদ্দীক—(১) হাবীব নাজ্জার (আলে ইয়াসিনের মু'মিন ব্যক্তি) যিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি। আল্লাহ্ ও রাসূলদের আনুগত্য কর। (২) হিযকিল মু'মিন (ফিরআউন বংশের মু'মিন ব্যক্তি) যিনি বলেছিলেন, ঐ ব্যক্তিকে একারণেই কি তোমরা হত্যা করতে চাও যে, সে বলে আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ্। (৩) হযরত আলী ইবনে আবু তালেব যে সকল হতে উত্তম সিদ্দীক (সিদ্দীকে আকবার)।"

সূত্র: ইয়া নাবিতুল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৯৯; আল মুরাজায়াত, পৃঃ ২১১; আল মুরতাজা, পৃঃ ১৩৩; সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১২৫;

আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ২২, ১৮০;
কওয়াকাবে দুররি (সালেহ কাসাফী), পৃঃ ১৭৯।

নবী **(**সাঃ**)** বলেছেন যে**, "**ইয়া আলী তুমি জান্নাত ও জাহান্নামের বন্টনকারী।**"**

সূত্র**:** "ইয়া নাবিতুল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৪৩, আল হাকীম আল নিশাবুরী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২৭, কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩০, আল জামে (সুয়ুতী), খণ্ড ১, পৃঃ ৩৭৪, ইবনে মাগাজেলী, পৃঃ ৮০, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৯০, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৫৯ আল মানাকিব খাওয়ারেজমী, পৃঃ ২০৯, ফারায়েদুস সামতাদীন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৫।

ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি দেখেছেন ওফাতের সময় রাসূল (সাঃ) এর মাথা মোবারক কার ক্রোড়ে ছিল? তিনি বললেন, "হ্যাঁ হযরত আলীর বুকে ভর দিয়েছিলেন, রাসূল (সাঃ) আলীর ক্রোড়ে মাথা রেখেই ইহজগত ত্যাগ করেন এবং হযরত আলী, রাসূল (সাঃ) কে শেষ গোসল দেন।"

সূত্র**:** আল মুরাজায়াত, পৃঃ ২৭৪। কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৪, হাঃ ১১০৭, খণ্ড ৬, হাঃ ৬০০৯, মোহঃ সা'দ খতীব তাবাকা, খণ্ড ২, পৃঃ ৫১, শারাহ্ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খণ্ড ২, পৃঃ ৫৬১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৪৮, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯৭৭।

নবী **(**সাঃ**)** বলেছেন**, "**যারা আলীকে ছেড়ে দিয়েছে তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে**,** এবং যারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে**,** তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়েছে।**"**

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উনি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, "হযরত আলীর ভিতরে এমন কিছু ফজিলত বা গুণ পাওয়া যায় আর অন্য কারোর মধ্যে সেই গুণগুলোর মধ্যে থেকে একটা গুণও যদি পাওয়া যেত তবে তার জন্য যথেষ্ট হতো। যেমন, নবী (সাঃ) বলেছেন, যাদের যাদের আমি অভিভাবক তাদের তাদের আলীও অভিভাবক। নবী (সাঃ) বলেছেন, আলীর সাথে আমার সেই সম্পর্ক যা হারুন-এর সাথে মুসার ছিল। আলী আমা থেকে আর আমি আলী থেকে। "আলী হচ্ছে আমার নাফ্‌স," আলীর অনুসরণ আমার অনুসরণ, আলীর নাফরমানী আমার নাফরমানী, আলীর যুদ্ধ আল্লাহ্‌র যুদ্ধ, আলীর সন্ধি আল্লাহ্‌র সন্ধি। আলীর বন্ধু আল্লাহ্‌র বন্ধু, আলীর শত্রু আল্লাহ্‌র শত্রু। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আলী হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুজ্জাত। "আলীর ভালোবাসা ঈমান, আলীর সঙ্গে হিংসা করা কুফরি, আলীর দল আল্লাহ্‌র দল এবং আলীর শত্রুর দল শয়তানের দল, আলী হকের সাথে এবং হকও আলীর সাথে আছে এবং উভয়ে একে ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, আলী জান্নাত ও জাহান্নামের বন্টনকারী, যারা আলীকে ছেড়ে দিয়েছে তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং যারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়েছে, আলীর অনুসারীদের কিয়ামতের দিন কোন চিন্তা থাকবে না, তারা নিশ্চিত থাকবে।" সূত্র, "ইয়া নাবিতুল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৮৮-১৮৯ (মুফতি শেখ সুলাইমান কান্দুড়ী হানাফী, সুন্নি)।

এ হলো আমার ভাই, আর আমার পরে আমার উত্তরসূরী এবং তোমাদের খলীফা।

রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "এ হলো আমার ভাই, আর আমার পরে আমার উত্তরসূরী এবং তোমাদের খলীফা। তাঁর নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করো এবং তাঁর আনুগত্য করো।"

> সূত্র: তারিখে তাবারী, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩১, মায়ালিমুত তানজিল, খণ্ড ৪, পৃঃ ২৭৯, আল কামিল ফিত তারিখ, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৩, শারাহ নাহজুল বালাঘা, খণ্ড ১৩, পৃঃ ২১১ (ইবনে হাদীদ) কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৩১।

রাসূল (সাঃ) যে, হযরত আলী (আঃ) কে তাঁর পরে নিজের উত্তরাধিকারী, খলিফা, উত্তরসূরী, প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্তের ওসিয়ত (ঘোষণা) করে গিয়েছেন তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

যেমন, রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন, তাঁকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন দাফন-কাফনের, তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণের। তিনি তাঁকে আরো ওসিয়ত করেছেন তাঁর পর তাঁর উম্মতের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্যের সময় সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের, আর উম্মতের প্রতি ওসিয়ত করে জানিয়ে গেছেন যে, হযরত আলী উম্মতের ওপর রাসূল (সাঃ)-এর পর নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পরামর্শদাতা ও গোপনীয় রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত একমাত্র ব্যক্তি। তিনি তাঁর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত, জ্ঞান নগরীর প্রবেশদ্বার, তাঁর উম্মতের রক্ষাকবচ, নিরাপত্তা ও মুক্তির তরণি। তাই

রাসূল (সাঃ)-এর মতো তাঁর প্রতি আনুগত্য উম্মতের ওপর ওয়াজিব এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা গুনাহ্। যেহেতু তা নবী (সাঃ) এর নির্দেশের বিরোধিতার শামিল। তাঁর অনুসরণ নবীরই অনুসরণ, তাঁর হতে বিচ্ছিন্নতা নবী (সাঃ) হতেই বিচ্ছিন্নতা। নবী (সাঃ) সেই ব্যক্তির সাথে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করেন, যে আলীর সাথে সন্ধি স্থাপন করে ও তাঁর সাথে যুদ্ধ করেন যে আলীর সাথে যুদ্ধ করে। যে আলীকে ভালোবাসলো সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কেই ভালোবাসলো।

যে হযরত আলীর বিষয়ে মনে বিদ্বেষ পোষণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে তার মনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে। যে আলীকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করল এবং যে আলীকে অস্বীকার করল সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কেই অস্বীকার করল। যে আলীকে কষ্ট দিল সে তাঁদেরকে কষ্ট দিল, যে আলীকে গালি দিল সে তাঁদের দু'জনকেই গালি দিল, তিনি পুণ্যবানদের নেতা, অন্যায়কারীদের হন্তারক। যে ব্যক্তি তাঁকে সহযোগিতা করবে, সে জয়ী হবে, এবং যে তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করবে করবে সে অপমানিত হবে। তিনি মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের ইমাম এবং উজ্জ্বল, মুখবয়বদের (সৎ কর্মশীলদের) প্রধান, তিনি হেদায়েতের ধ্বজা ও আল্লাহ্র অলীদের নেতা। আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাকুর্যার যে পথ অবলম্বনকে তাঁর বান্দার উপর অপরিহার্য করা হয়েছে তিনি সে পথে প্রজ্জ্বলিত নূর। তিনি সিদ্দীকে আকবর এবং এই উম্মতের সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী ও মু'মিনদের প্রধান (আমিরুল মোমিনিন)। তাঁর অবস্থান মুসার নিকট হারুনের ন্যায়, দেহের জন্য মাথার গুরুত্ব যেরূপ, রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আলীর গুরুত্ব অনুরূপ। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর প্রাণের মতো, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের

প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, আলী ব্যতিত অন্য কেউ তাঁর পক্ষ হতে নির্দেশ দান করতে পারবে না। এই সকল বিশেষত্ব হযরত আলী ব্যতিত অন্য কারো ছিল না এবং কেবল তিনিই এসব কিছুর অধিকারী হিসাবে নবীর স্থলাভিষিক্তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা রাখেন।

এখন আমাদের প্রশ্ন করা উচিত যে, কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এ সকল ওসিয়তকে অস্বীকার করা সম্ভব কি? কোন দুরভিসন্ধি না থাকলে কেউ এ বিষয়গুলোর বিরোধিতা করতে পারে কি? সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন, ওসিয়ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া ভিন্ন অন্য কিছু কি? নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করুন—

> সূত্র: আল মুরাজায়াত, পৃঃ ২৭২, মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড ২, পৃঃ ৬১, খণ্ড ৩, পৃঃ ৫৯, ১২২, ১৫৯, ১৬৪, ১১১, ২২৬, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৪, পৃঃ ৫৪, ৬০, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪০, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৫৫, ৩৯৩, ৪০০, ৪০৪, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ৭৫, শারাহ নাহজ আল বালাঘা, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৫০, জামেউস সাগীর, পৃঃ ১৭০, মুসনাদে হাম্বল, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৬৪, ৪৩৮, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪৫, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩২৩, ইবনে সা'দ (তাবাকাত), খণ্ড ২, পৃঃ ৬১, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯২-৩০০। ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ২৮৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩১০, ৩১১, ৩৩৯, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৩৪-১৩৫।

আমি আবারও সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের বিবেক-এর কাছে প্রশ্ন রাখছি, বিবেক কি এটা গ্রহণ করবে যে, নবী (সাঃ) তাঁর উম্মতকে ওসিয়ত করার জন্য নির্দেশ দিবেন, (বাকারা-১৮০, ও মায়াদা-১০৬) ও এজন্য কঠোরতা আরোপ করবেন। অথচ, যে মুহূর্তে তাঁর উম্মত তাঁর ওসিয়তের চরম মুখাপেক্ষী তখন তাদের অভিভাবকহীন অবস্থায় ত্যাগ করবেন। যখন তারা নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে, তখন তাদের অভিভাবকহীন ইয়াতীমের ন্যায় অসহায় রেখে যাবেন। এটি আরো অযৌক্তিক যে, তিনি মহামূল্যবান শরীয়তের আহকামসমূহ যা সর্বোত্তম উত্তরাধিকার, সেটিকে পরিত্যক্ত রেখে যাবেন যার ফলে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত জগতের অধিবাসীরা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। কারণ, নবী (সাঃ) তাঁর পর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছেন। নবী (সাঃ) জানতেন যে, তাঁর উম্মত বিভিন্ন (ফিরকাতে) দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

সূত্র**:** মুসনাদে হাম্বল খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩২।

নবী (সাঃ) এটাও বলেছেন যে, **“**তাঁর পর তাঁর অনুসারীর মধ্যে অনেকে নিজেদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবে।**”**

সূত্র**:** বুখারী, খণ্ড ৪, পৃঃ ৬৩, (আরবী)

এবং **“**তাঁর উম্মত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করবে।**”**

সূত্র**:** বুখারী, খণ্ড ৭, পৃঃ ১১২, (আরবী)

এবং রাসূল (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, **“**আমার পরে এমন সব ইমাম হবে **(**নেতা হবে**)** যে আমার হেদায়েত অনুসারে আমল করবে না এবং আমার সুন্নাতকে আমলের উপযুক্ত মনে করবে

না এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে হতে এমন লোকেরা উঠে দাঁড়াবে যাদের দেহ হবে মানুষের মত কিন্তু অন্তর হবে শয়তানের।”

সূত্র: মুসলিম, খণ্ড ৬, পৃঃ ২০, (আরবী)

যাই হোক, আল্লাহ্র নিদর্শন ও প্রমাণ যাঁরা খোদায়ী নেয়ামতের পূর্ণতাদানকারী, তাঁদের ছাড়াই কি এ জনগোষ্ঠী কিয়ামত পর্যন্ত চলবে? তদুপরি এখানে বিবেক এবং যুক্তি বলে যে, নবী (সাঃ) হযরত আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রশাসনিক প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন, তাঁকে নিজ ওফাতের পর গোসল, হনুত, দাফন ও দ্বীনের ব্যাখ্যাদানের দায়িত্ব পালনের ওসিয়ত করে গিয়েছেন এবং যে সকল বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে তাতে হযরত আলীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ ও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য উম্মতকে ওসিয়ত করেছেন। পবিত্র কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়েছে।

তাইতো আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন, “আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” (আলে ইমরান-১০৫)

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সৎপথ, ভ্রান্ত পথ থেকে।” (বাকারা-২৫৬)।

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, “আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো, আর যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করলো, আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমারই অবাধ্যতা করলো।”

সূত্র: মুসলিম, খণ্ড ৫, হাঃ ৪৫৯৭ (ই.ফাঃ)

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, “আমি আমার উত্তরসূরী আলী ইবনে আবু তালেবকে নিযুক্ত করেছি। আমার পর আমি যাদের ছেড়ে যাচ্ছি, তাদের মধ্যে আলীই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।”

সূত্র: ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০৭। (মুফতি শায়খ সুলাইমান কান্দুড়ী হানাফী, সুন্নি); ফাজায়েলে মুর্তুজাভি, পৃঃ ২২০। (মোহাঃ সালে কাসাফী, সুন্নী) মুয়াদ্দাতুল কোরবা, পৃঃ ৭০ (সৈয়দ আলী হামদানী শাফেয়ী, সুন্নী)।

তাই আমাদের একটু সচেতনতার সাথে গবেষণা করার প্রয়োজন, যাতে আমাদের ঈমান ধ্বংস না হয়ে যায় ও আমরা যে আমল করছি তা যেন সব বৃথা না হয়ে যায়। সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাগণ, একবার ইহজগত ত্যাগ করার পর, আর ফেরত আসার কোন পথ খোলা নেই, তাই একটু যাচাই করে নিলে কিন্তু জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাব, তাই নয় কি?

“ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না,” আমিও পাঠকদের বলতে চাই, “ভাবিয়া করিবেন আমল, আমল করিয়া ভাবিবেন না।”

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি,

যদি পবিত্র কোরআন ও তাঁর তাফসীর এবং সকলের কাছে বিশ্বস্ত রাবীর হাদীস এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, নবী (সাঃ)

আল্লাহ্র হুকুমে নিজের জীবনকালে হযরত আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর উত্তরসূরী ও জনগণের অভিভাবক নেতা, ও তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গেছেন, তা অমান্য করার অধিকার আমাদের কারোরই নেই।

রাসূল (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবীদের মহাসমাবেশে (গাদীরে খুমে) হযরত আলীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছিলেন এবং এ ঘটনার পরই আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা দান করেন। (মায়েদা-৩)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু ব্যক্তিরা এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর হৃদয়বিদারক ওফাতের পরপরই তাঁরই মনোনীত স্থলাভিষিক্তকে উপেক্ষা করে নিজেরা খেলাফতের মসনদ দখল করে নেয়। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্র ভাগ্যাকাশে নেমে আসে এক ঘন কালো মেঘের ছায়া। সেই কালো ছায়া আজও মুসলমানদের জন্য কাল হয়ে রয়েছে। আজ যদি আমরা মুসলিম উম্মাহ্র চরম দৈন্যদশা ও অধঃপতনের নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাসূল (সাঃ) এর প্রকৃত উত্তরসূরী ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতকে উপেক্ষাই এ দুরাবস্থার মূল কারণ। কেননা, “রাসূল (সাঃ) বারবার সাহাবাদেরকে “পবিত্র কোরআন ও তাঁর আহলে বাইতের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।” সুতরাং, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক হবে কি? অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে কি? সাধারণ মানুষ যে ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে নির্বাচন করেছে, তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তার আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা যুক্তিসংগত কি? এটি কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর

মনোনীত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে আমরা নিজেদের মনগড়া ব্যক্তিকে নির্বাচন করি? অথচ পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

আপনার আপলোড করা সর্বশেষ ছবিটির (**image_106923.png**) সকল লেখা নিচে হুবহু কপি করে দেওয়া হলো:

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশদানের পর, কোন মু'মিন পুরুষ ও মোমীন নারীর এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই যে, কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করবে, সে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।" (আহযাব-৩৬)।

"তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনার ওপর বিচারের ভার অর্পণ করে, সেসব বিবাদ বিসংবাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে, আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" (নিসা-৬৫)।

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (আলে ইমরান-১০৫)।

"রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে

বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর আল্লাহতো শাস্তিদানে কঠোর।” (হাশর-৭)।

“কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথাই সে স্থায়ী হবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।” (নিসা-১৪)।

“তারা কি একথা জানেনি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন সেথায় সে অনন্তকাল থাকবে এটা বিষম লাঞ্ছনা।” (তওবা-৬৩)।

“আমি তো তোমাদের কাছে সত্য (হক) পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যের (হকের) প্রতি ঘৃণা পোষণকারী।” (যুখরুফ-৭৮)।

“এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহকে চেনার পর অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যকার অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।” (নাহল-৮৩)।

“বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সত্য জানেই না, তাই তারা সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (আম্বিয়া-২৪)।

“যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, ইয়া রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (নির্বাচিত) নেতাদের এবং আমাদের (নির্বাচিত) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।” (আহযাব-৬৬-৬৭)।

“আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষকে। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম।” (আরাফ-১৭৯)।

সকিফাহ্-ই-বনি সাইদাহ্র নির্বাচনের অবস্থা ও খলিফাতুর রাসূল (সাঃ)-এর প্রয়োজনীয়তা।

রাসূল (সাঃ) এর তিরোধানের পর এমনই এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল যিনি ইসলামী উম্মাহ্র অনৈক্য এবং ইসলামী আইন কানুনের পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ রোধ করতে সমর্থ ছিলেন। কারণ, এমন অনেকে ছিল যারা আপন কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য উম্মাহ্র ঐক্যে ফাটল ধরাতে ও আইন-কানুন পরিবর্তন করে তাতে নিজেদের ধ্যান ধারণা, প্রক্ষেপে সদাসচেষ্ট ছিল। যদি এহেন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় তা হলে রাসূল (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারীত্বের কোন গুরুত্ব থাকে না এবং সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-এর দাফন-কাফন বাদ দিয়ে সকিফাহ্-ই-বনি সাইদাহর সম্মেলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ নেহায়েত বাতুলতা মাত্র। আর যদি রাসূল (সাঃ)-এর উত্তরকালে একজন খলিফাতুর রাসূলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, তাহলে প্রশ্ন এসে পড়ে রাসূল (সাঃ) কি এমন অবশ্যম্ভাবিতা অনুভব করতে পেরেছিলেন? যদি ধরা হয় তিনি এদিকে মনোযোগ দেননি বা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি, তাহলে এটা একটা বিরাট প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় যে, স্বধর্ম ত্যাগ, উম্মাহ্র খণ্ড-বিখণ্ডতা (বিভক্তি) ও দুষ্ট প্রক্ষেপণ রোধ করার উপায় সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর মন শূন্য ছিল। অথচ বাস্তবে এমনটি ছিল না। এহেন অবস্থা সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন। যদি ধরা হয়

তিনি এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কোন সুবিধার কারণে তা অমীমাংসিত রেখে গেছেন তাহলে গুপ্ত রাখার পরিবর্তে তিনিই সুবিধার প্রতি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। কারণ, উদ্দেশ্যবিহীন নীরবতা নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অবহেলার শামিল। যদি কোন বাধা থাকত তবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ত। যেহেতু রাসূল (সাঃ) দ্বীনের কোন বিষয় অসম্পূর্ণ রেখে যাননি, সেহেতু তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রাণপ্রিয় ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অসম্পূর্ণ বা অমীমাংসিত রেখে যেতে পারেন না। এটাই সর্বসম্মত মত। হয়ত তিনি এমন কর্মপন্থা প্রস্তাব করে গেছেন যা কার্যকর হলে অন্যদের হস্তক্ষেপ থেকে দ্বীন নিরাপদ থাকত।

এখন প্রশ্ন হলো সেই কর্মপন্থাটি কি? যদি মনে করা হয় তা উম্মাহ্র ঐক্যমত্য তাহলে তা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না। কারণ, এতে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি প্রয়োজন কিন্তু মানবপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমিত হবে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সকল মানুষের সম্পূর্ণ সম্মতি অসম্ভব। এমন একটা বিষয়ের উদাহরণ দেয়া যাবে না, যাতে কোন না কোন ব্যক্তি ভিন্নমত পোষণ করেনি। খেলাফতের মত একটি মৌলিক বিষয় কিভাবে উম্মাহ্র সর্বসম্মত ঐক্য নামক অসম্ভব কর্মপন্থার উপর নির্ভর করতে পারে? অথচ ইসলামের ভবিষ্যৎ আর মুসলিমের কল্যাণ এই মৌলিক বিষয়টির মুখাপেক্ষী। সুতরাং, মৌলিক বিষয়ের জন্য একটা অসম্ভব প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে বিবেক সাড়া দেয় না। এ প্রক্রিয়ার স্বপক্ষে রাসূল (সাঃ)-এর কোন হাদীস কেউ দেখাতে পারবে না, কাজী ওদুদ আদ্দিন আল ইজি শারহু আল মাওয়াকিফ যথার্থই লিখেছেন, জেনে রাখো, খলীফা নির্বাচন ঐক্যমত্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না।

কারণ, এটার স্বপক্ষে কেউই কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারবে না। বস্তুতঃ সর্বসম্মত ঐক্যমত্যের সমর্থকগণ যখন দেখলো নির্বাচনে সকলের সম্মতি একটা দুরুহ ব্যাপার, তখন তারা সর্বঐক্যমত্যের বিকল্প, সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐক্যমত্য গ্রহণ করলো এবং তাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত দারুণভাবে উপেক্ষিত হলো। এ মত ক্ষেত্রে অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এমন গতি পরিগ্রহ করে যাতে ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ব্যক্তির গুণাগুণ ও উপযুক্ততা বিচার করার কোন সুযোগ থাকে না। এতে প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিই অগোচরে থেকে যায় এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেখানে মানুষের যোগ্যতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অযৌক্তিক প্রবাহ দ্বারা প্রদর্শিত করা হয় এবং প্রভাবশালীদরের ব্যক্তিগত লক্ষ্য ন্যায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করা দুরাশা মাত্র। যদি ধরাও হয় যে, ভোটারগণ পক্ষপাতবিহীন দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন বিবেচনা করেছে এবং তাদের কারোর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সঠিক বা তা বিপথে যেতে পারে না এমন মনে করার যৌক্তিক কারণ নেই। বাস্তবে দেখা গেছে, পরীক্ষানিরীক্ষার পর সংখ্যাগরির্ষ্ঠগণ নিজেদের মতামত ভুল হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর বলেন, "আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করা দারুণ ভুল হয়েছে, কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই তা করা হয়েছিল কিন্তু, এরকম ভুল কাজের কুফল থেকে আল্লাহ্ আমাদেরককে রক্ষা করেছেন। সুতরাং, যদি কেউ এরকম ভুল করতে চায় তবে তোমরা তাকে হত্যা কোরো।"

সূত্র, নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ,জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ, ১৭৩, সহীহ্ বুখারী ,খঃ, ৮, পৃঃ, ২১০ মিশর, আহমাদ বিন হাম্বাল , খঃ, ১ ,পৃঃ, ৫৫ (মিশর) তারিখে তাবারী ,খঃ, ১, পৃঃ,

১৮২২ (লেডেন) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ,খঃ, ৫, পৃঃ, ২৪৬ (মিশর) আল কামিল, খঃ, ২ ,পৃঃ, ৩২৭ (লেবানন) সিরাহ্ আন নাবুবিয়্যাহ ,খঃ, ৪, পৃঃ, ৩০৮ (মিশর) :

সংখ্যাগরিষ্ঠগণের প্রতিটি সিদ্ধান্ত যদি সঠিক বলে মনে করা হয়, তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্ত যার দ্বারা অন্য একটি সিদ্ধান্তকে ভুল বলে স্বীকার করা হয়েছে। তা নিশ্চয়ই ভুল। এ অবস্থায় ইসলামের খলিফা নির্বাচন যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে সে ভুলের জন্য দায়ী কে? এবং ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য কাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে? একইভাবে খলিফা নির্বাচনোত্তর বিক্ষোভ ও গোলমালে যে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব কার? যে সমস্ত লোক সর্বদা রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে বসে থাকতো তারা যেখানে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সেখানে অন্য লোক বাদ পড়ার কথা চিন্তা করা যায় কিভাবে।

যদি ধরা হয় যে, ভবিষ্যত অমঙ্গল এড়ানোর জন্য রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা নির্বাচন দায়িত্ববান লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যেন তারা তাদের পছন্দমত একজনকে নির্বাচিত করে নেয়, তা হলেও একই দ্বন্দ্ব ও সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজমান থেকে যায়। কারণ, সব লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে উঠে একই বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করে কোন কিছু মেনে নিতে পারে না। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশি ছিল কারণ, সকলে না হলেও অধিকাংশ লোক খলিফা পদে প্রার্থী হয়ে বিপক্ষকে পরাজিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতো। এ চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল হতো পারস্পরিক হানাহানি ও সার্বিক অমঙ্গল। সব ঐক্যমত্য প্রক্রিয়ায় বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এতে একজন যোগ্য ব্যক্তি বেছে নেয়ার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ তাদের মধ্যকার কারো

ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে যন্ত্রের মত কাজ করেছিল। আবার এসব কর্তৃত্বকারী লোকদের যোগ্যতার মাপকাঠি কি ছিল? তাদের যোগ্যতা তাই ছিল, যা সচরাচর প্রচলিত অর্থাৎ ক'জন অন্ধ সমর্থক জোগাড় করে জোরালো বক্তব্য দ্বারা সভায় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারলেই কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে সবাই গণ্য করে। কিন্তু প্রথম খলিফা নির্বাচনের রীতি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের বেলায় নজির হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। অথচ সর্বসম্মতভাবে কোন নীতি গৃহীত হলে তা স্থায়ী নীতি হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য পালনীয় হয়ে থাকে।

"সকিফাহ্-ই-বনি সাইদাহর" নির্বাচনের অবস্থা এরূপ ছিল যে, এক ব্যক্তির (হযরত ওমরের) কর্মতৎপরতাকে সর্বসম্মত নির্বাচন এবং এক ব্যক্তির কার্যাবলীকে আলোচনা সভা নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর ভালোভাবেই জানতেন যে, নির্বাচন মানে দু'এক জন লোকের ভোট নয়-সাধারণ জনগণের ভোট। তাই তিনি সুকৌশলে সর্বসম্মত নির্বাচন বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উপেক্ষা করে হযরত ওমরকে (ব্যক্তিগতভাবে) মনোনয়ন করেছিলেন। হযরত আয়েশাও মনে করতেন, জনগণের ভোটের উপর খেলাফতের বিষয়টি ছেড়ে দিলে অকল্যাণ ও সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই হযরত ওমরের মৃত্যুকালে তিনি উনার অভিমত পাঠালেন।

"ইসলামী উম্মাহকে নেতাবিহীন অবস্থায় রেখে যাবেন না। একজন খলিফা মনোনয়ন করুন। অন্যথায়, আমি অমঙ্গল ও সমস্যার আশঙ্কা করছি।" সূত্র, আল ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত (ইবনে কুতাইবাহ), খঃ, ১, পৃঃ, ২৮।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল" (সাঃ) আবার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথায় বেমালুম ছিলেন, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি

হযরত আবু বকর-এর খিলাফত (হিজরী, ১১ -৬৩২, খ্রিঃ) ।

নবী (সাঃ)-এর ওফাত-এর সাথে সাথে মদীনার আনসার নামে পরিচিত (সাহাবিরা) বনি সাকিফাহ্-তে সমবেত হলেন। সেই স্থানটা ছিল জাহেলী যুগে অসৎ আরবদের কোন অসৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হবার গোপন আস্তানা। সূত্র, গিয়াসুল লুগাত, পৃঃ, ২২৮-২৩০।

তখনও সা'দ ইবনে উবাদাহ্ অসুস্থ, তাকে কম্বল জড়িয়ে বেশ রাজকীয় লেবাসে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো, যেন সে খলিফা নিযুক্ত হতে পারে। সা'দ তারপর আনসারদের গুণাবলীর প্রশংসা করে একটা বক্তৃতা দিলেন। এবং তাদের বললেন, আর কোথাও কেউ এ কাজ করার আগেই তারা যেন তাকে খলিফা বানায়। আনসাররা তার কথায় রাজী হয়ে তাকে খলিফা বানাতে চাইলো, কিন্তু তখন তারা নিজেদের ভেতরেই বলাবলি করতে লাগলো যে, কুরাইশ মুহাজিরিনরা এলে কি উত্তর দেবো। তারা যদি একে সরিয়ে নিজেদের দাবি নিয়ে আসে। একটা দল বললো, তাহলে বলবো তোমাদের ভেতর থেকে একজনকে নাও। সা'দ বললেন, এটা হলো তোমাদের দেখানো প্রথম দুর্বলতা।

হযরত ওমরকে কেউ একজন এই বলে সকিফার সমাবেশটার কথা জানিয়ে গেল যে, খুব বেশি দেরী হওয়ার আগে সাকিফাতে চলে যাও, যদি খিলাফতের আসন পেতে চাও, নতুবা কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে সেটা বদলাতে ঝামেলা

হতে পারে। একথা শোনামাত্র হযরত ওমর, হযরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে নবীজির দাফন কাফন বাদ দিয়ে, খলিফা হবার জন্য বনি সাকিফাহতে ছুটে এলেন, যা মদীনা হতে তিন মাইল দূরত্বে ছিল। এবং হযরত আবু বকর ও ওবায়দা ইবনে জারাহকে সঙ্গে নিলেন। আত তাবারী ইবনুল আসির ও ইবনে কুতাইবা এবং অন্যান্যরা তাদের বর্ণনাতে বলেন, যে সাকিফাহতে পৌঁছে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, ও আবু ওবায়দা কোনমতে বসবার জায়গা পেলেন (কারণ বনি সাকিফা একটা ছোট ঘর ছিল বেশি হলে ৫০ থেকে ৬০ জন লোক একসাথে বসতে পারতো)। তখন সাবিত ইবনে কায়েস দাঁড়িয়ে আনসারদের গুণাবলী বর্ণনা করছিল। সে প্রস্তাব করলো যে আনসারদের ভেতর থেকেই কারো এই খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। পরে হযরত ওমর ঘটনাটিকে এভাবে বললেন যে, “আনসারদের ভেতরকার বক্তা যখন বক্তৃতা শেষ করলেন তখন আমি ইতিমধ্যেই ভেবে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু আবু বকর ইঙ্গিতে আমাকে নিশ্চুপ থাকতে বললেন। ফলে আমিও নীরব রইলাম। এরপর তিনি বক্তৃতায়, আমি যে বিষয়গুলো ভেবেছিলাম সেগুলোই বললেন। বরং আরো ভালো করে বললেন। হে সম্মিলিত আনসারবৃন্দ! আমরা আপনাদের ভাল গুণাবলী ও যোগ্যতা জানি। আর ইসলাম রক্ষার জন্য যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করেছেন তাও ভুলিনি। কিন্তু এটা তো আপনারা জানেন, যে আরবদের ভেতর কুরাইশরা অন্যসব গোত্রের কাছে সম্মানিত এবং সম্ভবতঃ আরবরা এ দায়িত্ব “কুরাইশ বংশ ছাড়া অন্য কাউকে দেবে না।”

সূত্র, খিলাফতের ইতিহাস, পৃঃ, ১৩ (ই, ফাঃ)। নাহজ আল বালাঘা, পৃঃ, ২০-২৬ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)। সহীহ্ আল বুখারী, খঃ, ৬, হাঃ, ৬৩৫৭ (আধুনিক, ১৯৯১, ইং)। আল

মুরাজায়াত, পৃঃ, ৩০৫, (আল্লামাহ্ শারাফুদ্দীন মুসাভী)। ইমামত, পৃঃ, ৬৩, (আল্লামাহ্ সাঈদ আখতার রিজভী)। রওয়াদাতুস সাফা, খঃ, ২, পৃঃ, ২২১। আত তাবারী আত তারিখাহ্, খঃ, ৪, পৃঃ, ১৮২০ (মিশর)। আল কামিল, খঃ, ২, পৃঃ, ৩২৫ (লেইডেন)। আল ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত, খঃ, ১, পৃঃ, ১৮ (কায়রো)। তারিখে ইয়াকুবি, খঃ, ২, পৃঃ, ১২৩ (মিশর)। সহীহ্ সহীহ্ বুখারী, খঃ, ৩, পৃঃ, ১৯০ (আরবী)। আল মিনাল ওয়াস নিহাল, খঃ, ১, পৃঃ, ৫৭ (শাহরেস্তানী)। আর রিয়াদ আন নাদেরা, খঃ, ১, পৃঃ, ৩৭২। তারিখ আল খোলফা, পৃঃ, ৪৩।

'আশ সিরাহ্ আল হালাবী'-তে এর পরের ঘটনাটুকু আছে যে, যাই হোক এটা সত্যি যে আমরা মুহাজিররাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করি, নবী (সাঃ)-ও ছিলেন আমাদেরই গোত্রের। আমরা নবী (সাঃ)-এর আত্মীয় .... এবং তাই আমাদেরই কারো এই সম্মান পাওয়া উচিত। এটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে আমাদের ভেতরই কেউ নেতৃত্ব পাক আর আপনারা হবেন তাদের মন্ত্রণাদাতা। আপনাদের সাথে পরামর্শ না করে আমরা কোন কাজ করবো না। সূত্র, আশ সিরাহ্ আল হালাবী, খঃ, ৩, পৃঃ, ৩৫৭।

প্রচুর বাকবিতণ্ডা ও যুক্তির মধ্যে হযরত ওমর চেঁচিয়ে উঠলেন যে, আল্লাহ্ কসম! যে আমাদের বিরোধিতা করবে তাকে খুন করে ফেলবো। খাজরাজ গোত্রের একজন আনসার আল হুবাব ইবনে আল মুনজীর ইবনে জায়েদ তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলে উঠলেন, আল্লাহ্ কসম! আমাদের উপর অন্য কাউকে খলিফা হতে দেবো না। তোমাদের ভেতর থেকে আসবে একজন এবং আমাদের ভেতর থেকে আসবে একজন। হযরত আবু বকর বললেন না, সেটা হতে পারে না। এটা আমাদের অধিকার আমরা শাসক হবো, আর তোমরা হবে

মন্ত্রণাদাতা, আল হুবাব বললো, হে আনসারগণ! এই লোকেরা যা বলে সে কথার কাছে নিজেদের সমর্পণ করো না। শক্ত হও ..... আল্লাহ্ কসম! আমার কথার প্রতিবাদ করার সাহস যদি কেউ করে আমি এই তলোয়ার দিয়ে তার নাক কেটে দেবো। হযরত ওমর মন্তব্য করলেন "আল্লাহ্র কথামতো দু'জন খলিফা হওয়া ঠিক নয়। একই রাজত্বে দু'জন রাজা থাকতে পারে না।" আরবরা তোমাদের নেতৃত্বে রাজী হবে না কারণ, মহানবী (সাঃ) তোমাদের গোত্রের নয়। আত তাবারী ও ইবনুল আসির দু'জনেই বর্ণনা করেন যে, এরপর শান্তভাবে আল হুবাব এবং হযরত ওমর এ বিষয়ে অনেকক্ষণ বাক্য বিনিময় করেন। এক মুহূর্তে হযরত ওমর আল হুবাবকে অভিশাপ দেন, আল্লাহ্ তোমাকে মেরে ফেলুক, আল হুবাব উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকেও মেরে ফেলুক। এরপর হযরত ওমর সামনে এগিয়ে সা'দ ইবনে উবাদাহ এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা তোমাদের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙে দেবো। ধমকের ফলে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সা'দ দাঁড়িয়ে পড়ে ও হযরত ওমরের দাড়ি ধরে ফেলে। হযরত ওমর বলেন, যদি একটা চুলও ছেঁড়ে তবেতোমার সাথের কেউ আস্ত রইবে না। তারপর হযরত আবু বকর, হযরত ওমরকে শান্ত ও ভদ্র হতে অনুরোধ করেন। সাদের দিক থেকে হযরত ওমর মুখ ঘুরিয়ে নেন, তখনও সা'দ বলে চলছিল, আল্লাহ্র কসম! আমার যদি দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে মদীনার প্রতিটি কোণায় তোমরা সিংহের গর্জন শুনতে পেতে এবং গর্তে লুকাতে। আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে দ্বিতীয়বার সেই মানুষদের মাঝে পাঠাবো যেখানে সাধারণ হয়েছিলে নেতা হতে পারনি। ইবনে কুতাইবাহ্ বলেন, যখন আউশ গোত্রের নেতা বশির ইবনে সা'দ লক্ষ্য করেন যে, আনসাররা খাজরাজ গোত্রের প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ এর পিছে গিয়ে সম্মিলিত হচ্ছে তখন প্রতিহিংসার বশে তিনি দাঁড়িয়ে কুরাইশ মুহাজিরদের পক্ষে দাবী তোলেন। এই সুযোগে

হযরত ওমর হযরত আবু বকরকে বলেন যে, "আপনি আপনার হাতটা বাড়ান যেন আপনাকে আমি বায়াত দিতে পারি"। হযরত আবু বকর বললেন, না, "তোমার হাতটাই বরং বাড়িয়ে দাও যেন আমি তোমার হাতে বায়াত দিতে পারি, কারণ তুমি আমার চেয়ে শক্তিশালী এবং খিলাফতের জন্য উপযুক্ত।" হযরত ওমর, হযরত আবু বকরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এই বলে তার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন যে, আপনার মেধা ও কৃতিত্বের তুলনায় আমার শক্তির কোন মূল্য নেই। আর এর যদি কোন মূল্য থেকেও থাকে তবে আপনার খিলাফতের সাথে এটা যুক্ত হলে আপনি সফল হবেন। বশির ইবনে সা'দ আনুগত্য মেনে নিল।

খাজরাজদের একজন তলোয়ার খাপ থেকে বের করলো কিন্তু বাকিরা তাকে সামনে রাখলো। যখন তারা এইসব তর্কাতর্কি ও কে খলিফা হবে, এই বিবাদে লিপ্ত সে সময়, "(আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত খলিফা, ইমাম, হাদী, পথপ্রদর্শক, উত্তরসূরী ও উত্তরাধিকারী)" হযরত আলী নবী (সাঃ)-এর ওসিয়ত মাফিক তাঁর প্রকৃত সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় মহানবী (সাঃ) এর দাফন-কাফনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বর্তমানে অনেককে বলতে শোনা যায় যে, রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের তিন-চার দিন আগে তাঁর অসুস্থতার কারণে আবু বকরকে নামাজের ইমামতী করতে হুকুম দেন এবং পরে নিজেই তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করেন। এটাই নাকি আবু বকরের খলিফা হওয়ার ইঙ্গিত বহন করতো। নামাজের ইমামতী করলেই কি খলিফা হওয়া যায়? বনী সাকিফাতে তিনদিন পর্যন্ত কথা কাটাকাটি, দাড়ি ধরে টানাটানি, ধস্তাধস্তি, মারামারি চললো। কে খলিফা হবে তা নিয়ে, কিন্তু কই একজনও তো বলেনি যে, মিয়ারা তিনদিন আগেই না নবীর হুকুমে তোমরা সবাই আবু বকরের ইমামতীতে নামাজ পড়েছ,

কেন তাকে খলিফা বানাচ্ছো না? অন্ততঃ আবু বকরের বলা উচিত ছিল যে, তোমরাতো আমার পিছনে নামাজ পড়েছ। (যদি সত্যিই তিনি নামাজ পড়িয়ে থাকতেন) তাহলে সেই দিন দাড়ি ধরে কোন টানাটানি হতো না, একদিনেই খলিফা নির্বাচন হতো। কিন্তু সকিফাতে সেই দিন কেউই সে কথা বলেনি, এখন যা বলা হচ্ছে। আসলে এইসব কথা অনেক পরে উমাইয়াদের রাজত্বকালে রচনা করা হয়েছে।

ইবনে কুতায়বাহ লিখেছেন, যখন হযরত আবু বকর খিলাফত গ্রহণ করেছেন, তখন হযরত আলীকে তাঁর সামনে হাজির করা হয় এবং তিনি বার বার বলছিলেন, “আমি আল্লাহ্র দাস এবং আল্লাহ্র রাসূলের ভাই।” তারপর হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের (হাতে বায়াত) আনুগত্য স্বীকারের হুকুম করা হলো। তখন হযরত আলী বললেন, “খিলাফতের প্রতি আপনাদের যে কারোর চেয়ে আমার অধিকার বেশি। আমি আপনার বায়াত গ্রহণ করবো না। আমার হাতে আপনাদের বায়াত গ্রহণ করা উচিত, তোমরা রাসূলের নিকটাত্মীয়। আর নিকটাত্মীয়রাই খিলাফত পাবার যোগ্য। এ কথা বলেই তো আপনারা আনসারদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেননি। এ নীতিমালা অনুযায়ীই তো খিলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা আপনাদের উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা রাসূল (সাঃ)-এর বংশধর (আহ্লে বাইত) থেকে খিলাফতকে কেড়ে নিয়ে জবর দখল করেছেন। আপনারা কি আনসারদের নিকট দলিল পেশ করেননি যে, আমরা খেলাফতের বেশি হকদার। কেননা রাসূল (সাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্য হতে। এ কারণেই আপনারা এখন আমাদের আনুগত্য করেন এবং খিলাফতে আমাদের হক ছেড়ে দিন। আনসারদের নিকট আপনাদের পেশকৃত দলিল অনুযায়ী আমিও এখন আপনাদের কাছে দলিল পেশ করছি যে, আমি আপনাদের চেয়ে বেশি রাসূল (সাঃ)-এর নিকটাত্মীয়,

তাই খিলাফত আমার প্রাপ্য। আপনাদের যদি সামান্য ঈমানও থাকে তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে খিলাফত আমার হাতে ছেড়ে দিন। আর যদি জালিম হতেই পছন্দ করেন তাহলে যা খুশি তাই করুন এতে আপনারা স্বাধীন"। এসব কথা শুনে হযরত ওমর জবাব দিলেন, বায়াত গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি আপনাদের ছাড়বো না। এতে "হযরত আলী ভীষণ রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন—ওমর তুমি বেশ আনন্দ করে দুধ দোহন করছো। এতে তোমার অংশ আছে। খিলাফতের ব্যাপারে তুমি আজ হযরত আবু বকরের সাহায্য করছো কেননা, কাল খিলাফত তোমার কাছে ফিরে যাবে আমি তাঁর হাতে কখনো বায়াত গ্রহণ করবো না।" সূত্র, হযরত আবু বকর (রাঃ) পৃঃ, ৮৬-৯১ (মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল) (আধূ, প্রাঃ) ইমামাত ও সিয়াসাত, পৃঃ, ১৯, শারাহ্ নাহজু আল বালাঘা, খঃ, ১৮, পৃঃ, ৫১৬ (ইবনে হাদীদ)।

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (আঃ) সাহাবাদের এই কার্যে বিশেষতঃ আবু বকর ও ওমরের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। রাসূল (সাঃ)-এর পরে হযরত আলী খলিফা হবেন, হযরত ফাতেমা (আঃ) মনে মনে এই ধারণাই পোষণ করতেন। কাজেই আবু বকরের খলিফা নির্বাচিত হওয়াকে তিনি মোটেই সমর্থন করতে পারলেন না। এমনকি তিনি বিভিন্ন আনসারগণকে ডেকে খেলাফতের ব্যাপারে হযরত আলীর স্বপক্ষে মত প্রকাশের পরামর্শ দিলেন। অবশ্য তারা বললেন যে, আমরা যখন আবু বকরের খেলাফতের উপরে একবার বায়াত করে ফেলেছি এখন তা কিভাবে ভঙ্গ করব? তবে এটা সত্য যে হযরত আলীর নাম পূর্বে প্রস্তাব করা হলে আমরা অবশ্যই তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিতাম। জবাবে হযরত ফাতেমা বললেন যে, "তোমরা কি এটাই ভাল মনে করছো যে, রাসূল (সাঃ)-এর দাফন-কাফন ফেলে, হযরত আলীও অন্যান্যদের

মত (আবু বকর ও ওমর) খেলাফতের ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেতেন?” তিনি আরও বললেন, “হাসানের পিতা আলী যা করেছে এটা তাঁর জন্য শোভনীয় এবং উচিত ছিল। জেনে রাখ, যারা রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি এই ব্যাপারে চরম অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেছে তারা নিশ্চয় কেয়ামতে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।”

সূত্র, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ১০৯, ১১০, ১১৯ (রাহমানিয়া লাইব্রেরী) হযরত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ১৭৭, ১৮০, ১৮৯, ১৯০ (হামিদিয়া লাইব্রেরী) হযরত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ৫৯, ৬২, ৬৭, ৬৮ (তাজ কোং) তারিখে খোলফা, পৃঃ ১১৯।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পরপরই তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম ও দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল তা অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক ও হৃদয় বিদারক। যদিও রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খাতুনে জান্নাত মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন তবুও এ অল্প সময়ের শোক ও দুঃখ-দুর্দশা ছিল বর্ণনাতীত। এ বিষয়ে প্রথম যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহলে রাসূল (সাঃ)-এর দাফন-কাফনের কথা চিন্তা না করে তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক ফেলে রেখে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তারা সকিফা-ই-বনি সাইদায় চলে গিয়েছিল। সূত্র, সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ২, হাঃ ২২৮৩ (আধুনিক)

স্বাভাবিকভাবেই তাদের এহেন আচরণ খাতুনে জান্নাতকে আহত করেছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর সামনে যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার কথা বলতো, তারা রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা দখলের জন্য এমনভাবে পাগলপারা হয়ে পড়েছিল যে, রাসূল (সাঃ)-এর একমাত্র শোকাহত কন্যাকে একটু সান্ত্বনা দিতেও এলো না

তখন তাঁর হৃদয় ব্যথাতুর হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি কখন রাসূল (সাঃ) কে শেষ গোসল দেয়া হয়েছিল এবং কখন তাঁকে দাফন করা হয়েছিল এসবের কিছুই তারা জানলো না। যেভাবে তারা রাসূল (সাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় কন্যার দরজার সামনে এসেছিল তা হলো—তারা আগুন জ্বালাবার উপকরণসহ দল বেঁধে তাঁর ঘরের সামনে জড়ো হয়ে জোরপূর্বক বায়াত গ্রহণের জন্য অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছিল।

Ali and Abbas were sitting inside the house of Fatimah, Abu Bakr told Umar: "Go and bring them; if they refuse, kill them." "Umar brought fire to burn the house. Fatimah came near the door and said: "O son of Khattab, have you come to burn our house on me and my children?" Umar replied: "Yes I will, by Allah, until they come out and pay allegiance to the Prophet's Caliph." Sunni reference:- Iqd al-Fareed, by Ibn Abd Rabb, Part 3, Pg. 63

When Umar came to the door of the house of Fatimah, he said: "By Allah, I shall burn down (the house) over you unless you come out and give the oath of allegiance (to Abu Bakr)." Sunni References: - History of Tabari (Arabic), v1, pp 1118-1120 - History of Ibn Athir, v2, p325, - al-Isti'ab, by Ibn Abd al-Barr, v3, p975, - Tarikh al-Kulafa, by Ibn Qutaybah, v1, p20 - al-Imamah wal-Siyasah, by Ibn Qutaybah, v1, pp 19-20

Umar said to Fatimah (who was behind the door of her house): "I know that the Prophet of God did not love anyone more than you, but this will not stop me to carry out my decision. If these people stay in your house, I will burn the door infront of you." Sunni reference: Kanz al-Ummal, v3, p140

Umar asked for wood, and told those people inside the house: "I swear by Allah! who has my soul in his hand, that if you do not come out, I will burn the house." Someone told Umar that Fatimah was inside the house. Umar said: "So what! It doesn't matter to me who is in the house." Sunni reference: al-Imamamh wa al-Siyasah by Ibn Qutaybah, v1, pp 3,19-20

The Prophet (s,w) said, "Fatima is part of me. Whatever upsets her upsets me, and whatever harms her harms me." Sunni reference :- Sahih Muslim, v. 5, p. 54; Khasa'is Al-Imam Ali of Nisa'i, p. 121-122; Masabih Al-Sunnah, v. 4, p. 185; Al-Isabah, v. 4, p. 378; Seir Alam Al-Nubala', v. 2, p. 119; Kenz Al-Omal, v. 13, p. 97; similar wording is related in Al-Tirmidhi, v. 3, Chapter on the Virtues of Fatima, p. 241; Haliyat Al-Awliya', v.2, p. 40; Muntakhab Kenz Al-Omal, in the margins of Al-Musnad, v. 5, p. 96; Maarifat Ma Yajib Li Aal Al-Bait Al-Nabawi Min Al-Haqq Alaa Men Adahum, p. 58; Dhakha'ir Al-Uqubi, p.

38; Tadhkirat Al-Khawass, p. 279; Yanabi^ Al-Mawadda, v.2, ch. 59, p. 478.

এসব বাড়াবাড়ির মূল উদ্দেশ্য ছিল খাতুনে জান্নাতের পবিত্র ঘরের মর্যাদার্ণ অবস্থান তারা এমনভাবে মুছে ফেলতে চেয়েছিল যেন ভবিষ্যতে আর সেই মর্যাদা ফিরে না পায়। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে দেয়ার মানসে বাগে ফেদাক- এর দাবি মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে খাতুনে জান্নাত মৃত্যুকালে ওসিয়ত করেছিলেন যে, তারা কেউ যেন তাঁর দাফনকালে উপস্থিত না থাকে।

সূত্র, হযরত ফাতেমা জাহরা (তাজ কোং), পৃঃ ৫৯, ৬২, ৬৭, ৬৮। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা (রহমানিয়া লাইব্রেরী), পৃঃ ১০৯, ১১০, ১৯০। হযরত ফাতেমা জাহরা (হামিদিয়া লাইব্রেরী) পৃঃ ১৭৭, ১৮০, ১৮৯, ১৯০। তারিখে খোলফা , খঃ ১, পৃঃ ১৯, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ১, পৃঃ ৫৫, ইবনে হিশাম, খঃ ৪, পৃঃ ৩০৯, তারিখে তাবারী , খঃ ১, পৃঃ ১৮২২ (আরবি) তারিখে তাবারী, খঃ ৯, পৃঃ ১৯২ (ইংরেজি) ইবনে আসির, খঃ ১, পৃঃ ১১১৮, ১১২০ (আরবী) আল ইসতিয়াব, খঃ ৩, পৃঃ ৯৭৫, আল ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত (ইবনে কুতাইবা) , খঃ ১, পৃঃ ১৯-২০, আনসাব উল আশরাফ, খঃ ১, পৃঃ ৫৮২ তারিখে ইয়াকুবি, খঃ ২, পৃঃ ১১৬, ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ), খঃ ২, পৃঃ ৩৬২, কানযুল উম্মাল, খঃ ৩, পৃঃ ১৪০।

অধ্যায়-১৩

এখন সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে “বাগে ফেদাক” সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা জরুরি মনে করছি।

“বাগে ফেদাক” মদীনার নিকটবর্তী হিজাজের একটি সবুজ উর্বর গ্রাম এবং এটা শমরুখ নামক দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত স্থান ছিল। সূত্র, মুজাম আল বুলদান, খঃ ৪, পৃঃ ২৫৮, সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৩, পৃঃ ১০১৫ (মিশর), ওয়াফ আল ওয়াফা (আস সামহুদী), খঃ ৪, পৃঃ ১২৮০ (মিশর), নাহজ আল বালাঘা পৃঃ ৩৬৪-৩৭৫ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

বাগে ফেদাক ইহুদীদের দখলে ছিল। ৭ম হিজরীতে এক শান্তিচুক্তির ফলে বাগে ফেদাকের মালিকানা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট চলে যায়। এ চুক্তির মূল কারণ হলো, খায়বার দুর্গের পতনের পর ইহুদীগণ মুসলিম শক্তি অনুধাবন করতে পেরে তাদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। তদুপরি কিছু সংখ্যক ইহুদী আশ্রয় প্রার্থনা করায় রাসূল (সাঃ) তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তারা একটা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছিল যে, বাগে ফেদাক নিয়ে গিয়ে তাদের অবশিষ্ট এলাকায় কোন যুদ্ধ না করার জন্য। ফলে রাসূল (সাঃ) তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তাই এ বাগে ফেদাক রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হলো এবং এতে অন্যকারো কোন স্বার্থ-স্বামীত্ব ছিল না। এতে কারো কোন স্বার্থ থাকতেও পারে না। কারণ, জিহাদে অর্জিত গনিমতের মালে মুসলমানদের অংশ ছিল। যেহেতু এ সম্পত্তি বিনা জিহাদে পাওয়া গেছে তাই এটাকে “ফায়” বলা হলো এবং রাসূল (সাঃ) একাই এর মালিক ছিলেন এতে অন্য কারো কোন অংশ ছিল না। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন:-

“আল্লাহ্ ইহুদীগণের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলের কর্তৃত্ব দান করেন।” (হাশর-৬)

কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া বাগে ফেদাক অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং এটা রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল এবং এতে কারো কোন অধিকার ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যেহেতু মুসলমানগণ তাদের ঘোড়া ও উট ব্যবহার করে নাই, সেহেতু বাগে ফেদাক রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল।

সূত্র, তারিখে তাবারী খঃ ১, পৃঃ ১৫৮২ (লেইডেন) আল কামিল, খঃ ২, পৃঃ ২২৪ (লেবানন) ইবনে হিশাম, খঃ ৩, পৃঃ ৩৬৮ (মিশর) তারিখে ইবনে খালদুন, খঃ ২, পৃঃ ৪০ (মিশর) তারিখ আল খামিস খঃ ২, পৃঃ ৫৮ (মিশর) সিরাত আল হালাবিয়া খঃ ৩, পৃঃ ৫০ (মিশর) ফুতুহু আল বুলদান (বালাজুরী) খঃ ১, পৃঃ ৩৩, (মিশর)।

ওমর ইবনে খাত্তাবও মনে করতেন যে, বাগে ফেদাক রাসূল (সাঃ)-এর অংশীদারবিহীন সম্পত্তি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে যা দিয়েছিলেন বনি নজিরের সম্পত্তিও এটার অন্তর্ভুক্ত। এটাতে কারো ঘোড়া বা উট ব্যবহৃত হয়নি। তাই এটা আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পদ।

সূত্র, সহীহ্ বুখারী, খঃ ৪, পৃঃ ৪৬ (মিশর) খঃ ৭, পৃঃ ৮২, খঃ ৯, পৃঃ ১২১, সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৫, পৃঃ ১৫১ (মিশর) আস সুনান, খঃ ৩, পৃঃ ১০৯ (মিশর) সুনানে নাসাঈ, খঃ ৭, পৃঃ ১৩২ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ১, পৃঃ ২৫, ৪৮, ৬০, ২০৮ (মিশর) আস সুনান আল কুবরা, খঃ ৬, পৃঃ ২৯।

বিশ্বস্ত সূত্রে এটা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, "রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই উক্ত বাগে ফেদাক তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) কে দান করেছিলেন।" আল বাজজার

আবু ইয়ালা, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুওয়াই ও অন্যান্য অনেকে আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যখন পবিত্র কোরআনের আয়াত:—.

“নিকটবর্তী আত্মীয় পরিজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন।” (বনী ইসরাইল-২৬)।

মদীনা শরীফে হিজরতের সপ্তম বৎসরে এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বললেন, “হে জিবরাইল আত্মীয় স্বজন কারা এবং তাদের কি অধিকার। জিবরাইল আমীন বললেন, আত্মীয়-স্বজন বলতে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) এবং তাঁর অধিকার হলো বাগে ফেদাক তারপর রাসূল (সাঃ) ফাতেমা (আঃ) কে বাগে ফেদাকের মালিকানা সনদ লিপিবদ্ধ করে দিলেন।” এবং এই বাগে ফেদাক শুধু মাত্র খাতুনে জান্নাত-এর প্রাপ্য, যেমন পবিত্র আয়াতে (“ওয়া আতে যাল কুরবা হাক্কাহু”) অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দাও, এখানে এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি বহুবচনের উদ্দেশ্য থাকতো তা হলে অতি সত্বর আল্লাহ্র কালামে আসতো (“ওয়া আতে যাল কুরবা হুকুকা হুম”) অর্থাৎ, আত্মীয় স্বজনদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন।

সূত্র, কেফায়াতুল মোওয়াহেহদীন, খঃ ২, পৃঃ ৪২৮, বয়ানুস সায়াদাহ্, খঃ ২, পৃঃ ৪৩৮, শাওয়াহেদুল তানজিল, খঃ ১, পৃঃ ৩৩৮, কানজুল উম্মাল খঃ ২, পৃঃ ১৫৮, তাফসীরে দুররে মানসুর, খঃ ৪, পৃঃ ১৭৭ (মিশর) মাজমায়াজ জাওয়াইদ খঃ ৭, পৃঃ ৪৬ (মিশর) কানজুল উম্মাল খঃ ৩, পৃঃ ৪৯৩ (হায়দারাবাদ) কহুল মায়ানী খঃ ১৫, পৃঃ ৬২ (মিশর)।

হযরত আবু বকর যখন ক্ষমতা পেলেন, তখন প্রথমে খাতুনে জান্নাতকে বঞ্চিত ও দখলচ্যুত করে তিনি বাগে ফেদাক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নিশ্চয় হযরত আবু বকর, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) এর কাছ থেকে বাগে ফেদাক কেড়ে নিয়েছেন।

সূত্র, শারাহ্ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ১৬, পৃঃ ২১৯ (মিশর) ওয়াফা আল ওয়াফা (আস সামহুদী), খঃ ৩, পৃঃ ১০০০, (মিশর) আস্ সাওয়াইক আল মুহরিকাহ্ (ইবনে হাজর আল হায়তামি), পৃঃ ৩৩২ (মিশর) নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ ৩৮৫।

হযরত আবু বকরের এহেন কাজে খাতুনে জান্নাত (আঃ) সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং তিনি প্রতিবাদ করে বললেন রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় আমাকে বাগে ফেদাক দান করে গিয়েছিলেন। অথচ আপনি তার দখল নিয়ে নিয়েছেন। এতে হযরত আবু বকর, খাতুনে জান্নাতের (আঃ) কথা বিশ্বাস করলেন না এবং সরাসরি সাক্ষী উপস্থাপন করার জন্য বললেন। ফলে, হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আয়মন (রাঃ) খাতুনে জান্নাতের (আঃ) পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। উম্মে আয়মন (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী ছিলেন। তিনি উসামা ইবনে জায়েদ ইবনে আল হারিসাহর মাতা ছিলেন। রাসূল (সাঃ) প্রায়ই বলতেন, “আমার মাতার মৃত্যুর পরে উম্মে আয়মন (রাঃ) আমার মাতা,” রাসূল (সাঃ) তাঁকে বেহেশতবাসীদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

সূত্র, আল মুস্তাদ্রাক আলা আস সাহিহাইন, খঃ ৪, পৃঃ ৬৩ (মিশর), তারিখে তাবারী , খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৬০ (লেডেন), আল ইসতিয়াব , খঃ ৪, পৃঃ ১৭৯৩ (মিশর) উসুদ আল গাবাহ্ (ইবনে আল আসির) , খঃ ৫, পৃঃ ৫৬৭ (মিশর) আত তাবাকাত ইবনে সা'দ, খঃ ৮, পৃঃ ১৯২ (লেডেন)।

কিন্তু হযরত আবু বকর, এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ)-এর দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বালাজুরী লিখেছেন, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) হযরত আবু বকরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) “বাগে ফেদাক আলাদা করে আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং, আপনি আমাকে তা ফেরত দিন।” এতে হযরত আবু বকর তাঁকে বললেন, তিনি যেন উম্মে আয়মন (রাঃ) ছাড়া আরো একজন সাক্ষী হাজির করেন। হযরত আবু বকর আরো বললেন, রাসূলের কন্যা, আপনি জানেন যে, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয় না।

এসব ঘটনার পর একথা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না যে, “বাগে ফেদাক রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এটার দখল খাতুনে জান্নাতের (আঃ) হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সেটা দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর তাঁকে বেদখল করে খাতুনে জান্নাতের (আঃ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আয়মনের (রাঃ) সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। এ বাতিলের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি উল্লেখ করলেন যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হয় না। এছাড়াও জান্নাতের যুবকদের সরদার ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ) খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) এর বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতামাতার স্বপক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং নাবালকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

উল্লেখ করে, হযরত আবু বকর, তা বাতিল করে দিয়েছিলেন। "কিন্তু নবী (সাঃ) যখন বাগে ফেদাক খাতুনে জান্নাত (আঃ) কে দান করলেন, তখন সাক্ষী স্বরূপ, হযরত আলী, (আঃ) উম্মে আয়মান (রাঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আঃ) কে গ্রহণ করলেন তিনি পবিত্র কোরআনের জ্ঞানদানকারী ছিলেন।"

তৎপর রাসূল (সাঃ)-এর গোলাম রাবাহকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু তাকেও প্রত্যাখ্যান করা হলো।

সূত্র, ফুতুহুল আল বুলদান, খঃ ১, পৃঃ ৩২ (মিশর) তারিখে ইয়াকুবি, খঃ ৩, পৃঃ ১৯৫, (লেবানন) মুরুজ আয যাহাব, খঃ ৩, পৃঃ ২৩৭ (মিশর) আল তাওয়া'ইল, পৃঃ ২০৯ (মদীনা) ওয়াফা আল ওয়াফা, খঃ ৩, পৃঃ ১৯৯ (মিশর) মু'জাম আল বুলদান (আল ইয়াকুত হামাবী), খঃ ৪, পৃঃ ২৩৯ (লেবানন) শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ১৬, পৃঃ ২১৬, ২২০, ২৭৪ (মিশর) মুহাল্লা ইবনে হাজম, খঃ ৬, পৃঃ ৫০৭ (মিশর) আস সিরাহ্ আল হালাবিয়া, খঃ ৩, পৃঃ ৩৬১ (মিশর) তাফসীরে ফখরে রাজী, খঃ ২৯, পৃঃ ২৮৪ (মিশর) নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম) পৃঃ ৩৮২।

এ পর্যায়ে একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। তা হলো এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, "বাগে ফেদাক খাতুনে জান্নাতের দখলে ছিল এবং হযরত আলী (আঃ) ও তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন, বাগে ফেদাক আমাদের দখলে ছিল।" সূত্র, নাহজ আল বালাঘা, পত্র-৪৫, পৃঃ ৩৬৩ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

এক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থাপন করতে বলাটা কোন অর্থবহ কথা নয় এটা জুলুম করে অন্যের সম্পত্তি দখল করার তালবাহানা মাত্র। কারণ, সম্পত্তি যার দখলে আছে তার সাক্ষী উপস্থাপন করার

কোন প্রয়োজন নেই বরং যে দখলকারীকে উচ্ছেদ করতে চায় তার দাবীর জন্যই সাক্ষীর প্রয়োজন। কাজেই খাতুনে জান্নাতের সম্পত্তি দখল করার জন্য হযরত আবু বকরের সাক্ষী উপস্থাপন করা আইনসিদ্ধ ছিল। যেহেতু, হযরত আবু বকর এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি সেহেতু আইনের দৃষ্টিতে বাগে ফেদাক খাতুনে জান্নাতের মালিকানাই সঠিক।

কাজেই আরো সাক্ষী বা প্রমাণ হাজির করার জন্য তাঁকে বলাটা, অন্যায় বই কিছু নয়।

এটা একটা অবাক করার বিষয় যে, হযরত আবু বকরের কাছে অনেকেই একই ধরনের অনেক দাবী পেশ করেছিল। তিনি কোন সাক্ষী প্রমাণের প্রশ্ন না তুলেই দাবীদারকে তাদের দাবীকৃত সম্পত্তি দিয়েছিলেন। অথচ, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) এর বেলায় তিনি এসব তালবাহানা করে তাঁদেরকে দুঃখ কষ্টে নিপতিত করেছিলেন। এ বিষয়ে হাদীসবেত্তাগণ লিখেছেন,

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, "যখন বাহরাইন হতে যুদ্ধলব্ধ মাল পৌঁছবে তখন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী, অমুক অমুক জিনিসগুলো পাবে " কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর আপনার আপলোড করা একদম সর্বশেষ ইমেজটির (**image_1142f7.png**) লেখাগুলো নিচে হুবহু দেওয়া হলো:

ওফাতের পূর্বে সে মাল এসে পৌঁছায়নি। হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে সেটা মদীনায় পৌঁছালে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ), হযরত আবু বকরের কাছে গিয়েছিলেন।

তখন হযরত আবু বকর ঘোষণা করলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যাদের কোন দাবী- দাওয়া আছে অথবা রাসূল (সাঃ) যদি কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সে যেন তার দাবী নিয়ে আসে। এতে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে অমুক অমুক মালগুলো দেয়ার কথা বলেছিলেন। হযরত আবু বকর, বাহরাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল হতে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) কে তা দিয়েছিলেন।

সূত্র, সহীহ্ আল বুখারী খঃ ২, হাঃ ২৪০৯ (আধূ) সহীহ্ বুখারী খঃ ৩, পৃঃ ১১৯, ২০৯, ২৩৬, খঃ ৪, পৃঃ ১১০, খঃ ৫, পৃঃ ২১৮ (মিশর) সহীহ্ মুসলিম খঃ ৩, পৃঃ ৭৫ (মিশর) সহীহ্ তিরমিজী খঃ ৫, পৃঃ ১২৯ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৩, পৃঃ ৩০৭ (মিশর) আত তাবাকাত ইবনে সা'দ, খঃ ২, পৃঃ ৮৮, (লেডেন)।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী লিখেছেন,

এ হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র একজন সাহাবির সাক্ষ্য পূর্ণসাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা জায়েজ—এমন কি, যদি সে সাক্ষ্য তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যও হয়। কারণ, “হযরত আবু বকর, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) কে তার দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী হাজির করতে বলেননি।”

সূত্র, ফি শারহু সহীহ্ আল বুখারী খঃ ৫, পৃঃ ৩৮০ (ইবনে হাজার আল আসকালানী) (মিশর) উমদাহ্ আল কারী ফি শারহু সহীহ্ আল বুখারী খঃ ১২, পৃঃ ১২১ (আল আয়নী আল হানাফী) (মিশর)।

এখন প্রশ্ন হলো, কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না করেই, যখন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) কে দাবীকৃত সম্পদ তাকে দেয়া হয়েছে, তখন খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ)-এর দাবীকৃত সম্পত্তি একইভাবে ফেরত দিতে কিসে আবু বকরকে বাধা দিয়েছিল? হযরত জাবিরের (রাঃ) প্রতি তার যদি এমন ধারণা হয়ে থাকে যে, সে মিথ্যা বলে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করবে না। তবে খাতুনে জান্নাতের প্রতি তার এ ধারণা হতে কিসে তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে যে, "খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) কি এক টুকরা জমির জন্য রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারেন?" কারণ, খাতুনে জান্নাতের সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদিতা ও সততাই তো তাঁর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ছিল। কারণ (সূরা, আহযাবের-৩৩, আয়াতে) তাঁদেরকে, আল্লাহ্ পাক-পবিত্র ও মাসুম ঘোষণা করেছেন। (সূরা, আলে ইমরানের-৬১, আয়াতে) মোবাহেলার মাঠে শ্রেষ্ঠ সিদ্দীকা ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা, শুরা-২৩, আয়াতে) তাদের মোয়াদ্দাত ফরজ করা হয়েছে ও নামাজে নবীজীর সাথে দরুদ না পড়লে নামাজ কবুল হয় না, (সূরা, আহযাবের-৫৬, আয়াতে) তবু আবু বকরের সন্তুষ্টির জন্য তিনি হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আয়মনের (রাঃ) মত সম্মানিত সাক্ষী উপস্থিত করেছিলেন। একথা বলা হয়ে থাকে, পবিত্র কোরআনের নিম্নের আয়াতের নীতির অনুসরণে খাতুনে জান্নাতের দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

"দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে; দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী রাখবে।" (বাকারা-২৮২)।

পবিত্র কোরআনের উক্ত নীতি যদি সর্বক্ষেত্রে সর্বজনীন হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটা প্রয়োগ থাকবে। কিন্তু একদিন একজন আরববাসী রাসূল (সাঃ)-এর সাথে একটি উট

নিয়ে বিরোধ করে। এতে খুজায়মা ইবনে সাবিত আনসার, রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। এই একজনের সাক্ষ্যকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

কারণ, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে কারো কোন প্রকার সংশয় ছিল না। এ কারণেই "রাসূল (সাঃ) তাকে জুল শাহাদাতাইন (দু'জন সাক্ষীর সমান) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।"

সূত্র, সহীহ্ বুখারী, খঃ ৪, পৃঃ ২৪, খঃ ৬, পৃঃ ১৪৬ (মিশর) আস সুনানে নাসাঈ, খঃ ৭, পৃঃ ৩০২ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৫, পৃঃ ১৮৮ (মিশর) আল ইসতিয়াব, খঃ ২, পৃঃ ৪৪৮ (মিশর) উসুদ আল গাবাহ্, খঃ ২, পৃঃ ১১৪ (মিশর) আল মুসান্নাফ, খঃ ৮, পৃঃ ৩৬৬ (লেবানন)।

ফলতঃ এ ব্যবস্থার কারণে আয়াতটির সাধারণত্ব প্রভাবিত হয়নি বা এটা সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধানের বিপরীত কিছু নয়। সুতরাং, রাসূল (সাঃ)-এর মতানুসারে সত্যবাদিতা গুণের জন্য একজন সাক্ষীকে দু'জন সাক্ষীর সমান ধরে নেয়া হয়ে থাকে। তাহলে খাতুনে জান্নাতের (আঃ) পক্ষে হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আয়মনের (রাঃ) সাক্ষ্য কি তাঁদের নৈতিক মহত্ব ও সত্যবাদিতার জন্য যথেষ্ট ছিল না? নবী (সাঃ) বলেছেন যে, "আলী রয়েছে সত্যের সাথে এবং সত্য রয়েছে আলীর সাথে, ইয়া আল্লাহ্! সত্যকে সেইদিকে ফিরিয়ে দাও যেদিকে আলী যায়।"

সূত্র, তাফসীরে কাবির, খঃ ১, পৃঃ ১১১, (মিশর) জামেউস সাগির, খঃ ২, পৃঃ ৭৪, ৭৫, ১৪০, তারিখুল খোলফা, পৃঃ ১১৬, ইযালাতুল খিফা (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) ১, পৃঃ ১৫৮, ৫৪৮।

নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, “আলী কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে, উভয়ে হাউজে কাউসারে আমার সামনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।” সূত্র, তাকমীনুল ইমান, পৃঃ ৯৭, (শায়খ আব্দুল হক দেহলভী) (ই.ফাঃ) ইযালাতুল খিফা, খঃ ২, পৃঃ ৫৪৭, (শাহ ওয়ালিউল্লাহ)।

রাসূল (সাঃ) প্রায়ই বলতেন, “আমার মাতার মৃত্যুর পরে উম্মে আয়মন (রাঃ) আমার মাতা,” রাসূল (সাঃ) তাঁকে বেহেশতবাসীদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সূত্র, আল মুস্তাদ্রাক আলা আস সাহিহাইন, খঃ ৪, পৃঃ ৬৩ (মিশর), তারিখে তাবারী খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৬০ (লেডেন)।

এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ১২ জনের অধিক সাহাবা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহুর রাসূল (সাঃ) শপথগ্রহণ পূর্বক একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবা ও জুরিসপ্রুডেন্সের কতিপয় পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে অধিকার, সম্পদ ও লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ সিদ্ধান্ত হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান এ খলিফাত্রয় মেনে চলতেন।

সূত্র, সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৫, পৃঃ ১২৮ (মিশর); সহীহ্ তিরমিজি খঃ ৩, পৃঃ ৬২৭ (মিশর) ইবনে মাযাহ, খঃ ২, পৃঃ ৭৯৩ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ১, পৃঃ ২৪৮ খঃ ৩, পৃঃ ৩০৫ খঃ ৫, পৃঃ ২৮৫ (মিশর) মুয়াত্তা ইমাম মালেক, খঃ ২, পৃঃ ৭২১ (মিশর) আসসুনান আল কুবরা, খঃ ১০, পৃঃ ১৬৭ (হায়দরাবাদ) মাজমা আজ জাওয়াইদ, খঃ ৪, পৃঃ ২০২ (মিশর) কানজুল উম্মাল, খঃ ৭, পৃঃ ১৩ (ভারত)।

ইসলামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলে, একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু, হযরত আবু বকরের দৃষ্টিতে খাতুনে জান্নাতের উপস্থাপিত সাক্ষী অসম্পূর্ণ ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি খাতুনে জান্নাতের শপথ নিয়ে তাঁর অনুকূলে রায় দিতে পারতেন। কিন্তু, এখানে মূল উদ্দেশ্যই ছিল খাতুনে জান্নাতকে বঞ্চিত করে হযরত আলীর পরিবারকে অভাব ও অনটনে নিপতিত করা এবং খাতুনে জান্নাতের সত্যবাদিতাকে কলঙ্কিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁর প্রশংসা চাপা পড়ে যায়।

খাতুনে জান্নাত (আঃ) যখন হযরত আবু বকরের কাছে বাগে ফেদাক দাবী করলেন, তখন হযরত আবু বকর (কোরআন পরিপন্থী হাদীস দ্বারা) খাতুনে জান্নাতের (আঃ) দাবী নাকচ করেছিলেন। এই বলে যে, নবী (সাঃ) নাকি তাকে বলেছেন, "আমাদের নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী নেই, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদকা হবে।"

সূত্র, সহীহ্ বুখারী, খঃ ৩, হাঃ ২৮৬০, ৩৪০৬, ৩৪০৭, ৩৪০৮, খঃ ৪, হাঃ ৩৭০৪, খঃ ৬, হাঃ ৬২৬৮, (আধুনিক) সহীহ্ বুখারী, খঃ ৪, পৃঃ ৯৬, খঃ ৫, পৃঃ ২৫, খঃ ৮, পৃঃ ১৮৫, (মিশর) তিরমিজী, খঃ ৪, পৃঃ ১৫৭, (মিশর)।

হযরত আবু বকর ছাড়া রাসূল (সাঃ)-এর এহেন উক্তি আর কারো জানা ছিল না। এমনকি সাহাবাদের মধ্যে আর কেউ-ই এমন কথা শুনেনি। আল্লামা সুয়ুতী ও ইবনে হাজর হায়তামী লিখেছেন, রাসূলের (সাঃ) ওফাতের পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। হযরত আবু বকর বলেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) নাকি তাকে বলেছিলেন, "আমাদের নবীগণের কোনো উত্তরাধিকারী নেই এবং আমরা যা কিছু রেখে যাই, সবই সাদকা হয়ে যায়।

সূত্র, তারিখ আল খোলফা, পৃঃ ৭৩ (আল্লামা সুয়ুতী, মিশর) আস্ সাওয়াইক আল মুহরিকাহ, পৃঃ ১৯১ (ইবনে হাজর হায়তামী, মিশর)।

কোন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় একথা বিশ্বাস করতে পারবে না যে, যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর বংশধর ও ওয়ারিশ ছিলেন তাঁদের কাউকে কিছু না বলে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বলে গেছেন যে, "তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নাই।" এবং সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে সাহাবাগণ অবহিত ছিলেন না। আর এই হাদীস তখনই প্রকাশ করা হলো, যখন খাতুনে জান্নাত (আঃ), বাগে ফেদাক ফেরত দেয়ার জন্য দাবী করলেন যাতে হযরত আবু বকর ছিলেন বিরোধীপক্ষ। এ অবস্থায় তার নিজের অনুকূলে এমন এক হাদীস বর্ণনা করলেন, যা আর কারো জানা ছিল না। কিভাবে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

খাতুনে জান্নাতের (আঃ) সত্যবাদিতা, সততা ও মহৎ মর্যাদার কারণে কেন রাসূল (সাঃ)-এর দান সংক্রান্ত তাঁর দাবী বিশ্বাস করা হলো না? তদুপরি, হযরত আলী (আঃ) ও উম্মে আয়মনের (রাঃ) সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যদি খাতুনে জান্নাতের (আঃ) দাবীর জন্য আরো সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে তা হলে এ হাদীসটি প্রমাণের জন্যও অবশ্যই সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এ হাদীস উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী। নবীদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

"এবং সোলায়মান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী।"
(নামল-১৬)

“সুতরাং তোমরা নিজের থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের উত্তরাধিকারী হবে।” **(**মারইয়াম**-**৫**-**৬**)**।

হযরত আবু বকর একদিন মিম্বরে বসা ছিলেন। এমন সময় খাতুনে জান্নাত (আঃ) তার কাছে এসে বললেন, “হে আবু বকর, কোরআন আপনার কন্যাকে আপনার উত্তরাধিকারী করেছে, অথচ আপনি আমাকে আমার পিতার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন। একথা শুনা মাত্র আবু বকর কাঁদতে কাঁদতে মিম্বর হতে নেমে পড়লেন। তারপর তিনি খাতুনে জান্নাত (আঃ) এর অনুকূলে বাগে ফেদাক লিখে দিলেন। এমন সময় হযরত ওমর সেখানে উপস্থিত হয়ে, এটা কি জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে আবু বকর বললেন, এটা একটা দলিল যাতে আমি লিখে দিয়েছি যে, ফাতেমা (আঃ) তাঁর পিতার উত্তরাধিকারীণী। ওমর বললেন, তুমি দেখছো যে আরবগণ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ দলিল দিলে মুসলিমদের জন্য কোথা হতে তুমি ব্যয় করবে? তারপর ওমর, খাতুনে জান্নাত (আঃ) এর হাত হতে দলিল খানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। সূত্র, “আস সিরাহ্ আল হালাবিয়া খঃ ৩, পৃঃ ৩৬১, (মিশর)।

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, হাদীসটি ছিল জাল এবং খাতুনে জান্নাত (আঃ)-কে বাগে ফেদাক ও রাসূল (সাঃ) এর অন্যান্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার জন্যই এ হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে, খাতুনে জান্নাত (আঃ) এসব তালবাহানার জন্য, আবু বকর ও ওমরের উপর তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ওসিয়ত করে ছিলেন যে, “এ দু'জন যেন তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ না করে।”

খাতুনে জান্নাত (আঃ) আবু বকর ও ওমরকে বললেন যে, "তোমরা কি আমার বর্ণিত হাদীস বিশ্বাস করবে?" তারা উভয়ে বললেন, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করব। তখন খাতুনে জান্নাত (আঃ) বললেন, তবে তোমাদের আমি জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্র শপথ করে বল, রাসূল (সাঃ)-এর মুখে এই হাদীস কি তোমরা শুননি যে, তিনি বলেছেন যে, "যে আমার কন্যা ফাতেমার সহিত মহব্বত রাখে সে যেন আমার সঙ্গে মহব্বত রাখলো, যে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখে, সে যেন আমাকে সন্তুষ্ট রাখে এবং যে তাঁকে নাখোশ করে, সে যেন আমাকে নাখোশ করলো।" উভয় সাহাবীই উত্তরে বললেন, নিশ্চয়ই এই হাদীস আমরা রাসূল (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি।

তখন খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (আঃ) বললেন, "তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমরা আমাকে নাখোশ করেছো, আমার মনে আঘাত দিয়েছ। কেয়ামতে যখন রাসূল (সাঃ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হবে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে অভিযোগ করবো।"

সূত্র, খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ১১২, ১১৯ (রহমানিয়া লাইঃ) হযরত ফাতেমা যাহরা, পৃঃ ৬১, ৬২, ৬৭, ৬৮ (তাজ কোং) হযরত ফাতেমা জাহরা, পৃঃ ১৮০, ১৮৯, ১৯০ (হামিদিয়া লাইঃ) নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ ৩৬৪-৩৭৫। সহীহ আল বুখারী, খঃ ৬, হাঃ ৬২৫৮ (আধূঃ) সহীহ্ বুখারী, খঃ ৩, হাঃ ২৮৬০, ৩৪০৬, ৩৪০৭, ৩৪০৮ (আধুনিক) হিলিয়াত আল আউলিয়া, খঃ ২, পৃঃ ৪৩, (মিশর) আস সুনান আল কুবরা, খঃ ৩, পৃঃ ৩৯, খঃ ৪, পৃঃ ৩৩৪ (হায়দারাবাদ) আনসার আল আশরাফ (বালাজুরী) খঃ ১, পৃঃ ৪০৫ (মিশর) আল ইসতিয়াব, খঃ ৪, পৃঃ ১৮৯৭ (মিশর) উসুদ আল গাবা (ইবনে আসির), খঃ ৫, পৃঃ ৫২৪ (মিশর)। সহীহ্ বুখারী, খঃ ৫, পৃঃ ১৭৭, খঃ ৮, পৃঃ

১৮৫ (মিশর) সহীহ্ মুসলিম খঃ ৫, পৃঃ ১৫৩, সুনান আল কুবরা, খঃ ৪, পৃঃ ২৯, খঃ ৬, পৃঃ ৩০০ (হায়দারাবাদ) আল তাবাকাত ইবনে সা'দ, খঃ ২, পৃঃ ৮৮ (লেডেন) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ১, পৃঃ ৯, (মিশর)। তারিখে তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ১৮২৫ (লেডেন) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৫, পৃঃ ২৮৫ (মিশর) শারহু নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ) খঃ ৬, পৃঃ ৪৬ (মিশর) ওয়াফা আল ওয়াফা, খঃ ৩, পৃঃ ৯৯৫ (মিশর)।

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা **(**আঃ**)** এর ওফাতের পর বাগে ফেদাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

হযরত ওমরের পর যখন উসমান ইবনে আফ্ফান খলিফা হলেন, তিনি তার চাচাত ভাই মারওয়ান ইবনে হাকমকে বাগে ফেদাক দিয়েছিলেন। হযরত উসমানের এহেন স্বজনপ্রীতিই তার প্রতি জনগণের কঠোর মনোভাবের অন্যতম কারণ, যা তাকে হত্যারমধ্য দিয়ে শেষ হয়। এভাবে, বাগে ফেদাক মারওয়ানের দখলে চলে যায়। সে তার ফসল ও উৎপন্ন দ্রব্য বার্ষিক দশ হাজার দিনার ঠিকা চুক্তিতে বিক্রি করতো। উমর ইবনে আবদাল আজিজের খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল বাগে ফেদাকের স্বাভাবিক আয়।

সূত্র, আত তারিখ ইয়াকুবি, খঃ ২, পৃঃ ১৯৯ (লেবানন), আত তারিখ, (আবুল ফিদা) খঃ ১, পৃঃ ১৬৮ (মিশর)। আত তাবাকাত (ইবনে সা'দ), খঃ ৫, পৃঃ ২৮৬, ২৮৭, (লেডেন)। আত তারিখ (ইবনে আল ওয়ারদী) খঃ ১, পৃঃ ২০৪ (লেবানন), আস সুনান আল কুবরা, খঃ ৬, পৃঃ ৩০১, (মিশর)। ওয়াফ আল ওয়াফা, খঃ ৩, পৃঃ ১০০০, (মিশর)। শারহু নাহজ আল বালাঘা, (ইবনে হাদীদ) খঃ ১, পৃঃ ১৯৮ (মিশর)। আল মাআরিফ, (ইবনে কুতায়বা), পৃঃ ১৯৫, (মিশর)। আল ইক্কদ

আল ফারিদ, খঃ ৪, পৃঃ ২৮৩, ৪৩৫ (মিশর)। সুবহ আল আশা, খঃ ৪, পৃঃ ২৯৯ (মিশর)।।

যখন মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান “খেলাফত দখল করে, ৪১ হিজরীতে যখন কোরআন পরিপন্থী আইন রাজতন্ত্র কায়েম করলো”, তখন সে মারওয়ান ও অন্যান্যদের সাথে বাগে ফেদাকের অংশীদার হলো। সে এক তৃতীয়াংশ মারওয়ানকে দিতো, এক তৃতীয়াংশ আমর ইবনে উসমান ইবনে আফফানকে দিতো এবং এক তৃতীয়াংশ তার পুত্র ইয়াজিদকে দিতো। হাসান ইবনে আলীকে হত্যা করানোর পর থেকেই সে এ ব্যবস্থা নেয়। রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের প্রধান তিন বিরোধীর দখলে মারওয়ান খলিফা হবার পূর্ব পর্যন্ত বাগে ফেদাক ছিল। তারপর, মারওয়ান তার পুত্র আবদাল মালিক ও আবদাল আজিজকে বাগে ফেদাক দান করে দিয়েছিলো। আবদাল আজিজ তার অংশ তার পুত্র উমর ইবনে আবদাল আজিজকে দান করে দিয়েছিলো। যখন উমর ইবনে আবদাল আজিজ খলিফা হলেন, তিনি একটা বক্তৃতা দিয়ে বললেন, “নিশ্চয়ই, বাগে ফেদাক ওই সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দান করেছিলেন। বাগে ফেদাকের জন্য কোন লোককে যুদ্ধ করতে হয় নি, কোন ঘোড়া বা উট পরিচালিত হয় নি।” তিনি বাগে ফেদাকের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, “মারওয়ান আমার পিতা ও আবদাল মালিককে বাগে ফেদাক দিয়েছে। ফলে এটা আমার এবং ওয়ালিদ ও সুলায়মানও তার অংশ আমাকে দিয়েছে। ফলে আমি সম্পূর্ণ বাগে ফেদাকের মালিক হয়েছি। আমার কাছে বাগে ফেদাক অপেক্ষা পছন্দনীয় আর কোন সম্পদ নেই। তবুও তোমরা সাক্ষী থাক, আমি প্রকৃত মালিকদেরকে বাগে ফেদাক ফিরিয়ে দিলাম।” তারপর তিনি মদিনার গভর্নর আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজমকে লিখিতভাবে

আদেশ দিলেন বাগে ফেদাক যেন ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরগণকে হস্তান্তর করা হয়। এটা ছিল আলীর (আঃ) সন্তানদের দখলে প্রথমবারের মতো “বাগে ফেদাক ছেড়ে দেয়া।”

“যখন ইয়াজীদ ইবনে আবদাল মালিক খলিফা হলো সে হযরত আলী (আঃ) এর সন্তানদের বেদখল করে পুনরায় বাগে ফেদাক আত্মসাৎ করলো। এরপর হতেই বাগে ফেদাক বনি মারওয়ানের দখলে রয়ে গেল যে পর্যন্ত না বনি আব্বাস ক্ষমতা দখল করলো। এবং মামুন খলিফা হওয়া পর্যন্ত বাগে ফেদাক আব্বাসীয়দের দখলে ছিল।

মামুন খলিফা হবার পর ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরদের হাতে বাগে ফেদাক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মাহদী ইবনে আস-সাবিক লিখেছেনঃ- একদিন মামুন জনগণের নালিশ শুনতে এবং মামলার রায় প্রদান করতে বসেছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থাপিত প্রথম নালিশটির প্রতি তাকিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলের (সাঃ) কন্যা ফাতেমা (আঃ) এর অ্যাটর্নি কোথায়? একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন এবং বাগে ফেদাক সম্পর্কে যুক্তিতর্ক পেশ করলেন। মামুনও তাঁর যুক্তিতর্ক ব্যক্ত করলেন, কিন্তু বৃদ্ধের যুক্তি অনেক জোরালো ছিল। মামুন তখন ইসলামিক ফকিহদের তলব করলেন এবং ফাতিমি বংশের দাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বর্ণনা দিল যে, “রাসূল (সাঃ) ফাতেমা (আঃ)-কে বাগে ফেদাক দান করেছিলেন। রাসূলের (সাঃ) দেহত্যাগের পর ফাতেমা (আঃ) বাগে ফেদাক ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবু বকরের কাছে দাবি করেছিলেন। আবু বকর তাঁর দাবির স্বপক্ষে সাক্ষী হাজির করার জন্য বললে, ফাতেমা (আঃ) দাবির স্বপক্ষে, আলী, হাসান, হোসাইন (আঃ) ও উম্মে আয়মন (রাঃ), ফাতেমা (আঃ) এর দাবির সত্যতা স্বীকার করে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন।

আবু বকর তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়েছিলেন। মামুন ফকিহদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “উম্মে আয়মন (রাঃ) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?” তারা সকলে এক বাক্যে বললো, “তিনি এমন মহিলা ছিলেন যাঁর বেহেশতবাসী হবার নিশ্চয়তার ঘোষণা রাসূল (সাঃ) দিয়েছিলেন।” তখন মামুন ফকিহদের বললেন, “আলী, হাসান, হোসাইন (আঃ) ও উম্মে আয়মনের (রাঃ) সাক্ষ্য শুধু সত্য ছাড়া অন্য কিছু প্রমাণ কি তোমাদের মধ্যে কেউ উপস্থাপন করতে পারবে?” তারা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে বললো “এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।” এরপর তিনি ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরগণকে বাগে ফেদাক ফিরিয়ে দিলেন। এরপর মামুন, ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরগণকে বাগে ফেদাক রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নিজেই দলিলে স্বাক্ষর করলেন। তিনি মদিনার গভর্নর কুছাম ইবনে জাফরকে লিখেছেনঃ- “জেনে রাখো, আল্লাহর দ্বীনের খলিফা হিসাবে আমাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সে ক্ষমতাবলে এবং রাসূলের (সাঃ) স্বজন ও উত্তরাধিকারী হিসাবে সুন্নাতুন্নবি অনুসরণ করা ও তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা আমার পরম দায়িত্ব। রাসূলের (সাঃ)-এর কোন দান তার প্রাপককে ফেরত দেয়াও আমার পরম দায়িত্ব। আমার কৃতকার্যতা ও নিরাপত্তা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আমি সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই, রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যাকে বাগে ফেদাক দান করেছিলেন এবং ফেদাকের মালিকানা ফাতেমা (আঃ) এর নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য। রাসূলের জ্ঞাতিবর্গের কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। ফাতেমা (আঃ) সর্বদা বাগে ফেদাক দাবি করেছিলেন। তাঁর দাবি আবু বকরের বক্তব্য অপেক্ষা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। খলিফা হিসাবে আমি ফাতেমি বংশের হাতে ফেদাক ফিরিয়ে দেয়াই ন্যায় সঙ্গত ও

যথাযথ মনে করি। ন্যায় বিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠিত করে খলিফা আল্লাহুর নৈকট্য পাবার আশা রাখে। রাসূলের (সাঃ) আদেশ কার্যকর করে তাঁর প্রশংসা পাবার আশা রাখে। কাজেই আমি বাগে ফেদাক রেজিস্ট্রি করে ফাতেমি বংশকে ফেরত দিলাম।" আমার এ আদেশ সকল কর্মচারীকে জানিয়ে দিয়ো। হজের সময় জনগণ যখন মক্কায় জমায়েত হয় তখন প্রচার করে দিয়ো, যদি রাসূল (সাঃ) কাউকে কিছু দান অথবা উপহার দেয়ার কথা বলে থাকেন, তবে সে যেন আমার কাছে আসে। তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে এবং তাকে প্রতিশ্রুত বস্তু দেয়া হবে। নিশ্চয়ই, রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ফাতেমা (আঃ) কে বাগে ফেদাক দানের বিষয়ে ফাতেমা (আঃ) এর বক্তব্য সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। নিশ্চয়ই, আমি ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরকে বাগে ফেদাক বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মুবারক আত-তাবারীকে আদেশসহ পাঠালাম। সে ফেদাকের সকল সীমানা, সকল স্বত্ব, সকল কর্মচারী, সকল শস্য ও অন্য সবকিছুসহ তা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়্যা ইবনে হাসান ইবনে জায়েদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবকে বুঝিয়ে দেবে। আমি, খলিফা হিসাবে এ দু'জনকে ফাতেমা (আঃ) এর বংশধরের সকল স্বত্বাধিকারীগণের এজেন্ট নিয়োগ করলাম। জেনে রাখো, এটাই খলিফার আদেশ। আল্লাহ্ তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর ও রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহুই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তোমার অধীনস্থগণকেও একথা জানিয়ে দিয়ো। মুবারক আত-তাবারীর সাথে যেরুপ ব্যবহার করবে অনুরুপ ব্যবহার মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়্যা ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর সাথেও করবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় ফদকের সমৃদ্ধি ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদের দু'জনকে সহায়তা কোরো। বিষয়টি এখানে শেষ করলাম।"

এ পত্র খানা ২১০ হিজরির জিলকদ মাসের ২৮ তারিখ বুধবার মোতাবেক ১৫-২- ৮২৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল।

সূত্র, আল আওয়া ইল, পৃঃ ২০৯, (মদীনা)। ফুতুহ আল বুলদান, খঃ ১, পৃঃ ৩৩, ৩৮ (মিশর)ঃ আত তারিখে ইয়াকুবী, খঃ ২, পৃঃ ১৯৯ (লেবানন)। আল কামিল ফিত তারিখ, খঃ ২, পৃঃ ২২৪, খঃ ৩, পৃঃ ৪৫৭, খঃ ৫, পৃঃ ৬৩, খঃ ৭, পৃঃ ১১৬ (লেবানন)ঃ আল ইক্বদ-উল ফরিদ, খঃ ৪, পৃঃ ২১৬, (মিশর)ঃ ওয়াফা আল ওয়াফা, (আস সামহুদী), খঃ ৩, পৃঃ ৯৯৯ (মিশর)ঃ আত তাবাকাত (ইবনে সা'দ) খঃ ৫, পৃঃ ২৮৬, (লেডেন)ঃ তারিখ আল খুলফা, (সুয়ূতী) পৃঃ ২৩৯, (মিশর)ঃ মুরুজ আয যাহাব, (আল মাসুদী) খঃ ৮, পৃঃ ৮২ (মিশর)ঃ সিরাহ উমর ইবনে আবদাল আজিজ, (ইবনে আল জাওজী) পৃঃ ১১০ (মিশর)ঃ "আ'লাম আন নিসা, খঃ ৩, পৃঃ ১২১১, (দামেস্ক)ঃ শারহু নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ১৬, পৃঃ ২৭৭, (মিশর)ঃ নাহজ আল বালাঘা, পৃঃ ৩৬৪-৩৭৫, (অনুবাদ-জেহাদুল ইসলাম)" জুন, ২০০১, ইং।

এখন সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে সুন্নী সম্প্রদায়ের দু'জন প্রখ্যাত মনীষীর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করছি, যার দ্বারা প্রমাণ হবে যে, বাগে ফেদাক খাতুনে জান্নাত (আঃ) এর হক ছিল। যা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়টি প্রখ্যাত সুন্নী মনীষী ইবনে আবীল হাদিদ তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "আমি আমার শিক্ষক আলী ইবনে

ফারুকী (রহঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর "বাগে ফেদাকের মালিকানা দাবী কি সঠিক ছিল?"

তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম : "তবে কেন প্রথম খলিফা (আবু বকর) তাঁকে বাগে ফেদাক দেননি? অথচ, সে তাঁর নিকট সিদ্দীকা রূপে প্রমাণিত ছিলেন!"

তখন তিনি বললেন, "যদি সেদিন আবু বকর, ফাতেমা যাহরা (আঃ)-এর বাগে ফেদাকের দাবীতে সম্মত হয়ে তা তাঁকে ফেরত দিতেন, তবে পরবর্তীতে সে তাঁর নিকট স্বীয় স্বামীর (হযরত আলীর) খেলাফতের দাবী জানাত এবং একে উক্ত পদ হতে অপসারিত করত। আর এক্ষেত্রে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন দলিল উপস্থাপন করতে পারত না। কেননা, যদি ফাতেমা (আঃ)-এর দাবীনুসারে বাগে ফেদাক ফেরত দিত, তবে তাঁর সকল দাবীর যৌক্তিকতা সুপ্রমাণিত হত এবং সে ক্ষেত্রে কোন সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হত না।" অতঃপর ইবনে হাদীদ বলেন, এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সূত্র, শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ৪, পৃঃ ৭৮ (মিশর)।

"বাগে ফেদাকের" হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সময়ের আবর্তে ইসলামের ইতিহাসে যে সব ঝড় ঝাপটা প্রবাহিত হয়েছিল তা থেকে অত্যন্ত সহজে বুঝা যায় যে, এগুলো ছিল আহলে বাইত (আঃ)-কে, ঐশী খেলাফত ও ইসলামী শাসনক্ষমতা হতে দূরে রাখা এবং ইমামত ও বেলায়েতকে প্রত্যাখ্যানের এক গভীর ষড়যন্ত্র। আর এ সুদূর প্রসারী নীল নকশার চক্রান্তটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

যাই হোক, আমরা খেলাফতের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করি। অধিকাংশেই বিশ্বাস করেন যে, সাকিফাতে যা ঘটেছিল

তা হলো ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। ৫০ থেকে ৬০ জন ব্যক্তি মিলিত হয়ে একটা ঘটনা ঘটালেন, এটা কি "গণতন্ত্র?"

হযরত ওমর বলেন, "আবু বকরের বায়াত গ্রহণ করা দারুণ ভুল হয়েছে, কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই তা করা হয়েছিল, কিন্তু এরকম ভুল কাজের কুফল থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করেছেন। সুতরাং, যদি কেউ এরকম ভুল করতে চায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করো।"

সূত্র, সহীহ্ বুখারী, খঃ ৮, পৃঃ ৪, ২১০ মিশর, আহমাদ বিন হাম্বল, খঃ ১, পৃঃ ৫৫ (মিশর) তারিখে তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ১৮২২ (লেডেন) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৫, পৃঃ ২৪৬ (মিশর) আল কামিল, খঃ ২, পৃঃ ৩২৭ (লেবানন) সিরাহ্ আন নাবাবিয়াহ্, খঃ ৪, পৃঃ ৩০৮ (মিশর) নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ ১৭৩।

হযরত আবু বকর, হযরত ওমর দ্বারা মনোনীত হয়ে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হলো, "যদিও আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, তবুও আমাকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয়েছে, যদি আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি, তবে আমাকে সাহায্য কোরো, আর যদি আমি ভুল করি, তবে তোমাদের দায়িত্ব আমাকে সঠিক পথে (সীরাতে মুস্তাকিমে) পরিচালনা।"

সূত্র, সাহাবা চরিত, খঃ ১, পৃঃ ৭০ (ইফাঃ) খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ৫৮, ইসলামের ইতিহাস (আইডিয়াল লাইঃ), পৃঃ ১০১, আরব জাতির ইতিহাস, পৃঃ ৬০ (বাংলা একাডেমী)

ইমামত (সৈয়দ সাঈদ আখতার রিজভী), পৃঃ ৬০। আত তাবারী, খঃ ২, পৃঃ ৪৫০ (মিশর) তারিখুল খোলফা, পৃঃ ৭১ (মিশর) সিরাতে নাবাবিয়াহ (ইবনে হিশাম), খঃ ৪, পৃঃ ৩১১ (মিশর)।

হযরত আবু বকর অসুস্থ হয়ে পড়লেন **(১৩, হিজরী, ৬৩৪, খ্রিঃ,) ।**

হযরত আবু বকর তার নিজের খিলাফত প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে হযরত ওমরের কাছে ঋণী ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, সাহাবাগণকে যদি পছন্দের স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে হযরত ওমরের খলিফা হওয়ার সুযোগ নেই, সে কারণেই আবু বকর নিজেই তার উত্তরসূরীর মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেন। যিনি হলেন, হযরত ওমর। আত তাবারী লিখেছেন, "হযরত আবু বকর যখন অন্তিম শয্যায়, তিনি হযরত ওসমানকে ডেকে একটি নিয়োগপত্র (ওসিয়তনামামা) লিখতে আদেশ দিলেন" এবং তিনি বলে চললেন, "পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে এটা মুসলমানদের প্রতি আবু বকর এর নির্দেশ যে," তারপর, তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। "হযরত ওসমান তখন একটি শব্দ নিজের ইচ্ছায় যোগ করলেন, "আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে তোমাদের উপর আমার উত্তরসূরী হিসাবে নিয়োগ করলাম।" তারপর হযরত আবু বকর চেতনা ফিরে পেয়ে হযরত ওসমানকে তার হুকুমনামা পড়তে বললেন। হযরত ওসমান তা পড়লেন এবং হযরত আবু বকর বললেন, "আল্লাহু আকবার।" তিনি খুশি হয়ে মন্তব্য করলেন, "তোমরা বোধহয় ভয় পাচ্ছিলে যে, আমি যদি এ অবস্থায় মারা যাই, তাহলে তোমরা নিজেদের মধ্যে মতৈক্যে আসতে পারবে না।" হযরত ওসমান বললেন, "হ্যাঁ।" হযরত আবু বকর বললেন, "আল্লাহ্,

ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তোমাকে পুরস্কৃত করুন।” সূত্র, আত তাবারী, পৃঃ ১২০৮-০৯)।

ইবনে আবীল হাদীদ লিখেছেন যে, “যখন হযরত আবু বকর চেতনা ফিরে পেলেন এবং হযরত ওসমানকে যা লিখতে বলেছিলেন তা পড়তে, যখন পড়লেন তখন হযরত আবু বকর, ওমরের নাম শুনতে পেয়ে বললেন, তুমি এটি কিভাবে লিখলে? হযরত ওসমান বললেন, আমি জানি আপনি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে খলিফা বানাবেন না। তখন হযরত আবু বকর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।”

সূত্র, ফাতাওয়ায়ে-শামী, পৃঃ ৪৫৭ (ই.ফা) আশারা মোবাশশারা, পৃঃ ৪৮, ১২৮ (এমদাদিয়া) হযরত আলী, পৃঃ ৬৮ (এমদাদিয়া) শারহ নাহজ আল বালাঘা, খঃ ১, পৃঃ ১৬৩, আল-কামিল, খঃ ২, পৃঃ ২৯২, কানজুল উম্মাল, খঃ ৩, হাঃ ২৬৬৪। তারিখে মাদীনা, খঃ ২, পৃঃ ৬৬৭ (মিশর)।

এভাবেই নিয়োগপত্র সম্পূর্ণ হলো এবং হযরত আবু বকর সেটিকে সাহাবাদের সামনে পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিলেন। নিয়োগপত্রের মাধ্যমে হযরত ওমর খিলাফত পেলেন।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের অবগতির জন্য একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়েও যখন তাঁর কক্ষ সাহাবীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল, তখন কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

“হে লোক সকল! অতি শীঘ্রই আমার আত্মা, স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং আমি এ পৃথিবী থেকে চলে যাব। আমি

তোমাদের এরূপ একটি কথা বলব, যার পর তোমাদের ওজর পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। জেনে রাখ, আমি কোরআন ও আমার আহলে বাইতকে তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। অতঃপর, হযরত আলীর হাত উঁচু করে ধরে বললেন, এই আলী কোরআনের সঙ্গে এবং কোরআনও আলীর সঙ্গে, তারা হাউজে কাওসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"

সূত্র, আস সাওয়ায়েকুল মুহরেকা (ইবনে হাজর হাইতামী), পৃঃ ৭৫ (মিশর) আরজাহুল মাতালেব (ওবাইদুল্লাহ অমৃতসারী), পৃঃ ৫৭৯ আল খাতীব খাওয়ারেজমী খঃ ১, পৃঃ ১৬৪), তাহজীব আল লুগাত আল আযাহারী খঃ ৪, পৃঃ ৭৮, কাশফ আল আসতাব খঃ ৩, পৃঃ ২২১, হাঃ ২৬১২ (আল বাজজার)।

নবী (সাঃ) বলেছেন, "হে আমার আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি চাও যে, তোমাদের আমি এমন বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেব—যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ ও বিপথগামী হবে না? সেটি হলো, আলী। আমাকে তোমরা যেরূপ ভালবাস, তাকেও সেরূপ ভালবাস। আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা কর, তাকেও সেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান কর এবং আমি তোমাদের যা বলছি তা আল্লাহ্ জিবরাইলের মাধ্যমে আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

সূত্র, কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, হাঃ ২৬২৮ শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ২, পৃঃ ৪৫০ হাঃ ১০, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৫২, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০০ (উর্দু)।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি, নবী (সাঃ)-এর ওফাতের তিন দিন আগের ঘটনা, যখন হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবীরা নবীর পাশে ছিলেন।

নবী (সাঃ) বললেন, “আমাকে তোমরা কাগজ কলম দাও, যাতে আমি ওসিয়তের মতো করে কিছু লিখে রেখে যেতে পারি। যেন তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ো। সঙ্গে সঙ্গে ওমর বললেন, ইনি অসুস্থ (প্রলাপ বলছেন)। আল্লাহ্র গ্রন্থই আমাদের জন্য যথেষ্ট, ওসিয়ত লেখার প্রয়োজন নেই।” হযরত ওমরের কথায় উপস্থিত সকলের মধ্যে উষ্মা ছড়ালো। কেউ কেউ বললেন যে, নবী (সাঃ)-এর আদেশ মানা উচিত, যেন তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যা আশা করেন তাই লিখে যেতে পারেন। আবার অন্যরা গেলেন ওমরের পক্ষে। যখন এই বিবাদ ও তর্ক উঁচুতে উঠলো, তখন নবী (সাঃ) বললেন, “তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে দূর হও।”

সূত্র, সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ১, হাঃ ১১৪, খঃ ৫, হাঃ ২৯৩৬, খঃ ৭, হাঃ ৪০৭৬, খঃ ৯, হাঃ ৫১৫৪ (ইফা) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ১, হাঃ ১১২, খঃ ৩, হাঃ ২৯৩২, ২৮২৫, খঃ ৫, হাঃ ৫২৫৮, খঃ ৬, হাঃ ৬৮৫৩ (আধূঃ) সহীহুল বুখারী খঃ ৫, হাঃ ৫৬৬৯, আরো দেখুন হাঃ ৩০৫৩, ৩১৮৮, ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৭০৬৬ (তাওহীদ প্রকাশঃ আহলে হাদীস), সহীহ্ মুসলিম খঃ ৫, হাঃ ৪০৮৬ ,৪০৮৮, (ই, ফাঃ) আল মুরাজায়াত, পৃঃ ৩২১-৩২৩, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৩, পৃঃ ৩৪৬, (মিশর) তারিখে আহমদী, পৃঃ ৯৭, ৯৯, তারিখে খামিস, খঃ ২, পৃঃ ১৮১ (মিশর) মাসকুরা শরীফ পৃঃ ৪৫৫ (দিল্লি) মেরাজুন নাবুর্যাহ, খঃ ৪, পৃঃ ৩৩০, তারিখে তাবারী, খঃ ৩, পৃঃ ১৯২, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৫, পৃঃ ২৭৭, শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ১, পৃঃ ১৩৩, আল কামিল ফিত তারিখ (ইবনে আসির), খঃ ২, পৃঃ ২১৭, আল ফারুক (আল্লামা

শিবলি নুমানী), পৃঃ ১১১, (উর্দু) মাদারেজুন নাবুর্যাহ, খঃ ২, পৃঃ ৬১১ ,(উর্দু) মিনহাজ-উস-সুন্নাহ (ইবনে তাইমিয়া), খঃ ৩, পৃঃ ১৫৫, আল মেনাল ওয়ালনাহাল পৃঃ ২৩। কানজুল উম্মাল খঃ ৩, পৃঃ ১৩৮, হাঃ ২০২২, আল ফারুক খঃ ১, পৃঃ ৫১,(দিল্লি) সিররুল আলামিন পৃঃ ১০ (ইমাম গাজ্জালী) (মিশর)।

The Prophet (saw) was clearly not asking something out of the ordinary - just a pen and a paper. Yet we read that, some of the companions intervened and said the Prophet (saw) was talking no sense! The phrase 'no sense' is in itself extremely insulting, particularly since it was directed to someone as great as the Prophet (saw) the greatest man of all time. Unfortunately, the English translators have in fact tried to tone down the actual language used by the Companions. The words they used in response to the Prophet's (saw) order were 'this man is speaking yahjur': the word actually means 'incoherent speech - nonsense'. In that there is no doubt, Yahjur comes from the root word "hajara". According to Hans Wehr's "A Dictionary of Modern Written Arabic edited by J. Milton Cowan" Hans Wehr's "A Dictionary of Modern Written Arabic" 6 edited by J. Milton Cowan, 3rd edition - Publishers Ithaca. New York" - page 1019

Hajara means "To emigrate; to give up; to abandon; TO TALK NONSENSE"

In addition to the general definitions of emigrate the Arabic dictionary

আপনার আপলোড করা সর্বশেষ ইমেজের (**image_11bb7c.png**) লেখাগুলো নিচে হুবহু দেওয়া হলো:

"Al Munjhadh" also defines hajara as: "incoherent speech, nonsense" "Al Munjhadh" published by Dar al Ishat, Karachi: - page 1409

In other words, the Companions actually accused the Messenger of Allah [saw] of being in a **state of delirium**.

In the English translation of *Tabari*, the translator has remained faithful to the Arabic text. He narrates from Ibn Abbas: "The Messenger of Allah said bring me a tablet (lawh) and an inkpot (dawat), so that I can write for you a document, **after which you will not go astray**". Some people said that the Messenger of Allah was talking deliriously". The History of Tabari, Volume 9 translated by Ismail. K. Poonawala p 175

“দাওয়াতে জুল আশিরা” থেকে শুরু করে “গাদীরে খুম” এর ঘোষণা পর্যন্ত বারবার রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে খেলাফতের বিষয়ে মৌখিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষবারের মত লেখনীর মাধ্যমে তাঁর খেলাফতের নিযুক্তিটি অসিয়ত করে লেখনীর মাধ্যমে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উক্ত লেখনীটি যদি লেখা হয়ে যেত, তাহলে বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশে যেত। দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। স্বপ্নের ফলাফল উল্টে যেত এবং কৃত যাবতীয় আয়োজন পানিতে ভেসে যেত। সুতরাং, আশা পূরণের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ)-এর শানে চরম বেয়াদবীকেও পরওয়া করা হয়নি, জান প্রাণ দিয়ে নিজেদের মিশনকে সম্পূর্ণ করা হল।

মুসনাদে হাম্বল লিখেছেন, “হযরত ওমর-এর বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, লেখনীর যে সরঞ্জাম যখন রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হচ্ছিল, ওমর সেটাকে কেড়ে, নবী (সাঃ)-এর মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।”

সূত্র, “মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল , খঃ ৩, পৃঃ ৩৬৪ (মিশর ,১৩১৩, হিজরী)।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে— **“**হে ঈমানদারগণ নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বরকে উঁচু করো না।**”** **(**হুজরাত**-**১**-**৪**)**

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের দেখার অনুরোধ রইলো। সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৬, হাঃ ৬৭৯২, (আধূঃ) কুরআনুল করীম (মহিউদ্দিন খান), পৃঃ ১২৭৬।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের আরো দেখার অনুরোধ রইলো।

সূত্র, সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪০০৬, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪৪৭৮, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৫, হাঃ ৫২৯৪, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪৪৭৭, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৩, হাঃ ২৫৩১, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৬, হাঃ ৬১৬৫, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৬, হাঃ ৬৫৬০, (আধুঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ২, হাঃ ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২১, (আধুঃ) মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, খঃ ২, হাঃ ১৩৭৭, (ই, ফাঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ২, হাঃ ২২৭৩,।

“রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।” (হাশর-৭)

“কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথাই সে স্থায়ী হবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনদায়ক শাস্তি (নিসা-১৪)”

“তারা কি একথা জানোনি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন সেথায় সে অনন্তকাল থাকবে এটা বিষম লাঞ্ছনা।” (তওবা -৬৩)

“যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে লা’নত (অভিশাপ) করেন এবং

তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।" (আহযাব-৫৭)

"কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেয়, যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব-৩৬)

"আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে অবশ্যই আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।" (নিসা-১১৫)

যখন রাসূল (সাঃ), তাঁর ওফাতের তিন দিন আগে সাহাবাদের বিপথে না যাবার জন্য ওসিয়তনামা লিখে দিয়ে যেতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে উনাকে প্রলাপ বকার দায়ে অভিযুক্ত হতে হলো। আর যখন, আবু বকর যিনি ঐশীভাবে ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত নন, একটি নিয়োগপত্রের মাধ্যমে তার উত্তরসূরীর নাম দিয়ে যেতে চাচ্ছেন অথচ তিনি তার উত্তরসূরীর নাম বলার আগেই অচেতন হয়ে পড়লেন।

তখন কিন্তু হযরত ওমর বললেন না যে, তিনি প্রলাপ বকেছেন, মহানবী (সাঃ) কি লিখতে চেয়েছিলেন, এটা আগেই আলোকপাত করা হয়েছে, হযরত ওমর জানতেন, নবী (সাঃ) কার নাম ওসিয়ত করে লিখতে চেয়েছিলেন, যা হযরত ওমরের মুখেই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ওমর নিজেই হযরত আব্বাসকে বলেন, “যদিও নবী (সাঃ) কখনো কখনো তাঁর খেলাফতের বিষয়ে উম্মতকে পরীক্ষা করতেন এবং তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, হযরত আলীকে খলিফা মনোনীত করবেন, কিন্তু আমি তা হতে দেইনি।” সূত্র:- শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ১, পৃঃ ১৩৪, খঃ ৩, পৃঃ ১০৫, খঃ ১২, পৃঃ ২১, আল মুরাজায়াত, পৃঃ ৩৬৮।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর বলেন, “আল্লাহ্র কসম। আলীই খেলাফতের হকদার ছিলেন। কিন্তু কোরাইশগণ তাঁর খেলাফত বহন করতে সক্ষম হতো না। কারণ, হযরত আলী খলিফা হলে জনগণকে (সিরাতে মুস্তাকিমে) সত্য এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করতেন। তাঁর খেলাফতে লোকজন ন্যায়বিচারের পরিধি অমান্য করতে পারতো না এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।”

সূত্র:- তারিখে ইয়াকুবী, খঃ ২, পৃঃ ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১৩৭, শারহ নাহজ আল বালাঘা (ইবনে হাদীদ), খঃ ৩, পৃঃ ৯৭, ১০৫, ১০৭ (মিশর)।

হযরত ওমরের খেলাফতের সময় (১৩-২৩, হিজরী, ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিঃ,) ।

যাই হোক, দশবছর রাজ্যশাসন করার পর আবু লুলু কর্তৃক আহত হবার পর, হযরত ওমর বুঝতে পারলেন যে, তিনি আর বাঁচবেন না, তখন হযরত আয়েশা, হযরত ওমরের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, “কাউকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য খলিফা নিযুক্ত করে দিন। উম্মতকে খলিফাবিহীন ছেড়ে যাবেন না। কেননা আমার ভয় হয় যে, ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে।” সূত্র:-

আল ইমামাত ওয়াস সিয়াসাত (ইবনে কুতাইবাহ), খঃ ১, পৃঃ ২৮।

আবার, ওমর ইবনে খাত্তাব যখন আহত অবস্থায় ছিলেন তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এসে বলতে লাগলেন, “লোকেরা” সন্দেহ করছে আপনি কাউকে নিজের খলিফা নিযুক্ত করে যাচ্ছেন না। অথচ আপনার যদি কোন উট বা ছাগলের রাখাল থাকে আর সে তার পাল পরিত্যাগ করে আপনার কাছে চলে আসে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, সে পশুপালের সর্বনাশ করেছে। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটি তার চাইতেও গুরুতর....। সূত্র, সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৫, হাঃ ৪৫৬২, ৪৫৬৩, (ই. ফাঃ)।

শুরা কমিটি

কিন্তু হযরত ওমর খেলাফত বিষয়ে একটি পরামর্শ (শুরা) কমিটি গঠন করলেন। কারণ, হযরত ওমর, হযরত ওসমানের কাছে ভালো রকমেরই ঋণী ছিলেন, ঐ নিয়োগপত্রের জন্য, কিন্তু হযরত ওসমানকে প্রকাশ্যভাবে নিজের উত্তরসূরী হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে যাননি, আবার জনসাধারণেরও স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগও দিলেন না। তিনি “তৃতীয় একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন।” এ কমিটিতে (শুরা কমিটি) তিনি, “হযরত ওসমান, হযরত আলী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জুবায়ের ইবনে আউয়ান, সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে, মোট ছয়জনের সদস্য কমিটি মনোনীত করলেন।” তিনি পরামর্শ কমিটিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন যেন, তার ওফাতের তিন দিনের ভিতরে তাদের মধ্যে হতে একজনকে খলিফা হিসাবে নিয়োগ করেন। এবং “এ তিন দিন সুহাইব খলিফার কাজ চালিয়ে নেবে”, এসব নির্দেশনাবলী পাওয়ার পর কমিটির কয়েকজন সদস্য হযরত ওমরকে

অনুরোধ করলেন যেন তিনি প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেন, যাতে তারা খলিফা নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হযরত ওমর প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করে বললেন, “সা’দ রূঢ় মেজাজের ও উগ্র মস্তিষ্কের লোক, আবদুর রহমান উম্মাহর ফেরাউন, জুবায়েের স্বার্থে তুষ্ট হলে সত্যিকার ঈমানদার কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটলে কট্টর বেঈমান হয়ে পড়ে। তালহা অহঙ্কারী ও উদ্ধত প্রকৃতির, তাকে খলিফা নিয়োগ করলে সে খেলাফতের আংটি তার স্ত্রীর আঙ্গুলে পরিয়ে দেবে। ওসমান তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বাইরে আর কিছুই দেখতে পায়না। এবং আলী যদিও খেলাফতের প্রতি বেশি অনুরক্ত, তবুও আমার মতে খেলাফতকে শুধুমাত্র আলীই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে।”

সূত্র, ইযাযাতুল খিফা, খঃ ২, পৃঃ ৩৯৩। (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ), (উর্দু) নাহজ আল বালাঘা, পৃঃ ২৩। (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

হযরত আলীর যোগ্যতা সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও, হযরত ওমর, পরামর্শ কমিটি গঠন করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত যেন তার ইচ্ছার অনুকূলে যেতে পারে। এবং সেভাবেই তিনি পরামর্শ কমিটির সদস্য মনোনয়ন ও কমিটির কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছিলেন।

একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও একথা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, পরামর্শ কমিটির গঠন ও তার কার্যপ্রণালীর মধ্যেই হযরত ওসমানের জয়ের সকল উপাদান নিহিত ছিল। সেই কার্যপ্রণালীটি নিম্নরূপ :

যদি দুইজন সদস্য একজন প্রার্থীর পক্ষে যায়, তবে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মধ্যস্থতা করবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর যে পক্ষকে নির্দেশ দেবে সে পক্ষই খলিফা নিয়োগ করবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রায় যদি তারা মেনে না নেয়, তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ যার পক্ষে থাকবে, আবদুল্লাহ্ সে পক্ষ সমর্থন করবে। অপরপক্ষ এ রায় অমান্য করলে, তাদের মাথা কেটে হত্যা করা হবে।

সূত্র:- "তারিখ আত তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ২৭৭৯ (লেডেন) "আল কামিল ফিত তারিখ, খঃ ৩, পৃঃ ৬৭ (লেবানন) নাহজ আল বালাঘা, পৃঃ ২৩ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহতে লেখা আছে, তারপর হযরত ওমর, আবু তালহা আল আনসারীকে ডেকে বললেন যে, সে যেন আনসারদের ভেতর থেকে ৫০ জন লোক সংগ্রহ করে, তাদের তরবারী সজ্জিত করে, তারপর উপরোক্ত ছয়জনকে ডেকে তাদের ভেতর যেকোন একজনকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে বলেন। যদি পাঁচজন সম্মত হয়, একজন অসম্মত হয়, তবে তার গর্দান নেবে। যদি চারজন সম্মত হয়, দু'জন অসম্মত হয়, তার গর্দান নেবে। যদি তিনজন অসম্মত হয় তবে যে দলে আবদুর রহমান ইবনে আউফ থাকবে, সেই দলের মত বহাল থাকবে। যদি তাতে বাকি তিনজন সম্মত না হয়, তবে তাদেরও গর্দান নেবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তারা সিদ্ধান্তে আসতে না পারে, তবে প্রত্যেকেরই গর্দান নেবে এবং সাহাবারা তখন যাকে খুশি খলিফা হিসেবে বেছে নেবে।

সূত্র:- ইবনে সা'দ, খঃ ৩, পৃঃ ৬১, বালাজুরী, খঃ ৫, পৃঃ ১৬, ইয়াকুবী খঃ ২, পৃঃ ১৬০, তাবারী, খঃ ২, পৃঃ ২৭৭৮, ইস্তিযাব, খঃ ৪, পৃঃ ১৬৯৭, তাহজীব খঃ ৩, পৃঃ ৪১৪, ইবনে সা'দ খঃ ৩, পৃঃ ৩৪১, ইক্বদ, খঃ ৪, পৃঃ ২৭৫। আল ইমামাহ্ ওয়াস

সিয়াসাত খঃ ১, পৃঃ ২৩ (শারহ নাহজ আল বালাঘা খঃ ১, পৃঃ ১৮৫ (ইবনে হাদীদ) আত তাবারী আত তারিখ খঃ ৫, পৃঃ ৩৩ (মিশর)।

এখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রায়ে অসম্মতির কোন অর্থ হয় না। কারণ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ যার পক্ষে থাকবেন, তাকে সমর্থন দেয়ার জন্য আবদুল্লাহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ওমর তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ও সুহাইবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি সাহাবাগণ মতভেদ করে, তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষাবলম্বন করো। কিন্তু যদি তিনজন একদিকে এবং অপর তিনজন অপরদিকে থাকে, তবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ যে দিকে থাকবে, তোমরা সেদিকে থেকো।

সূত্র, “তারিখে তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ২৭২৫ (লেডেন) তারিখে কামিল, খঃ ৩, পৃঃ ৫১ (লেবানন) নাহজ আল বালাঘা পৃঃ ২০-২৬ (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম)।

হযরত ওমরের ওফাতের পর হযরত আয়েশার ঘরে শুরা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভা চলাকালীন আবু তালহা আল আনসারীর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন লোক উন্মুক্ত তরবারী হাতে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তালহা সভার কার্য শুরু করলেন এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে নিজের ভোট হযরত ওসমানের পক্ষে প্রদান করলেন। এতে জুবায়েরের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছিল, কারণ তার মা সাফিয়াহ্ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ও হযরত আলীর ফুফু। সুতরাং, তিনি হযরত আলীর পক্ষে ভোট দিলেন। অতঃপর, সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তার ভোট আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর পক্ষে প্রদান করলেন। এতে তিনজনের প্রত্যেকেই এক ভোট করে পেয়ে সমান হলো। আবদুর রহমান ইবনে

আউফ এ অবস্থায় একটি ফাঁদ পেতে বললেন, আলী ও ওসমান তাদের দু'জন থেকে একজনকে খলিফা মনোনয়ন করার ক্ষমতা যদি আমাকে অর্পণ করে, তবে আমি আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেব। অথবা তাদের দু'জনের একজন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে খলিফা মনোনয়নের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আবদুর রহমানের এ ফাঁদ হযরত আলীকে সব দিক থেকে জড়িয়ে ফেললো। কারণ এ প্রস্তাবে হয় তাঁকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে খলিফা মনোনীত করতে হবে, না হয় আবদুর রহমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তার ইচ্ছামত যা করেন তাই মেনে নিতে হবে। নিজের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে হযরত ওসমান অথবা আবদুর রহমানকে খলিফা মনোনীত করা, হযরত আলীর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। প্রথম হতেই তিনি বঞ্চিত হয়েও তাঁর অধিকারের দাবি কখনো ছেড়ে দেননি। কাজেই এবারও তিনি মনোনীত খলিফা কর্তৃক ইসলামী উম্মাহর ক্ষতির জন্য তিনিই দায়ী হতেন। সুতরাং, আবদুর রহমান নিজেই তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে মনোনয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন এবং হযরত আলীর হাত ধরে বললেন, যদি আপনি তিনটি শর্তে রাজি থাকেন, তবে আমি আপনার হাতে বায়াত হবো।

প্রথম শর্ত হচ্ছে— আল্লাহ্ গ্রন্থ অনুসরণ করবেন।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে— নবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবেন, এবং

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে— আপনার পূর্ববর্তী দুইজন খলিফার প্রদর্শিত পথ (হযরত আবু বকর ও ওমর এর পথ) মেনে চলতে হবে, তবেই আপনাকে খলিফা পদ দেওয়া হবে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ খুব ভালো করেই জানতেন যে, এর উত্তর কি হবে। হযরত আলী উত্তরে বললেন, "আমি পবিত্র গ্রন্থ, কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবো।"

তৃতীয় শর্তটি যেটি, আবু বকর ও ওমরের প্রদর্শিত পথ, যদি পবিত্র কোরআন ও নবীর প্রদর্শিত পথ-এর আলোকে হয়ে থাকে, তবে সেটা নতুন করে অনুসরণ করার প্রশ্নই আসে না, আর যদি তা পবিত্র কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের বহির্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অনুসরণ করবো না।

সূত্র:- খিলাফতের ইতিহাস, পৃঃ ৫৭-৫৮ (ই, ফাঃ) নাহজ আল বালাঘা (অনুবাদ, জেহাদুল ইসলাম), পৃঃ ২০-২৬ বালাজুরী, খঃ ৫, পৃঃ ২২, ইয়াকুবী, খঃ ১, পৃঃ ১৬২, তাবারী খঃ ১, পৃঃ ২৭৯৩; ইক্কদ; খঃ ৪, পৃঃ ২৭৯, ইবনে হাদীদ, খঃ ১, পৃঃ ১৮৮, ১৯৪।

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

অনেকেই বলে থাকেন যে, "হযরত আলী নাকি, খাতুনে জান্নাত (আঃ)-এর ওফাতের ছয় মাস পর, আবু বকরের হাতে বায়াত করেছিলেন।" যদি এটা সত্য হতো, তবে হযরত আলী কেন পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করলেন ও আবদুর রহমান ইবনে আউফও প্রশ্ন রাখতে পারতেন যে, কেন? আপনি তো এত দিন তাদের বায়াতেই ছিলেন, এখন খলিফাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করছেন কেন, আসলে, হযরত আলী পূর্ববর্তী খলিফাদের বায়াত করেন নি, আবদুর রহমানের পাল্টা প্রশ্ন না করাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, সেই ঘটনা মিথ্যা।

নবী (সাঃ) আমাদের বিদায় হজ্জে দু'টি জিনিসের অনুসরণ করার কথা বলেছেন, "পবিত্র কোরআন ও তাঁর ইতরাত, আহলে বাইত।" সূত্র, সহীহ তিরমিজি, খঃ ৬, হাঃ ৩৭৮৬, ৩৭৮৮ (ই,ফাঃ) মেশকাত, খঃ ১১, হাঃ ৫৮৯২, ৫৮৯৩, (এমদাদীয়া) তাফসীরে মাযহারী, খঃ ২, পৃঃ ১৮১, ৩৯০, (ই,ফাঃ) তাফসীরে হাক্কানী (মাওঃ শামসুল হক ফরীদপুরী), পৃঃ ১২, ১৩ (হামিদীয়া) তাফসীরে নুরুল কোরআন, খঃ ৪, পৃঃ ৩৩ (মাওঃ আমিনুল ইসলাম) সিরাতুন নবী, খঃ ২, পৃঃ ৬০৫ (আল্লামা শিবলি নুমানী) (তাজ কোং) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৫, পৃঃ ৩৪৫, খঃ ৭, পৃঃ ৬১৬, (ই,ফাঃ) মাদারেজুন নাবুর্য্যাত, খঃ ৩, পৃঃ ১১৫, (শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী)।

"আহলে বাইত (আঃ)-এর কাছ থেকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা ও নবী (সাঃ)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা নিতে হবে।" সূত্র, তাফসীরে হাক্কানী (মাওঃ শামসুল হক ফরীদপুরী), পৃঃ ১২, ১৩ (হামিদীয়া)

হযরত আলী (আঃ)-ও আহলে বাইতের সদস্য। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আউফ হযরত আলীকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করার শর্ত আরোপ করছেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত আলীর হাত ছেড়ে দিয়ে হযরত ওসমানের কাছে সেই একই শর্ত আরোপ করলেন, হযরত ওসমান সাথে সাথেই তা গ্রহণ করলেন।

এভাবেই আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত ওসমানকে খলিফা মনোনীত করলেন।

ঘটনাপ্রবাহ হতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, শুরা (পরামর্শ কমিটি) বলতে বিষয়টি প্রথম ছয়জন তৎপর তিনজন এবং সর্বশেষে

একজনের হাতে ন্যস্ত করাকে বুঝিয়েছে কি? তদুপরি, পূর্বের দুই খলিফার কর্মকাণ্ড অনুসরণ করার শর্ত কি হযরত ওমর আরোপ করেছিলেন; নাকি, হযরত আলী ও খেলাফতের মধ্যে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ এ শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন? হযরত আবু বকর, হযরত ওমরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার সময় তো, তার অনুসরণের শর্ত হযরত ওমরকে দেননি। তাহলে, হযরত আলীর ক্ষেত্রে এহেন শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য কি?”

হযরত ওসমানের খেলাফত (হিজরী ২৪-৩৬) ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিঃ) ।

যাই হোক হযরত ওসমানের নিহত হবার পর খলিফার পদ শূন্য হয়ে পড়ে। তখন সাহাবাগণ হযরত আলীর শান্তিপূর্ণ আচরণ, নীতির প্রতি দৃঢ়তা, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা চিন্তা করে হযরত আলীর হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য এমনভাবে ছুটে আসতে লাগলো যেমন পথহারা পথিক দূরে কোন নিশানা দেখে সেদিকে ছুটে যায়। “সাহাবাগণ হযরত আলীকে চাপ প্রয়োগ করে বলল, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করতে চাই এবং আপনি দেখুন ইসলাম আজ কত বিপদের সম্মুখীন, এই অবস্থায় আমরা কিভাবে রাসূল (সাঃ) এর নিকটাত্মীয় সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারি? কিন্তু হযরত আলী কিছুতেই সাহাবাদের অনুরোধে রাজি হচ্ছিলেন না। ফলে, সাহাবাগণ হৈচৈ আরম্ভ করে দিল এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, ইয়া আলী, ইসলাম ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, তা কি আপনি দেখছেন না? বলগাহীনতা, তার ফেতনার বন্যা কিভাবে এগিয়ে আসছে, তা কি আপনি দেখছেন না? আপনার কি আল্লাহ্র ভয় নেই?”

এতদসত্ত্বেও হযরত আলী তাদের প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিলেন না। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর হতে যে হাল চাল মানুষের হৃদয়মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা ঠিক করা দুরুহ ব্যাপার। স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার লোভ তাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাদের সকল ধ্যান ধারণা বস্তুবাদে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সরকারকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উপায় বলে মনে করত। এসব লোক এখন আবার ঐশী খেলাফত বাস্তবায়ন করতে চায়। (যা হযরত আলী, নবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর হতে, নবী দ্বারা মনোনীত হয়ে বহন করে আসছিলেন, হযরত আলী ছিলেন সেই যুগের উলিল আমর্ তাই তার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে।) এবং তারা এখন ঐশী খেলাফত নিয়ে খেলা করতে চায়। বিদ্যমান অবস্থায় তাদের মানসিকতার ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব ছিল। ফলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আরো অধিক চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তাদের বস্তুবার্থ্যে আঘাত লাগলে তারা বলতে না পারে, "সাহাবাগণের চাপ সীমাতিরিক্ত হয়ে পড়লে তিনি বায়াত গ্রহণে রাজি হলেন।" এভাবেই চতুর্থ খলিফা হলেন। সূত্র:- ইক্কদ, খঃ ৪, পৃঃ ৩১৮, বালাজুরী, খঃ ৫, পৃঃ ৭০, ইয়াকুবী, খঃ ২, পৃঃ ১৭৮, তাবারী, খঃ ১, পৃঃ ৩০৬৬, ৪০৭৬ (মিশর)।

অধ্যায়-১৪

পূর্ববর্তী আলোচনার উপর মন্তব্য।

মুসলিম উম্মাহ্ কি নবী (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে পারে? প্রশ্নের উত্তরে, আমি যদি ইমামতকে ইসলামী সমাজের বাহ্যিক নেতৃত্ব বলে মনে করি, তাহলে সমাজের পক্ষে জনসাধারণের ভোটে নেতা নির্বাচন করে নেয়া

সম্ভবপর। কিন্তু, পূর্বে ইমামতের ও খিলাফতের যে ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা মতে মহান আল্লাহ্ ব্যতীত নিঃসন্দেহে অন্য কেউ ইমাম ও খলিফা মনোনয়ন করতে পারবে না।

“আর আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে জনগণের কোন ক্ষমতা নেই।”
(কাসাস-৬৮)

মুফাসসিরগণের মতে, ইমামতের শর্ত হলো ইসলামের সকল নীতি ও আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। যে জ্ঞানের ভিত্তিমূল বেহেশতের সাথে সংযুক্ত এবং যা মহানবী (সাঃ)-এর জ্ঞানের অনুরূপ। এ জ্ঞানের ভিত্তিতে একজন ইমাম বা খলিফা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধিবিধানের তত্বাবধান করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

অন্য আর একটা শর্ত হলো, একজন ইমাম বা খলিফা অবশ্যই পবিত্র ও নিষ্পাপ হবেন। সকল প্রকার পাপ ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং পবিত্রতম আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হবেন। ফলে ইমামতের বা খলিফার মর্যাদা এবং ইমামতের ও খলিফার আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। তাহলে অনুরূপভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কঠোর আত্মসংযমীয়তা, খোদাভীতি ও সাহস এর মতো শর্তগুলো পূর্ণ হবে।

একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর নবী (সাঃ)-এর পক্ষে স্পষ্টরূপে এ শর্তসমূহ আলাদা করা সম্ভব। আল্লাহ্ই জানেন কার আত্মা পবিত্রতার আলোকচ্ছটায় সমুজ্জ্বল এবং তিনিই জানেন নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ মাত্রার জ্ঞান যথাযথ পরিমাণ সাহসিকতা আধ্যাত্মিক শক্তি কার মাঝে বিদ্যমান।

যারা মহানবী (সাঃ)-এর ইমাম ও খলিফা নির্বাচনের ভার জনসাধারণের উপর ছেড়ে দিয়েছিল, তারা আসলে পবিত্র কোরআনের বর্ণিত ইমামতের অর্থকে পরিবর্তন করেছিল। তারা জনসাধারণের বাহ্যিক, পার্থিব ও জাগতিক বিষয়ে নেতৃত্বদান করার মধ্যে ইমামতের অর্থকে সীমিত করে ফেলেছিল। অন্যথায়, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থে ইমামতের শর্তসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ণীত হতে পারে। তিনিই জানেন কার মধ্যে এ গুণগুলো বিদ্যমান।

“এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন অতঃপর সে তা পূর্ণ করল; তখন আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম (নেতা) বানাব। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?

কেননা মহানবী (সাঃ)-ও জনসাধারণের ভোটে নবী নির্বাচিত হননি। বরং, মহানবী (সাঃ) সর্বাধিক নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকারো পক্ষে নবী (সাঃ)-এর গুণাবলী নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়।

নিঃসন্দেহে ইসলামের শাসন সর্বজনীন এবং শাশ্বত পবিত্র কোরআনের প্রত্যক্ষ আয়াত অনুসারে, তা কোন নির্দিষ্ট সময় বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের সময় ইসলামের ঐশী ভাবধারা যে আরব উপদ্বীপের বাইরে পৌঁছেনি, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে, মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবনের ১৩টি বৎসর মক্কাতে শিরক ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অতিবাহিত করেন।

মদীনায় হিজরতের পর থেকে ১০ বৎসর শত্রুদের দ্বারা তাঁর উপর আরোপিত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে অতিবাহিত হয়।

মহানবী (সাঃ) যদিওবা রাতদিন সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা চালাতেন, যাতে সাধারণ ভালোভাবে ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং ইসলামের অনুশাসনকে জীবনের সর্বাঙ্গনে মানুষের সামনে পরিচয় করে দিতেন। তা সত্ত্বেও স্পষ্টতই ইসলামের অনেক বিষয়ে বুঝতে বা শিক্ষা দিতে অনেক বেশি সময় লেগে যেত। ফলত, এ কাজ সম্পাদন করার জন্য এবং এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর জ্ঞানে জ্ঞানী আরেকজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল।

তাছাড়া, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামের স্থায়িত্ব বিধান করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর গুরুত্ব এতই বেশি ছিল যে, প্রত্যেক নেতাই এ বিষয়ে চিন্তা করতেন এবং এ বিষয় ভুলে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

উপরন্তু, মহানবী (সাঃ) যিনি জীবনের সাধারণতম বিষয়ের জন্য যথাসাধ্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন অথচ, মুসলমানদের জন্য ইমাম বা নেতা নির্ধারণ করা কিংবা খেলাফত তথা স্বীয় উত্তরসূরী নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি কিছুই করবেন না, এটা কখনো হতে পারে না।

মহানবী (সাঃ) যে তাঁর উত্তরসূরী মনোনয়নে নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, উপরোক্ত তিনটি দিক হলো সামগ্রিকভাবে তার স্পষ্ট কারণ।

মহানবী (সাঃ)-এর পক্ষে এ বিষয়ে উদাসীন থাকা কখনোই সম্ভব ছিল না। কারণ "নবী (সাঃ) পবিত্র কোরআন পরিপন্থী

কাজ করতে পারেন না।” অবশ্য মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পরে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অনেক রাজনৈতিক প্রচারণা অভিযান চলেছে, এখনও চলছে, এই বলে যে, নবী (সাঃ) তাঁর উত্তরসূরী মনোনয়নের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) যখন যুদ্ধের কারণে (যেমন, তাবুক যুদ্ধ) সামান্য কয়েক দিনের জন্য মদীনা ত্যাগ করতেন, তখনও মদীনাকে তাঁর প্রতিনিধি শূন্য রেখে যেতেন না। সূত্র:- সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪০৯৮, (আধূঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৬, হাঃ ৪৪৪৮, (ই. ফাঃ) সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৭, হাঃ ৬০৪০, ৬০৪২, (ই. সেন্টার)।

ইজমা এবং শুরা

ধরে নেয়া যাক, মহানবী (সাঃ) এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করে গিয়েছেন এবং সাহাবীগণ নিজেরা মহানবী (সাঃ) এর উত্তরসূরী নির্বাচন করে নিতে বাধ্য ছিল।

কিন্তু আমরা জানি, ইজমা বলতে মুসলিম উম্মতের ঐক্যমত্যকে বুঝায়। আর প্রথম খলিফার ক্ষেত্রে কোনক্রমেই এমন ইজমা সংঘটিত হয়নি। কেবল ৫০ থেকে ৬০ জন ব্যক্তি মিলিত হয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এটাই কি ইজমা?”

এবং ইসলামের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি, মদীনাতেও হযরত আলী, খাতুনে জান্নাত এবং বনি হাশিমের এক বিরাট অংশ ও একদল সাহাবী যারা মদীনায় বসবাস করতেন তারাও কোনক্রমেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন না। এমন একটা সিদ্ধান্তকে, ইজমা হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি? আর এ পদ্ধতিই যদি সঠিক হবে, তা হলে প্রথম খলিফা কেন দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করেন নি? কেন তিনি

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উত্তরসূরী নিয়োগ করেছিলেন? একক ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারণ যদি যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে মহানবী (সাঃ) যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাঁর মনোনয়ন মেনে নেয়াই উচিত ছিল। একক ব্যক্তির মনোনয়নের পরে জনতার আনুগত্য যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে তা আরো সুন্দরভাবে সমাধান হতো। এছাড়া, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে আবার তৃতীয় একটা উপায় উদ্ভাবন করা হলো কেন? দ্বিতীয় খলিফা প্রথম খলিফার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেননি কেন? কেন তিনি প্রথম পদ্ধতি অথবা তাঁর নিজের জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল তা পরিত্যাগ করলেন? অর্থাৎ, না তিনি উম্মতের ইজমাকে পছন্দ করেছিলেন আর না পছন্দ করেছিলেন একক ব্যক্তির মনোনয়নকে। তিনি গঠন করেছিলেন শুরা কমিটি। যদি একটা মজলিশে শুরা বা পরামর্শ গ্রহণের চিন্তা সঠিক বলে ধরা হয় তাহলে, মাত্র ছয়জনকে নিয়ে মজলিশে শুরা কমিটি গঠন করা হয় কেন? তারপর, আবার ছয়জনের মধ্যে তিনজনের ভোটকে কিভাবে যথেষ্ট বিবেচনা করা যেতে পারে? এবং অবশেষে একজনের সিদ্ধান্তকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হল কেন?

ইসলামের ইতিহাসের প্রত্যেক সত্যগবেষক ব্যক্তির কাছে এগুলো প্রশ্ন। আর এসব প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর নেই। আর এতেই প্রমাণ হয় যে এগুলো নবী (সাঃ)-এর উত্তরসূরী মনোনয়নের কোন পদ্ধতিই নয়।

যদি আমরা ধরে নেই যে, মহানবী (সাঃ) তাঁর উত্তরসূরী মনোনয়ন করে যাননি। যদি আমরা আরো ধরে নেই যে, একাজ করার দায়িত্ব ছিল জনতার উপর। কিন্তু এটাও কি সম্ভব যে, কাউকে নির্বাচনের সময় যিনি সকলের চাইতে জ্ঞানে ও ধর্মভীরুতায় এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে আর এ মাপকাঠিতে যার অবস্থান

নিচে তাকে নির্বাচন করা হবে? হযরত আবু বকর, হযরত ওমর দ্বারা মনোনীত হয়ে প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হলো, “যদিও আমিতোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই, তবুও আমাকে তোমাদের শাসক নিয়োগ করা হয়েছে, যদি আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি তবে আমাকে সাহায্য করো, যদি আমি ভুল করি, তবে তোমাদের দায়িত্ব আমাকে সঠিক পথে (সিরাতে মুস্তাকিমে) পরিচালনা।”

সূত্র:- সাহাবা চরিত, খঃ ১, পৃঃ ৭৩ (ই, ফাঃ) খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃঃ ৫৮, ইসলামের ইতিহাস (আইডিয়াল লাইব্রেরী), পৃঃ ১০১, আরব জাতির ইতিহাস, পৃঃ ৬৩ (বাংলা একাডেমী) ইমামত (সৈয়দ সাঈদ আখতার রিজভী), পৃঃ ৬৩। আত তাবারী, খঃ ২, পৃঃ ৪৫০ (মিশর) তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ৭১ (মিশর) সিরাতে নাবিয়্যাহ (ইবনে হিশাম), খঃ ৪, পৃঃ ৩১১ (মিশর)।

ইসলামের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সবাই এ কথার সাথে একমত যে, এমনকি আমাদের আহলে সুন্নাত-এর পণ্ডিতগণও সরাসরি বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে আলী ন্যায় বিচারে সব চাইতে জ্ঞানসম্পন্ন।”

সূত্র : মাসাবীহ আশ সুন্নাহ্, খঃ ২, পৃঃ ২০৩ (মিশর) আল ইস্তোয়্যাব, খঃ ১, পৃঃ ১৬ (মিশর) মাজমা আজ জাওয়াঈদ, খঃ ৩, পৃঃ ১০২ (মিশর) রিয়াজ আন নাদিরা (তাবারী), খঃ ২, পৃঃ ১৯৮ (মিশর) আকবার আল কুজাত, খঃ ১, পৃঃ ৭৮ (মিশর) শারাহ্ সহীহ্ বুখারী, খঃ ১, পৃঃ ৫৫ (আল আইনি হানাফী)। (মিশর) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৫৪৪।

হযরত আলী সম্পর্কে হযরত ওমর বলতেন, “আলী হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী বিশেষ করে বিচারকার্যে।”

সূত্র:- সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৪, হাঃ ৪১২৩ (আধূঃ) সহীহ্ আল বুখারী, খঃ ৬, পৃঃ ২৩ (মিশর) মুসনাদে হাম্বল, খঃ ৫, পৃঃ ১১৩, (মিশর) মুস্তাদরাক হাকেম, পৃঃ ৩০৫ (মিশর) তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খঃ ২, পৃঃ ১০২ (লেইডেন) আল ইস্তিয়্যাব, খঃ ৩, পৃঃ ১১০২ (মিশর) তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ১৮২। সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১২৪, ১৭৭।

নবী (সাঃ) বলেছেন, যে, "আলী রয়েছে সত্যের সাথে এবং সত্য রয়েছে আলীর সাথে, ইয়া আল্লাহ্! সত্যকে সেইদিকে ফিরিয়ে দাও যেদিকে আলী যায়।"

সূত্র:- আল খতীব আল খাওয়ারিজমী আল মানাকিব, পৃঃ ৫৬, তারিখে বাগদাদ, খঃ ১৪, পৃঃ ৩২১, কেফায়াতুত তালেব, অধ্যায়, ৪৪, ইমামত ওর সিয়াসাত, খঃ ১, পৃঃ ১১১, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৯১ (ইস্তাম্বুল) তাফসীরে কাবির, খঃ ১, পৃঃ ১১১, (মিশর) জামেউস সাগির, খঃ ২, পৃঃ ৭৪, ৭৫, ১৪০, তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ১১৬, ইযাযাতুল খিফা (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ) ১, পৃঃ ১৫৮, ৫৪৮, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৯৮২।

নবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "আলী সব সময় সত্যের সাথে আছে, আর সত্য সব সময় আলীর সাথে আছে। উভয় কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে আমার কাছে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"

সূত্র:- মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১২৪, জামেউন উসুল ইবনে হাজারে আসকালানী, খঃ ৯, পৃঃ ৪২০ (মিশর) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৯১, (ইস্তাম্বুল) আল মানাকিব, পৃঃ ২৮, ফাইজুল কাদীর, খঃ ৪, পৃঃ ৩৫৮, খাতিয়াসুল উলেমা

(সিবতে ইবনে জাওজি), পৃঃ ২০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৭, পৃঃ ৩৬।

নবী (সাঃ) বলেছেন, “আলী কোরআনের সাথে এবং কোরআন আলীর সাথে, উভয়ে হাউজে কাউসারে আমার সামনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।”

সূত্র, হযরত আলী (এমদাদীয়া), পৃঃ ১৭ তাকমীলুল ইমান, পৃঃ ৯৭, (শায়খ আব্দুল হক দেহলভী) (ই,ফাঃ) ইযাযাতুল খিফা, খঃ ২, পৃঃ ৫৪৭, (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ) আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১১৪, (উর্দু), কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ ২৫২, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ ৯, পৃঃ ১৩৪ (আবু বকর হাইতামী, কায়রো) আস সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃঃ ৭৪, (মিশর) তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ৬৭, (মিশর) ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৯০, (ইস্তাম্বুল), পৃঃ ১৫০ (উর্দু) নুরুল আবসার, পৃঃ ৭৩ (আল্লামা শাবলাঞ্জী) (মিশর)।

নবী (সাঃ) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা) বলেন, “হে আম্মার যখন দেখবে হযরত আলী এক পথে চলছে আর সাহাবারা অন্য পথে, তখন তুমি আলীর সঙ্গে যেও ও অন্যদের ত্যাগ করবে।” কারণ, সে তোমাকে পতনের পথে পরিচালিত করবে না এবং হে'দায়েতের পথ হতেও বের হতে দেবে না।

সূত্র:- কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, পৃঃ ১৫৬, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৪০২ আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ১০২৩ মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৬০।

হযরত আবুজার আল গিফারী (রা) হতে বর্ণিত তিনি পবিত্র কা’বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, “আমি নবী (সাঃ) কে

বলতে শুনেছি সাবধান! আমার আহলে বাইত হল তোমাদের জন্য নূহ (আঃ) এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহণ (অনুসরণ) করবে সে নাজাত পাবে। আর যে এটা হতে পশ্চাতে থাকবে সে ধ্বংস হবে (জাহান্নামী)।"

সূত্র:- মিশকাত, খঃ ১১, হাঃ ৫৯২৩ কাশফুল মাহজুব, পৃঃ ৭০ (দাতাগঞ্জ বক্স) মাসিক মদীনা (সেপ্টেম্বর ২০০০) পৃঃ ৬, পীরের মর্যাদা ও ভূমিকা, পৃঃ ১১৪ (মুহাঃ মুখলেসুর রহমান এডভোকেট) জ্ঞানধারা, পৃঃ ১০৬ (মুখলেসুর রহমান) আস সাওয়ায়েক মোহরেকা (ইবনে হাজার হায়সামী), পৃঃ ২৩৪, তাফসীরে কবির, খঃ ২৭, পৃঃ ১৬৭, মুসনাদে হাম্বল, খঃ ২, পৃঃ ৭৮৬, কানজুল উম্মাল, খঃ ৬, পৃঃ ২৫৬, মানাকবে ইবনে মাগাজিলি, পৃঃ ১৩২, মুস্তাদরাক হাকেম, খঃ ৩, পৃঃ ১৫১, খঃ ২, পৃঃ ৩৪৩, কেফায়াতুত তালেব, পৃঃ ২৩৩, আরবাইন নাবহানী, পৃঃ ২১৬, তারিখে খোলাফা, পৃঃ ৩০৭, যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ ২০, সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃঃ ১৫০ (ইবনে হাজার মাক্কি) ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৩৭০, ৩০৮, মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃঃ ৩৮, ১১১, নুরুল আবসার, পৃঃ ১১৪, আল তাবরানি, খঃ ৩, পৃঃ ৩৭, ৩৮, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ ৪, পৃঃ ৩০৬, আরজাহুল মাতালেব, পৃঃ ৫৫৯ (উর্দু)।

নবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, "আহলে বাইত এর আগে যাওয়ার চেষ্টা করোনা, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের থেকে সরে যেয়ো না, তাহলে দুঃখ-কষ্ট তোমাদের চিরসাথী হয়ে যাবে। তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করোনা, তাঁরা তোমাদের থেকে বেশি জ্ঞানী।"

সূত্র:- তাফসীরে দুরে মানসুর, খঃ ২, পৃঃ ৬০, উসদুল গাবা, খঃ ৩, পৃঃ ১৩৭, সাওয়ায়েকে মোহরেকা, পৃঃ ১৪৮, ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ৩৫৫, কানজুল উম্মাল, খঃ ১, পৃঃ

১৬৮, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খঃ ৯, পৃঃ ২১৭, আবাকাতুল আনোয়ার, খঃ ১, পৃঃ ১৮৪, আল সিরাহ আল হালবিয়া, খঃ ৩, পৃঃ ২৭৩, আল তাবরানি, পৃঃ ৩৪২।

রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত সম্পর্কে আমিরুল মোমেনিন বলেন যে, "বিশ্বের কোন ব্যক্তিকে আহলে বাইতের সমকক্ষতায় আনা যাবে না এবং মহত্বে তাঁদের সমতুল্য কাউকে মনে করা যাবে না। কারণ, এ বিশ্ব তাঁদের অনুগ্রহে ভরপুর। তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হে'দায়েত ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমেই বিশ্ব চিরন্তন নেয়ামত পেতে পারে। তাঁরা হলেন, দ্বীনের ভিত্তি ও দুই দেয়ালের সংযোগস্থাপক প্রস্তর। তাঁরা হলেন, দ্বীনের বাঁচার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যস্বরূপ। তাঁরা ঈমান ও প্রজ্ঞার এমন শক্তিধর স্তম্ভ যে, সংশয় ও অজ্ঞতার যে কোন ঝড় ফিরিয়ে দিতে পারেন। তাঁরা অতিবর্তী ও পশ্চাদবর্তী পথ সমূহের মধ্যে এমন এক মধ্যপথ, যে পথে না আসা পর্যন্ত কেউ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। বেলায়েত ও নেতৃত্বের অধিকারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের আছে। ফলে, উম্মাহর অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা করার অধিকার আর কারো নেই।

একারণেই, রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী ও তাঁর বেলায়েতের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন।" ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন যে, আমিরুল মোমেনিনের বেলায়েত সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু উত্তরাধিকার বলতে রাষ্ট্রক্ষমতার উত্তরাধিকার বুঝায় না; এ উত্তরাধিকার দ্বারা রাসূলের (সাঃ) শিক্ষার উত্তরাধিকার বুঝায়। ইবনে আবিল হাদীদের মত গ্রহণ করলেও রাসূলের (সাঃ) শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কারণে খেলাফতের দায়িত্ব অন্য কারো ওপর বর্তায় না। কারণ, শিক্ষাপ্রদান খেলাফতের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। রাসূলের (সাঃ) খলিফার প্রধান ও

গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ন্যায় বিচার করা, ধর্মীয় আইনের মাধ্যমে সমস্যাদির সঠিক সমাধান করা। এবং জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যাদান ও ধর্মীয় দণ্ডসমূহের প্রয়োগ করা। যদি রাসূলের (সাঃ) প্রতিনিধি থেকে এ সমস্ত বিষয় সরিয়ে নেয়া হয়, তবে তার অবস্থান রাজ্য শাসকের (দুনিয়াদার শাসক) পর্যায়ে নেমে আসবে। ধর্মীয় কর্তৃত্বের সর্বাধিকারী হিসাবে তাকে আর গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং, ইবনে আবিল হাদীদের এই ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন। রাসূলের (সাঃ) ওসিয়ত, খেলাফত ব্যতীত অন্যকিছুর জন্য নয়। বেলায়েত দ্বারা সম্পদ ও জ্ঞানের উত্তরাধিকার বুঝায় না সঠিক নেতৃত্বকে বুঝায়; যা আহলে বাইত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ নিজেই তাঁদের গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দান করেছেন।”

নবী (সাঃ)-এর পর নবীর আহলে বাইত এর সদস্যগণ যেমন (আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন ও ইমাম হোসাইন ন-এর বংশের বাকী নয়জন ইমাম) এবং আহলে বাইত-এর সদস্যদের প্রথম ব্যক্তি হযরত আলী, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সবচেয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর হাদীস এবং তাঁর জীবনী এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। ইসলামের ইতিহাস এ কথাই বলে যে, তৎকালীন উম্মাহর জন্য সকল প্রকার বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান ও সকল সমস্যার মধ্যে হযরত আলীই একমাত্র আশ্রয় ছিলেন।

এমনকি খলিফাত্রয়দের যখন কঠিন ও জটিল প্রশ্ন করা হতো, তখন তাঁরাও তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং হযরত আলীকে সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে বলতেন। কারণ তাঁরা জানতেন, “হযরত আলী, নবী (সাঃ)-এর পর এ ধরার বুকে উলিল আমর্ ও আহলে জিকির ছিলেন।” তাঁর সাহস, খোদাভীতি ও ন্যায় বিচার এবং আরো অন্যান্য যেসব গুণাবলী বিশেষ করে তিনি বেলায়েতের অধিকারী ছিলেন। তাই আমি যদি ধরেও নেই ন্যায় বিচার, জনতা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে তাহলেও

হযরত আলীই ছিলেন নবী (সাঃ)-এর পর সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি, এটা পবিত্র কোরআন ও নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও বিবেক ও এটাকে সমর্থন করে।

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী (উলিল আমর্)।” **(**নিসা **-**৫৯**)**

“অতঃপর জ্ঞানীদের (আহলে জিকিরকে) জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।” **(**নাহল**-**৪৩**)**

সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

একটু চিন্তা করুন যে, আমাদের দ্বীনের পথে পরিচালনার জন্যেই তো আল্লাহ্ নবীগণকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। একইভাবে তিনি ইমামতও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহ্র দ্বীনকে পরিবর্তন ও বেদআত হতে রক্ষা করেন। এবং যাতে করে প্রত্যেক ইমাম তাঁর আমলে ঐশী বিধানকে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও স্বার্থের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারেন। নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর সময়কার ইমাম সম্পর্কে অনবহিত থাকবে তাকে ক্ষমা করা হবে না। ইমামত বিষয়টাই এত অধিক দলিল পত্র দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই ইমামতকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

“স্মরণ কর সেদিনের (কেয়ামতের) কথা যখন আমি সকল মানুষকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব।” **(**বনী ইসরাইল**-**৭১**)**

“আমি প্রত্যেক বস্তু গণনা করে রেখেছি এবং স্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছি ইমামে মোবিনে।” **(ইয়াসিন-১২)**

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনায় রাসূল (সাঃ) বলেন, “আমি নবীদের প্রধান এবং আলী ইবনে আবি তালেব, উত্তরসূরীদের প্রধান। আর আমার পর আমার উত্তরসূরীদের সংখ্যা হবে বারো, যাঁদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম আলী এবং শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহদী (আঃ)।”

সূত্র, আল দুরার আল কামেরা (ইবনে হাজার আসকালানী), খঃ ১, পৃঃ ৬৭। তাজকিরাত আল হাফফাজ, খঃ ৪, পৃঃ ২৯৮। ফারায়েদ সিমতাহিন (আল জুওয়াইনি), পৃঃ ১৬০ (বৈরুত)।

নবী (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামের মারেফাত ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতেরই মৃত্যুবরণ করল।”

সূত্র:- সহীহ মুসলিম, খঃ ৩, হাঃ ১৮৫১ (লেবানন) কানজুল উম্মাল, খঃ ১, পৃঃ ১০৩, ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃঃ ১৮৯ (উর্দু), মাজমা আজ জাওয়াইদ, খঃ ৫, পৃঃ ২১৮ তাফসীরে ইবনে কাসির, খঃ ১, পৃঃ ৫১৭ (মিশর) আস সুনান আল কুবরা, খঃ ৮, পৃঃ ১৫৬, আল মুসনাদ, খঃ ৪, পৃঃ ৯৬ (মিশর) সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৬, পৃঃ ২২ (মিশর) জাওয়াহির আল মুদিয়া, খঃ ২, পৃঃ ৪৫৭ শারাহ্ আল মাকাসিদ, খঃ ২, পৃঃ ২৭৫, হিলিয়াতুল আউলিয়া, খঃ ৩, পৃঃ ২২৪।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ ইসলামিয়াতের ২০ পৃষ্ঠায় বলেন, কেননা নবী (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু অন্ধকার

যুগের মৃত্যু হয়েছে।” নবীর উম্মতরা এই হাদীসের কারণে নবীজির ওফাতের সাথে সাথে নবীর পর তাদের ইমাম নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেই নবী (সাঃ) নিজে এত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন কিন্তু নিজেই তা এড়িয়ে গেলেন? খোলাফায়ে রাশেদীনের পর আর কোন খলিফাকে আমরা খুঁজে পাইনা। কারণ, তারপর রাজতন্ত্র কায়েম হলো (মুয়াবিয়া ও এজিদের আইন)। তাহলে তখন যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা কি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে?

নবী (সাঃ)-এর ওফাতের তিন দিন পর বনি সাকিফাতে কে খলিফা হবে তা সমাধান হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই তিন দিন তো কোন ইমাম ছিল না, এই তিন দিনে সারা পৃথিবীতে কি একজন ব্যক্তিও মৃত্যু বরণ করেনি? যদি করে থাকে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছিলো নবী (সাঃ)-এর সেই হাদীসের আলোকে, তাই নয় কি? এবং এই অপরাধের দায়-দায়িত্ব কে বহন করবে? হযরত ওসমানের ওফাতের পর মদীনাতে প্রায় তিন দিন কোন ইমাম ছিল না, এই তিন দিন যারা মৃত্যুবরণ করলো, তাদের মৃত্যুবরণকে আমরা কোন্ খাতে প্রবাহিত করবো? এবং বর্তমানে যারা মৃত্যুবরণ করছে, তারা কাকে ইমাম মেনে মৃত্যুবরণ করছে? তাহলে তারাও কি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করছে? এটার সঠিক উত্তর অবশ্যই আমাদের জানার প্রয়োজন আছে, তাই নয় কি?

উপসংহার

আজ মুসলমানগণ ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে ঈমান ও কার্যপদ্ধতিতে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই একজন মুসলমানের, তার

পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ধর্মের প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটনপূর্বক পবিত্র কোরআন ও হাদীস মোতাবেক জীবন চালনা করা উচিত (আহলে বাইত-এর কাছ থেকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা ও নবী (সাঃ)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা নিতে হবে)। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনে সহযোগিতা করা। শুধুমাত্র কিছু প্রকৃত সত্য ঘটনা ও তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আমাদের এ প্রচেষ্টা সম্মানিত পাঠক ও পাঠিকাদের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে কিছুটা হলেও সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি। যেহেতু, একজন মানুষকে পরকালে তার নিজের কর্মফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে। তাই সঠিকপথ অনুসন্ধান করতেই হবে। সঠিক পথ অনুসন্ধান করা যেমন কঠিন, তেমনি সত্য গ্রহণ করাও কঠিন। তবে যেহেতু পরকালীন মুক্তিই একজন মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য, তাই এ লক্ষ্য সাধনে আমাদের সকলের অগ্রণী হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা এমন হওয়া উচিত যে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেব। এখানে কে কি বলে গেছেন বা, কে কি করে গেছেন তা নগণ্য। সত্য অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটনের জন্য প্রচুর পড়াশোনা, সময়, অর্থ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, যার সুযোগ আমাদের অনেকেরই নেই। বর্তমান পৃথিবীতে একজন মানুষকে তার মৌলিক চাহিদা নির্বাহের জন্যই সিংহভাগ সময় ও অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই তাদের জন্যেই আমাদের এই সামান্য খেদমতটুকু। তবুও আমরা বলবো, সঠিকপথ অনুসন্ধান করতে হবে। এ বিষয়ে ইচ্ছা থাকলে, তা অসম্ভব হবে না।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া, ঠিক হবে কি? অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর

স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে কি? সাধারণ মানুষ, যে ব্যক্তিকে শাসক হিসাবে নির্বাচন করেছে, তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মনোনীত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তার আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা, যুক্তিসংগত কি? অথচ পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

“তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে, সেসব বিবাদ বিসংবাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তারপর তারা নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ-বোধ না করে, আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।” **(নিসা-৬৫)**

“আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” **(আলে ইমরান-১০৫)**

“রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্ কে ভয় করো। আর আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।” **(হাশর-৭)**

“কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথাই সে স্থায়ী হবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।” **(নিসা-১৪)**

“তারা কি একথা জানেনি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন,

সেথায় সে অনন্তকাল থাকবে এটা বিষম লাঞ্ছনা।”
(তওবা**-**৬৩**)**

“যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরেক দুনিয়া ও আখেরাতে লা’নত (অভিশাপ) করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।” **(**আহযাব**-**৫৭**)**

“কোন মোমিন মোমেনার এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেয় যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করলে, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” **(**আহযাব**-**৩৬**)**

“আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু’মিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথ অনুসরণ করবে অবশ্যই আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব। তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।” **(**নিসা**-**১১৫**)**

“যারা মন দিয়ে কথা শোনে ভালগুলোর অনুসরণ করে এরাই তারা যাদের আল্লাহ্ হেদায়াত করেছেন তারাই বুদ্ধিমান।”
(যুমার**-**১৮**)**

“আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।” **(**বাকারা**-**৩৯**)**

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।” **(**বাকারা**-**৪২**)**

“অবশ্যই তাদের মধ্যে একদল সত্যকে জেনেও গোপন করে।” **(**বাকারা**-**১৪৬**)**

“সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলদের আমি এজন্য প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্র সামনে মানুষের কোন ওজর আপত্তি না থাকে।” **(**নিসা**-**১৬৫**)**

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিশ্চই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সৎপথ, ভ্রান্ত পথ থেকে।” **(**বাকারা**-**২৫৬**)**

“আর তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।” **(**মু’মিনুন**-**৭০**)**

“আমি তো তোমাদের কাছে সত্য (হক) পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যের (হকের) প্রতি ঘৃণা পোষণকারী।” **(**যুখরুফ**-**৭৮**)**

“এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে চেনার পর অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যকার অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।” **(**নাহল**-**৮৩**)**

“বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সত্য জানেই না, তাই তারা সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” **(**আম্বিয়া**-**২৪**)**

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে বরং আমরা তো তার অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে তবুও কি?” **(**লোকমান**-**২১**)**

“আর যখন কেহ তাদেরকে বলে আল্লাহ্র প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে বরং আমরা ঐ পথেই চলবো যাতে আমাদের বাপ দাদাগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ দাদারা কোন জ্ঞানই রাখতো না এবং হেদায়েত প্রাপ্তও ছিল না (তবুও)?” **(**বাকারা**-**১৭০**)**

“যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (নির্দেশ) অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।” **(**জ্বীন**-**২৩**)**

“ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরায়? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।” **(**সাজদা**-**২২**)**

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালবাসবে (অনুসরণ করবে) তার সাথেই তার হাশর হবে।” সূত্র, সহীহ্ মুসলিম, খঃ ৭, হাঃ ৬৪৭০ (ই, ফাঃ)।

“যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করতাম তারা আরো বলবে, ইয়া রব আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের (নির্বাচিত) নেতাদের এবং আমাদের (নির্বাচিত) প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।” **(**আহযাব**-**৬৬**-**৬৭**)**

“আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষকে। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা (সত্য) বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা (সত্য) তারা দেখে না, তাদের

কান রয়েছে তার দ্বারা (সত্য) শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতম....।" **(**আরাফ**-**১৭৯**)**

পরিশেষে আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আসুন আমরা আমাদের পরকালীন মুক্তির জন্য এবং আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সত্যপথ অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটন করার চেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। আর একই সাথে আল্লাহ্র আদেশানুযায়ী দোয়া করি,

"ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকেও সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন কর, তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি নে'য়ামত দান করেছো। তাঁদের পথ নহে যারা তোমার ক্রোধ লাভ করেছে এবং যারা বিপথগামী। আমিন"।

As regarding seeking guidance, it is the personal effort exerted by a servant of Allah who follows the norms of general guidance in order to reach, after researching, ascertaining, utilizing his intellectual faculties, the knowledge relevant to the difference between what is right and what is wrong, and he willingly chooses the path of guidance after having avoided it. This is deducted from the verse saying,

We have surely shown him the way: he may thank; or be an ingrate. (Qur'an, al- Dahr:3)

"ALLAH HUMMAH SALLEH ALA MUHAMMAD WA ALE MUHAMMAD"